রস-সাগর

কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

মহাশয়ের বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পরীক্ষক

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ

সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ২৲ (দুই) টাকা

ভিক্টোরিয়া প্রেস,
(২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা)
সূচীপত্র ও ১ পৃষ্ঠ হইতে ২৮০ পৃষ্ঠ
এবং
গিরীশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
(৫১।২।৬, সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
অবশিষ্টাংশ।

সম্পাদক-কৃত বিজ্ঞাপন।

১

সরস্বতীর পরম প্রিয়-বাস-ভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও জীবন-চরিত লিখিতে হইলে লেখকের চক্ষুঃ স্থির হইয়া যায়। কোন একটী সূক্ষ্ম-কথা জানিতে হইলেই তিনি চতুর্দ্দিকে বিপৎ-সাগর দেখেন। এদেশে পূর্ব্বকালে জীবন-চরিত লিখিবার প্রথা ছিল না। এই হেতুই আমরা ভূতপূর্ব্ব মহাপুরুষ-গণের জীবন-চরিত সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া রহিয়াছি। বহু-পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও ঘোরতর অজ্ঞানতা-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, ৪০ বা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা-প্রদেশেও যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও জীবন-চরিত-সম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইবে, কিরূপে পারমার্থিক বিষয়ের সংবাদ অবগত হওয়া যাইবে, কিরূপে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর ঐহিক জীবনে পারত্রিক কার্য্য সংসাধিত হইবে. কিরূপেই বা এই মহামোহময়ী পৃথিবীর দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল ভেদ করিয়া মোক্ষলাভ করা যাইতে পারিবে,—এই সকল তত্ত্ব লইয়াই তাৎকালিক মনীষী হিন্দুগণের মন নিয়ত নিযুক্ত থাকিত। পার্থিব জীবন নিতান্ত অলীক ও অসার; অতএব এই পার্থিব জীবনের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া তাঁহারা মহা-বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে করিতেন। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভট্টি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত

জীবন-চরিত-লেখকের বিড়ম্বনা।

মহাকবি-গণের জীবন-বৃত্ত-বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা জানিতে চাহেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটী গল্প ভিন্ন তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। যে সকল বিষয় অনন্ত কালের গর্ভে লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া রাখা স্বদেশানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা এখন যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি বিশেষ প্রাচীন লোক নহেন। তথাপি তাঁহার জীবন-চরিতের উপাদান-সামগ্রী সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাই এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

গ্রন্থ-সঙ্কলনের উৎপত্তি-স্থল।

৩২ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা-বৌবাজারের অন্তর্গত হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে এক সুবর্ণ-বণিক্ মহাশয়ের গৃহে এক নাপিত-পত্নী শান্তিপুর হইতে তত্ত্ব করিতে আসিয়াছিল। আমি তাহার প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে ‘সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা’ সংগ্রহ করিতে ছিলাম। তৎকালে উদ্ভট-সংগ্রহে আমি এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে, কাহারও নিকটে কোন নূতন উদ্ভট-কবিতা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা মুখস্থ করিয়া অথবা কাগজে লিখিয়া লইতাম। একদিন উক্ত গলিতে আমার এক কৃতবিদ্য বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, “পূর্ণবাবু! শান্তিপুর হইতে একটী স্ত্রীলোক আমার বাটীর নিকটে তত্ত্ব করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আসে। সে অনেক উদ্ভট-কবিতা জানে। ২।১ দিন হইল, সে এখানে আসিয়াছে। যদি বলেন, তবে তাহাকে লইয়া আসি।” এই কথা শুনিবামাত্র বন্ধুটীকে সাগ্রহে বলিলাম, “আপনি তাহাকে এখনই

লইয়া আসুন।" ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে কিছুক্ষণ পরেই লইয়া আসিলেন।

নাপিত-পত্নী আসিয়া বিনীত-ভাবে দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম ও কথায় কথায় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তাহার প্রকৃত নাম "সরস্বতী"। তাহার মাতা আদর করিয়া তাহাকে কখন "গুণমণি", কখনও বা "গুণ" বলিয়া ডাকিত। বয়স্ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমার বয়স্ এখন ১২ গণ্ডা (৭২ বৎসর)।" হাসিতে হাসিতে তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাবা! হিন্দুর ঘরের মেয়ে হইয়া কিরূপে স্বামীর নাম বলিতে পারি!" তখন সে ইঙ্গিতে ও কৌশল-ক্রমে যে নামটী আমাকে বলিয়াছিল, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। নাপিত-পত্নী অত্যন্ত বিনীতা, রসিকা ও রূপবতী। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাছা! তুমি উদ্ভট-কবিতা জান?" তখন সে বলিল "বাবা! উদ্ভট-কবিতা কি, তাহা আমি জানি না। তবে আমি ভারতচন্দ্র, রস-সাগর, দাশু রায়, এণ্টনি সাহেব ও ভোলা ময়রার গান ও ছড়া মুখস্থ বলিতে পারি।" স্ত্রীলোকটী উদ্ভট-কবিতা জানে না, শুনিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে নাপিত-পত্নীর সহিত আমার কথা হইয়াছিল, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "নীহার"-নামক একখানি মাসিক-পত্রে "রস-সাগরের জীবন-চরিত ও সমস্যা-পূরণ"-নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। মনোমোহন থিয়েটারের বর্ত্তমান ম্যানেজার, মদীয় বাল্যবন্ধু, সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় এই "নীহার" পত্রখানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। নাপিত-পত্নীর মুখে রস-সাগরের নাম শুনিবামাত্র কুতূহলী হইয়া তাহাকে কয়েকটী সমস্যা-পূরণ-কবিতা শুনাইতে বলিলাম। তখন সে আমাকে এমন কয়েকটী সুন্দর সমস্যা-পূরণ-কবিতা শুনাইল যে, তাহা আমি পূর্ব্বে

কখনও শুনি নাই। পরীক্ষা-চ্ছলে তাহাকে ভারতচন্দ্রের কবিতা, এণ্টনি সাহেবের ও ভোলা ময়রার গান এবং দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া শুনাইতে বলিলাম। স্ত্রীলোকটী অনর্গল তাহা একে একে বলিতে লাগিল। তাহার অদ্ভুত মেধাশক্তি ও বলিবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

নাপিত-পত্নী গল্প-চ্ছলে আমাকে বলিয়াছিল, "বাপ্পা!, আমার স্বামীর অবস্থা ভাল ছিল। এখন আমি দুঃখের জ্বালায় দাসীবৃত্তি করিতেছি। আমার স্বামীর পাঁচালীর দল ছিল। তিনি এই দলে স্বয়ং ছড়া বাঁধিতেন ও গান-রচনা করিতেন। রস-সাগর ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। তিনি যখন তখন আমার স্বামীর নিকটে আসিতেন। তিনি দীর্ঘকায়, কৃষ্ণাঙ্গ ও সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি যাহারই সহিত কথা কহিতেন, তাহাকে না হাসাইয়া ছাড়িতেন না। তিনি যখন কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় বা অন্য কোন বিশিষ্ট লোকের বাটীতে সমস্যা-পূরণ করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন, তখন তিনি স্বীয় সমস্যা-পূরণ-কবিতা গুলি লিখিয়া রাখিবার জন্য আমার স্বামীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। রস-সাগর ঠাকুর বড় বড় মজলিসে বসিয়া যে সকল সমস্যা-পূরণ করিতেন, আমার স্বামী তাহা যত্ন করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। এই খাতাখানি আমার নিকটে অদ্যাপি আছে। যদি ইচ্ছা করেন, দেখাইতে পারি।"

সমস্যা-পূরণের খাতার কথা শুনিয়া আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। আমি তখন নাপিত-পত্নীকে বলিলাম "বাছা! খাতাখানি আমাকে দাও; আমি কিছু মূল্য দিই।" ইহা শুনিয়া সে অতি বিনীত-ভাবে বলিল, "বাবা! খাতাখানিতে আমার স্বামীর হাতের লেখা আছে; এজন্য ইহা আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিব। ইহা দিতে আমার প্রাণে বড় ব্যথা

লাগে। আমি খাতাখানি আনিয়া দিব; আপনি নকল করিয়া লইবেন। ১৫।১৬ দিন পরেই আমি পুনর্ব্বার এখানে বৌ এর বাটীতে আসিব এবং আপনার জন্য খাতাখানি লইয়া আসিব।" ইহা বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটী বিনীত-ভাবে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

আমি ১৫।১৬ দিন পরে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। একদিন পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটীর বাটীতে গিয়া জানিলাম, স্ত্রীলোকটী খাতাখানি আনিয়াছে। বন্ধুটী তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। স্ত্রীলোকটী আসিয়া খাতাখানি আমার হাতে দিয়া বলিল "বাবা! খাতাখানি এইখানে বসিয়া নকল করিয়া লইবেন এবং নকল করা হইলেই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ফেরৎ দিবেন।" আমি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম ও খাতাখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি পরিচিত সমস্যা-পূরণ-কবিতা রহিয়াছে। পুনশ্চ দেখিলাম, এমন অনেক সমস্যা-পূরণ রহিয়াছে যে, তাহা কখনও শুনি নাই। বিশেষতঃ কয়েকটী ঐতিহাসিক সমস্যা-পূরণ-কবিতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তখন স্ত্রীলোকটীর সহিত রস-সাগর-সম্বন্ধে অনেক গল্প হইতে লাগিল। অবশেষে খাতাখানি বন্ধুটীর নিকটে রাখিয়া আমি বাটীতে আসিলাম; স্ত্রীলোকটীও চলিয়া গেল।

পরদিন আহার করিয়াই বন্ধুর বাটীতে গিয়া খাতাখানি নকল করিতে লাগিলাম। নাপিত-পত্নীও কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, খাতাখানির হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট বর্ণাশুদ্ধি আছে। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে শোধন করাও রহিয়াছে। কে এই সকল শোধন করিয়াছে, ইহা জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটী তাহা বলিতে পারিল না। বোধ হয়, রস-সাগর মহাশয়ই ইহা শোধন করিয়া থাকিবেন। তবে বর্ণাশুদ্ধি শোধন না করিয়া কি

পাঠগুলিই তিনি শোধন করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ কালী দিয়া কয়েকটী পাতা নকল করিয়া লইলাম; কিন্তু তাহাতে কিছু বিলম্ব হয় দেখিয়া উড্‌-পেন্‌সিল্ দিয়া লিখিতে লাগিলাম। ১২।১৩ দিন বহু পরিশ্রম করিয়া সমস্ত খাতাখানিই নকল করিয়া লইলাম।

খাতাখানি নকল করা হইয়া গেলে স্ত্রীলোকটীকে ডাকাইয়া আনিলাম। আসিবামাত্র খাতাখানি আদর করিয়া তাহার হস্তে দিলাম। ১২৲ টাকা তাহাকে দিব বলিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। টাকা দিতে গেলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ইহা লইল না। তখন আমি বলিলাম, "বাছা! আমি তোমার বাপ এবং তুমি আমার মেয়ে। তবে বাছা! তুমি লইবে না কেন?" ইহা বলিয়া তাহার অাঁচলে টাকা গুলি বাঁধিয়া দিলাম। অগত্যা স্ত্রীলোকটী ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা গুলি লইল।

তৎপরে সে বলিল "বাবা! রস-সাগর ত নকল করিয়া লইলেন। আর দুইটী দুর্লভ ধন আমার কাছে রহিয়াছে। ইহা লইবেন না? আমি 'ভোলা ময়রা' ও 'এণ্টনি সাহেবের' অনেক গান ও গল্প জানি। ইহাদের গানের খাতা আমার নাই। তবে অনেক আমার মুখস্থ আছে। আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া লউন। যদি লিখিতে এক মাস সময়ও যায়, তবু আমি তাহাতে রাজী আছি। বাবা! আমি অনেক যত্নে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। আমি গেলেই এ সব দুর্লভ জিনিস আর পাবেন না!" আমি বলিলাম, "বাছা! খাতা দেখিয়া রস-সাগর নকল করিতেই ১২।১৩ দিন গেল। এখন 'ভোলা ময়রা' ও 'এণ্টনি সাহেবের' গান তোমার মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লইতে অনেক দিন যাইবে। এতটা ধৈর্য্য আমি রাখিতে পারিব না।" আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী হতাশ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। এখন উক্ত দুই জন প্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালার গান-সংগ্রহে উন্মত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপায়।

নাপিত-পত্নীর সেই সাগ্রহ ও সকরুণ বাক্য এখন আমার মনে পড়িলে চক্ষু দিয়া জল আসে। ইহাকেই বলে "হাতের ধন পায়ে ঠ্যালা!"

১২৭৮ বঙ্গাব্দে স্বর্গগত শ্যামাচরণ রায় মহাশয় সর্ব্ব-প্রথমে "রস-সাগর" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ৯৬টী সমস্যা-পূরণ ছিল। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে "রস সাগর" বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে ১০৭টী সমস্যা-পূরণ ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও একজন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার একখানি "রস-সাগর" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতেও ১০৭টী সমস্যা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে সর্ব্ব-সমেত ৩০৪টী সমস্যা-পূরক-কবিতা নিহিত হইল। ইহাদের মধ্যে নাপিত-পত্নীর খাতায় ২৯৫টী সমস্যা ছিল। এতদ্ভিন্ন নঙ্গি-বাঙ্গালা-নিবাসী মদীয় পরম-সুহৃৎ, মেধাবান্ শ্রীরামব্রহ্ম চন্দ্র ৫টী; কলিকাতা-বাগ্‌বাজার-নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় ভূম্যধিকারী স্বর্গত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, মদীয় কনিষ্ঠ-সহোদর-প্রতিম কাব্য-রসিক রায় শ্রীবটবিহারী বসু ২টী; টাকীর প্রসিদ্ধ জমীদার, মদীয় বাল্যবন্ধু সুপণ্ডিত রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় ১টী এবং কলিকাতায় সংস্কৃত-প্রেস-ডিপজিটরীর ম্যানেজার, পরম-পূজনীয় কাব্যামোদী রসিক-রাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১টী সমস্যা-পূরণ-কবিতা দিয়াছেন। রস-সাগর মহাশয়, স্বীয় জীবনে যত সমস্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার নাপিত-বন্ধু সমস্তই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ সমস্যা-পূরণও আছে যে, অপরে তাহা জানিতেন, অথচ তাঁহার নাপিত-বন্ধু জানিতেন না।

রস-সাগরের সমস্যা-পূরণ-কবিতা-সংখ্যা।

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম শুনেন নাই, এরূপ পাঠক,

বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার দোকানের সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলাম। দেখিলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আফিস ও দোকান বন্ধ করিয়া বাটী যাইতেছেন। দেখা হইবামাত্র উভয়ে দাঁড়াইয়া কিয়ৎ-ক্ষণ কথা কহিতে লাগিলাম। কথায় কথায় তিনি বলিলেন "পূর্ণ বাবু! 'বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে,'—এরূপ-সমস্যা-পূরণ-কবিতা আপনার নিকটে সংগৃহীত আছে কি? আমি এরূপ কবিতা বড়ই ভালবাসি।" ইহা শুনিবামাত্র আমি বলিলাম, "দাদা! বহু বৎসর পূর্ব্বে রস-সাগরের অনেকগুলি সমস্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা এখন খুঁজিয়া পাইব কি না, ইহাই এক মহাসমস্যা। তৎপরে তিনি দুই একটী সমস্যা-পূরণ-কবিতা স্বয়ং বলিয়া বাটীতে চলিয়া গেলেন, এবং আমিও বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

গ্রন্থ-মুদ্রণের হেতু।

শ্রীযুত হরিদাস বাবুর প্ররোচনায় বাটীতে আসিয়া রাত্রিকালে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ৩২ বৎসর পূর্ব্বে নাপিত-পত্নীর খাতা হইতে বহু পরিশ্রম করিয়া যে সমস্যাগুলি সংগ্রহ করিয়া বাটীতে রাখিয়াছিলাম, তাহা এখন পাওয়া যাইবে কি না? পরদিন প্রাতঃকালে বহু পরিশ্রমের পরে কাগজগুলি খুঁজিয়া পাওয়াতে আনন্দের সীমা রহিল না; কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সকল সমস্যা-পূরণ-কবিতা কালী দিয়া লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহা অনায়াসে পড়িতে পারা গেল, কিন্তু উড্-পেন্সিল্ দিয়া যে সকল কবিতা লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ কবিতা সহজেই পড়িতে পারা গেল বটে, কিন্তু আর কয়েকটী কবিতা একবারেই পড়িতে পারা গেল না। বড়ই দুঃখ রহিল যে, প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানী-কন্যা রাণী-ভবানীর সম্বন্ধে ৪।৫টী সমস্যা কিছুতেই পড়িতে পারিলাম না। মহারাজ

নন্দকুমারের (ক) ফাঁসির সম্বন্ধে এই গ্রন্থে ১২০ পৃষ্ঠে যে সমস্তটা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহারও কয়েক পংক্তি পড়িতে পারি নাই। এজন্য সেই সেই স্থানে * * * এইরূপ তারাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

(ক) মহারাজ নন্দকুমারের কন্যার বংশধর-গণ যে এখনও কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তাহা অনেকে জানেন না। নন্দকুমারের সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। "রায়" তাঁহাদের প্রকৃত উপাধি নহে,—"চক্রবর্ত্তীই" তাঁহাদের প্রকৃত কুলক্রমাগত উপাধি। নন্দকুমার বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নন্দকুমারের স্ত্রীর নাম "ক্ষেমঙ্করী"। ক্ষেমঙ্করীর গর্ভে ১টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—রাজা গুরুদাস (স্ত্রীর নাম জগদম্বা), সম্মানী বা সোণামণি (স্বামীর নাম জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দময়ী ও কিনুমণি (আলোকমণি)। জ্যেষ্ঠ জামাতা জগচ্চন্দ্র নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এই হেতু নন্দকুমার তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। আনন্দময়ীর সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। ভাটপাড়া-নিবাসী রাম্রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র রাধাচরণের সহিত উক্ত কিণুমণির (আলোকমণির) বিবাহ হইয়াছিল। এই রাধাচরণের নবাব-দত্ত উপাধি "বাবু" ও "রায়"। ইনি মুরশিদাবাদের নবাব মোবারক-উদ্দৌলার উকীল ছিলেন, এবং কলিকাতায় ইংরাজ-দরবারে গিয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিতেন। নন্দকুমার স্বীয় কনিষ্ঠ জামাতা রাধাচরণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কলিকাতার উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী ভাটপাড়ায় রাধাচরণের বাস ছিল। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; হুগলী হইতে গঙ্গাপারে গিয়া ভাটপাড়ায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দরবার করিতে হইত। রাধাচরণ বিলক্ষণ সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্য, কার্য্যপটু ও সদ্বংশজাত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকেই জামাতৃ-রূপে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার হস্তে কনিষ্ঠা কন্যা কিণুমণিকে (আলোকমণিকে) অর্পণ করিয়াছিলেন। কিণুমণির একমাত্র পুত্র নবকুমার। নবকুমারের দুইটী পুত্র হইয়া-ছিল,—তারকনাথ ও দ্বারকানাথ। তারকনাথের প্রথম-পক্ষীয় পুত্র মহেন্দ্র, কন্যা কৃষ্ণভাবিনী ও কৃষ্ণচন্দ্র; দ্বিতীয়-পক্ষের পুত্র গোপাল ও কন্যা পরমেশ্বরী। মহেন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র। এই সতীশচন্দ্র, পরম-পূজনীয় স্যার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরম-পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরূপ পুত্র। পিতা, সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে বাঙ্গালা-সাহিত্যের যেরূপ পুষ্টি-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুইটী পুত্র, বোধ হয়, তাঁহা অপেক্ষা

সরস্বতী মহাশয়ের ভগিনী-পতি। সতীশচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র একণে বিলাতে রহিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র হৃষীকেশ। কৃষ্ণভাবিনীর পুত্র হরিকিশোর, রঘুকিশোর, দেবকিশোর ও ব্রহ্মকিশোর। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রই হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত হেড্-মাষ্টার ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ছয় পুত্র,— মহেশচন্দ্র, ভবেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, কুঞ্জবিহারী ও বিপিনবিহারী। ভবেশ-চন্দ্রের পুত্র শৈলেশচন্দ্র ইত্যাদি। ডাক্তার রমেশচন্দ্র কৃতবিদ্য ও সহৃদয় পুরুষ এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। ইহাঁর একটীমাত্র পুত্র রাধারমণ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় দিয়া একখানি পাণ্ডুলিপি ইংরাজী-ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে নিম্ন-লিখিত অপ্রকাশিত অংশটুকু উদ্ধৃত হইল :—

Extracts from "Reminiscences and Memoranda" left by Babu Krishna Chandra Roy, late Head Master, Hindu and Hare Schools :—

(1) "* * * It is a pity that no one knows precisely what the Maharajah's patronymic was. Some people say, he was a *Chakravarty* * * *"

(2) "There was a beautiful spacious hall at our Bhatpara house, with ornamental wood-works in it and the floor quite like polished marble. It was pointed out to us, when we were young, as the place where the Maharaja held his durbar."

(3) "My great grandfather, *Babu* Radha Charan *Roy*......held the post of Vakil, Ambassador of the Nawab Mobarak-ud-dowla of Murshidabad. I can form no precise idea of the nature of his duties as such ; but most probably he acted as the representative of the Nawab in his dealings with the English in Calcutta, and

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অধিকতর পুষ্টি-সাধন করিতেছেন। হরিদাস বাবু কাব্যামোদী, সুরসিক ও সুবক্তা। কাব্যরসের অবতারণা করিলে তিনি আহ্লাদে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতার রস-গ্রহণে তিনি বিশেষ দক্ষ। হরিদাস বাবুর সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, হরিদাস বাবুর মুখ দিয়া একটীও নিরর্থক বাক্য বাহির হয় না। তাঁহার এক একটী কথা রসের উৎস-স্বরূপ; তাঁহার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রোতার হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া যায়। তিনি এরূপ এক একটী শব্দ প্রয়োগ করেন যে, তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। তিনি নিতান্ত কাব্যামোদী বলিয়াই ঘটনা-চক্রে আমার ৩২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কীটদষ্ট খাতাখানি এতদিন পরে মুদ্রিত হইল। রস-সাগর ব্যতীত বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণে পারদর্শী কবি আর দেখা যায় না। সুতরাং এতদিন পরে যে বাঙ্গালা-ভাষার পরিপোষক এই দুর্লভ

had also something to do with the Imperial Court at Delhi, wherefrom he obtained the title of *Roy Rayan*. The *Sanad* conferring this title, with the Imperial seal on it *(Badshahi Panja)* was in my father's possession. For some reason or other, it was sent by him to the Governor-General's Agent at Murshidabad, who never returned it."

4 "The Maharajah's daughter occupied two rooms in the third storey of our house at Bhatpara and it used to be said that she seldom came downstairs, but spent the greater part of her time in prayers and pujahs undisturbed. She was known as *Alokemani* and not *Kinumani*. How this came about I cannot say. Very curious the whole house had gradually given way for want of repairs, but those two rooms stood entire, undamaged by the ravages of time. About 12 years ago (now it is 1905) I had to knock them down as unsafe."

কবিতাগুলি প্রচারিত হইল, তাহা হরিদাস বাবুর কৃপা-বলেই বলিতে হইবে। এই হেতু তাঁহার নিকটে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নবদ্বীপ-নিবাসী কবি-কুল-চূড়ামণি স্বর্গত মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থে রস-সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও সমস্যা-পূরণ সম্বন্ধে একটী সুদুর্লভ সংস্কৃত শ্লোক ও বহুবিধ সংবাদ দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কোথাও কোন নূতন সংবাদ বা সমস্যা পাইলে তাহা তিনি স্বয়ং আমার বাটীতে আসিয়া অথবা পত্রদ্বারা বলিয়া দিতেন।

সাহায্যকারি-গণের নাম।

শান্তিপুর-নিবাসিনী পরম-পূজনীয়া শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী, তাঁহার সুপণ্ডিত পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, উক্ত দেবীর সহোদর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, এবং মজঃফরপুরের সুবিখ্যাত উকীল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় বি-এল্ মহাশয় রস-সাগরের জীবন-চরিত-সম্বন্ধে উৎসাহ-সহকারে নানা সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা-সংস্কৃত-প্রেস-ডিপজিটরীর ম্যানেজার, নদীয়া-জেলান্তর্গত-শ্রীপাটগাঙ্গা-নিবাসী মদীয় সহোদর-প্রতিম পরম-পূজ্য-পাদ হৃদয়বান্ ও জ্ঞানবান্ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়; টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্-এ, বি-এল্; কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রেমিক সুবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, এবং কলিকাতা-বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ দে মহাশয়ের কৃতবিদ্য পুত্র, কনিষ্ঠ-সহোদর-প্রতিম স্নেহভাজন সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দে মহাশয় "রস-সাগর" সম্বন্ধে আমাকে কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। বাগবাজার-বাস্তব্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা পরলোক-গত নন্দলাল বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মদীয় বাল্য-বন্ধু, সূক্ষ্মদর্শী সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি-এ এবং উক্ত মহাত্মার কনিষ্ঠ পুত্র রায়

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি স্বয়ং গুণী ও গুণগ্রাহী,

যিনি মৃতকল্প প্রাচীন কবি-গণের জীবন-দানে অব্যর্থ মহৌষধ,

যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের পরিপোষক,

সেই পরম-পূজ্য-পাদ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা

লালগোলাধিপতি

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

বঙ্গরত্ন, সি, আই, ই

মহোদয়ের শ্রীকর-কমলে পরম-ভক্তি-ভরে

'রস-সাগর'

সমর্পণ করিলাম।

শ্রীচরণাশ্রিত

গ্রন্থকার।

শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসু মহাশয় প্রুফ্ দেখিয়া ও কয়েকটী নূতন সমস্যা দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষ"-নামক মাসিক পত্রের স্বত্বাধিকারী ভাবুকবর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এবং ইহার সুযোগ্য সম্পাদক, শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া "রস-সাগর" গ্রন্থখানির কিয়দংশ উক্ত মাসিক-পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অসীম-জ্ঞান-ভাণ্ডার, মদীয় হৃদয়বান্ বাল্য সুহৃৎ, কান্দী-নিবাসী স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ এবং তাঁহার সাহিত্যিক, কৃতবিদ্য ও অনুরূপ সহোদর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় বর্ত্তমান গ্রন্থখানির প্রকৃত প্রণেতা। তাঁহারা উভয়েই প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ প্রেমিক ও অনুরাগী। তাঁহাদেরই কৃপা ও প্রযোচনায় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। মূল গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে, ইহা রামেন্দ্র বাবু দেখিয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায় শয়ন করিয়াও এক একটী সমস্যা-পূরণ আমার মুখে শুনিতেন এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুও একজন ভাবুক এবং বাঙ্গালা-ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ও সুলেখক। ভাবের কবিতা শুনিলে ইনিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানির সঙ্কলন-সময়ে উক্ত দুই ভ্রাতা অশেষ-প্রকারে আমার উপকার করিয়াছেন। এই হেতু, আমি ইহাঁদিগের নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

লালগোলাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর বঙ্গরত্ন সি, আই, ই মহোদয় স্বয়ং গুণী ও গুণগ্রাহী। তিনি মৃতপ্রায় প্রাচীন কবি-গণের জীবন-দানে সিদ্ধৌষধ। তাঁহার সঞ্জীবনী শক্তির প্রাবল্যে মৃতকল্প কবি "রস-সাগর" মহাশয় নব-জীবন লাভ করিলেন, এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক কোণে কতকগুলি অমূল্য রত্ন সংগৃহীত ও সুরক্ষিত রহিল। ৺কাশীধাম-নিবাসী বহুশাস্ত্রবিৎ সাধক-

শিরোমণি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় আমার মুখে 'উদ্ভট-কবিতা' শুনিয়া এবং লক্ষাধিক 'উদ্ভট-কবিতা'-সংগ্রহে আমাকে সবিশেষ অনুরাগী দেখিয়া একদিন ৺দশাশ্বমেধ-ঘাটে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "পূর্ণবাবু! আপনি উদ্ভট-কবিতা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া প্রাচীন কবি-গণকে পুনর্জীবিত করিয়া রাখিতেছেন; এই হেতু, আপনিও দীর্ঘজীবী হইয়া পরম-সুখে জীবন-ধারণ করিবেন।" আমিও এই মহাপুরুষের মহাবাক্যটী স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রাজা বাহাদুর "রস-সাগরকে" জীবিত রাখিলেন বলিয়া তিনিও যেন পরিজন-বর্গ সহ দীর্ঘজীবী হইয়া পরম-সুখে বাস করেন। রাজা বাহাদুর অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া এই অমূল্য সমস্যা-পূরণ-কবিতা গুলি প্রকাশিত করিলেন। এই হেতু, আমার অতি আদরের ধন, এই ক্ষুদ্র "রস-সাগর" গ্রন্থখানি পরম-ভক্তি-ভরে রাজা বাহাদুরের পবিত্র-নামে উৎসর্গ করিলাম। গত তিন বৎসর ধরিয়া পুত্রশোক, কন্যা-শোক, ভ্রাতৃশোক ও নপ্তৃশোকে অভিভূত এবং সংসার-চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া বহুবিধা মানসী যন্ত্রণা অনুভব করায় গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। এই হেতু, যেন মহানুভব রাজা বাহাদুরের বিরাগ-ভাজন না হই, ইহাই ভিক্ষা।

ভদ্রকালী।
কোন্নগর পোষ্ট-অফিস, জেলা হুগলী।
৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ,
৺জগদ্ধাত্রী পূজা।
২০ নভেম্বর, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

সংগ্রাহক ও সম্পাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

রস-সাগর

কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবন-চরিত। (ক)

নদীয়া-জেলার অন্তঃপাতী মেহেরপুর-সাবডিভিসনের অন্তর্ভূত ও বাগোয়ানের সন্নিহিত 'বাড়েবাঁকা' গ্রামে ১১৯৮ বঙ্গাব্দে (১৭৯১ খৃষ্টাব্দে) রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের জন্ম।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় বিজয়রামের পুত্র, প্রাণকৃষ্ণের পৌত্র, রাজবল্লভের প্রপৌত্র এবং রামনাথের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। কৃষ্ণকান্তের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন,—তাঁহার নাম জগন্নাথ।

কৃষ্ণকান্তের পিতৃকুল।

কৃষ্ণকান্তের মাতৃ-কুলের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি যে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার মাতৃ-কুলের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারি নাই।

কৃষ্ণকান্তের মাতৃকুল।

(ক) বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস হইতে সুবিখ্যাত ও সুপরিচালিত "ভারতবর্ষ"-নামক মাসিক-পত্রে "রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী" এই নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। পৌষ ৯।১০ মাস লিখিবার পরে ইহা গ্রন্থাকারে বাহির করিতে আরম্ভ করি। রস-সাগরের জীবন-চরিত সম্বন্ধে শ্যামাধব রায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার স্ব স্ব গ্রন্থে যাহা যাহা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ ও অবলম্বন করিয়াই 'ভারতবর্ষে' রস-সাগরের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছিল। এই সকল সংগৃহীত বিষয় সম্পূর্ণ প্রামাণিক না হইতেও পারে। যাঁহারা স্বচক্ষে রস-সাগরকে দেখিয়াছেন, এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় লোক, এই জীবন-চরিত লিখিতে তাঁহাদেরই সাহায্য ও পরামর্শ

কৃষ্ণনগরে হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৫টী সন্তান,—একাক্ষী, বৈদ্যনাথ, বৈকুণ্ঠ, দক্ষিণা (কন্যা) ও রামজয়। কবি কৃষ্ণকান্ত এই দক্ষিণা-দেবীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ। এই যদুনাথের ৮টী সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান ভবতারিণী দেবী ও অষ্টম সন্তান কেদারনাথ। ভবতারিণী দেবী এখনও জীবিতা। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ন্যূনাধিক ৮৫ বৎসর। শান্তিপুরে কাশ্যপ-পাড়ায় মদনমোহন রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সুবিদ্বান্ ও মহাত্মা পুত্র যোগেন্দ্রনাথ এক্ষণে মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত শান্তিপুরে কাশ্যপ-পাড়ায় বাস করিতেছেন। ভবতারিণী দেবী অতি বুদ্ধিমতী নারী। ইহাঁর যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহে ইহাঁর এক একটী পুত্র এক্ষণে এক একটী রত্ন-স্বরূপ হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেদারনাথ এক্ষণে চাঁচল-ষ্টেটের খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার। হরেকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামজয়ের

কৃষ্ণকান্তের শ্বশুর-কুল।

গ্রহণ করিয়াছি। নবদ্বীপ-নিবাসী কবি-কুল-তিলক পরম-পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শান্তিপুর-কাশ্যপপাড়া-নিবাসী পরম-পূজনীয় স্বর্গত মদনমোহন রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাতৃকল্পা শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী ও তাঁহার সুপণ্ডিত পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, চাঁচল-ষ্টেটের এঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় (ভবতারিণী দেবীর সহোদর), মজঃফরপুরের সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত উকীল শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় বি-এল্ এবং কৃষ্ণনগর-রাজবংশের দৌহিত্র সন্তান শ্রীযুক্ত কুমারনাথ রায় মহাশয়ের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই রস-সাগরের অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিত হইল। মাতৃস্থানীয়া শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত কুমারনাথ রায় মহাশয় রস-সাগরকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহাদিগের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র। গিরীশচন্দ্রের ৪টী পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম দীননাথ, দ্বিতীয় অম্বিকাচরণ, তৃতীয় হরিনাথ ও চতুর্থ সত্যনাথ। দীননাথ ও সত্যনাথ গতাসু হইয়াছেন। অম্বিকাচরণ এক্ষণে ডাক্তার: এবং হরিনাথ এক্ষণে মজঃফরপুরের সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত উকিল। হরিনাথের স্বর্গত জ্যেষ্ঠ সহোদর দীননাথ, কবি কৃষ্ণকান্তের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী রহস্য-জনক গল্প স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত বংশ-পরিচয় দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কবি কৃষ্ণকান্ত, ভবতারিণী দেবী ও কেদারনাথের পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথের এবং অম্বিকাচরণ ও হরিনাথের পিতামহ রামজয়ের ভগিনীপাত ছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের বিদ্যাধিকার।

কৃষ্ণকান্তের পূর্ব্ব পুরুষ-গণ সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অতএব তিনিও যে বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎকালে বাঙ্গালা-প্রদেশে যেরূপ বাঙ্গালা-ভাষার প্রচলন ছিল, কৃষ্ণকান্ত সেরূপ বাঙ্গালা-ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালের প্রথানুসারে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ হিন্দী, উর্দ্দু এবং পারসী ভাষাও শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণকান্তের সময়ে বাঙ্গালা প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষা-প্রণালী।

যে সময়ে (১১৯৮-১২৫১ বঙ্গাব্দ; ১৭৯১-১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) আমাদিগের সমালোচ্য কবি রস-সাগর মহাশয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব, সে সময়ের কথা স্বতন্ত্র। সে সময়ে লোকের জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ আস্থা ছিল না; বিশেষতঃ তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের মত বাঙ্গালা-ভাষার তাদৃশী আলোচনা ও পরিপুষ্টি হয় নাই। রস-সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও তৎকৃত বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণের কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষা-শিক্ষার প্রণালী বর্ণনা করা উচিত।

কবি রস-সাগর মহাশয়ের যে সময়ে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছিল, সে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে কোন্ ভাষার কিরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা বিধেয়। তখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। গুরু-মহাশয়-গণ এক একখানি গ্রামে এক একটি "পাঠশালা" খুলিয়া তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা প্রায়ই কায়স্থ-জাতীয় ছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বর্দ্ধমান-জেলা হইতে আসিয়া স্থানে স্থানে "পাঠশালা" খুলিয়া বসিতেন। পাঠশালার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন হইত না। সাধারণতঃ কোন ভদ্রলোকের চণ্ডীমণ্ডপেই "পাঠশালা" বসিত। প্রথমতঃ, বালকগণ মাটীর উপরে ক, খ, ইত্যাদি লিখিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিত। দ্বিতীয়তঃ, বানান্ লিখিবার ও অঙ্ক শিখিবার জন্য তাহারা তাল-পত্র বা কদলী-পত্র ব্যবহার করিত। পরিশেষে জমীদারী-কার্য্যে জ্ঞানলাভ ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য-সাধন করিবার জন্য তাহারা কাগজ ব্যবহার করিত। চারি বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সংসারে প্রবেশ করিতেন। ছাত্রগণের হস্তাক্ষরের প্রতি গুরু-মহাশয়-গণ বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে লোকের যেরূপ সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ শিক্ষিত লোকের সেরূপ হস্তাক্ষর অতি বিরল। তৎকালে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার বা কথা কহিবার প্রথাই ছিল না। কথা কহিবার বা লিখিবার সময় স্থানে স্থানে অনেক পারসী ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত। জমীদারী সেরেস্তায় হিন্দু মুন্সীগণ প্রায় কিছু কিছু সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিতেন; কিন্তু পত্র-মধ্যে পারসী ও হিন্দী শব্দও ব্যবহার করিতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণ বাঙ্গালা-ভাষায় কথা কহিতেন; কিন্তু পত্রাদি লিখিবার

সময়ে সম্পূর্ণ সংস্কৃত-ভাষা কিংবা সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহার করিতেন।

ধনাঢ্য লোকদিগের মধ্যে কিরূপ ভাষা শিক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, এস্থানে তাহারও উল্লেখ করা উচিত। রাজপুত্র, রাজদৌহিত্র ও রাজার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-গণের পুত্রগণ পারসী-ভাষা শিক্ষা করিতেন। তৎকালে পারসী-ভাষা-শিক্ষা বিলক্ষণ অর্থকরী ছিল, কিন্তু রাজ-সংসারে দুই একটী কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ইহার উপযোগিতা না থাকায় সাধারণ লোকে ইহা শিক্ষা করিত না। নবাব-সরকারের লোকগণের এবং ফৌজদার প্রভৃতি সম্রাটের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-গণের সহিত কথোপকথনে ও লেখন-পঠনে উর্দ্দু ও পারসী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার প্রচলন না থাকায় রাজা ও তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-গণ বাল্যকালে এই দুইটী ভাষা শিক্ষা করিতেন; যে সকল নগরে নবাব ও ফৌজদার থাকিতেন, সেই সকল নগরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেই এই দুই ভাষার বিশেষ আলোচনা হইত। পরে ইংরাজ-বাহাদুর এই দেশ অধিকার করিলে মুসলমান নবাবদিগের প্রথানুসারে সকল বিচারালয়েই এই দুইটী ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ বিধি অনুসারে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-প্রদেশে প্রত্যেক জেলার বিচারালয়ে পারসী-ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা-ভাষার ব্যবহার হইতে লাগিল। সুতরাং সেই সময় হইতেই হিন্দু-সমাজ-মধ্যে, এমন কি মুসলমানদিগের মধ্যেও, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা-ভাষারই সমধিক সমাদর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রস-সাগর যে সংস্কৃত-ভাষায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার সমস্যা-পূরণ কবিতা পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার

কৃষ্ণকান্তের সংস্কৃত-ভাষা-জ্ঞান ও সাংসারিক অবস্থা।

এমন অনেক সমস্যা-পূরণ কবিতা আছে যে, তাহারা কোন সংস্কৃত-গ্রন্থস্থ শ্লোকের বা কোন সংস্কৃত-উদ্ভট-কবিতার অবিকল অনুবাদ বা ভাবার্থ লইয়াই রচিত।

(ক) তিনি কৃতবিদ্য হইলেও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। এই হেতু, তিনি ভাগ্য-বর্দ্ধন-মানসে 'বাঁড়েবাঁকা' পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কথা এই, কৃষ্ণনগরই তাঁহার লীলাভূমি। কৃষ্ণনগরে আসিয়া ও মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভা-পণ্ডিত হইয়াই তিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর-রাজবংশ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গিরীশ-চন্দ্র।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবন-চরিত লিখিতে হইলে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের কথা উল্লেখ করা চাই; কারণ, তাঁহাকে আজীবন এই রাজ-বংশেরই আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পবিত্র কৃষ্ণনগর-রাজবংশ দয়া, দাক্ষিণ্য ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলা-প্রদেশে দ্বিতীয়

(ক) প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে "এডুকেশন গেজেট", "হিতবাদী" প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে উৎকৃষ্ট ভাব-ঘটিত বহু-সংখ্যক 'সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা' বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-শ্লোক-মালা" ও "স্তব-সমুদ্র প্রথম-ভাগ" নামক দুই খানি পুস্তকে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে রস-সাগর মহাশয়কে এরূপ সমস্যা-পূরণ করিতে হইয়াছিল যে, তিনি কোন না কোন প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের অবিকল পদ্যানুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি শ্লোক গুলির এরূপ প্রাঞ্জল ও সুমধুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন যে, উক্ত শ্লোক গুলির অনুবাদ-সময়ে আমি স্বয়ং তাহা গ্রহণ

'বিক্রমাদিত্য' ছিলেন ; তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বাঙ্গালা-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের যেরূপ সুনাম ও গুণ-গরিমা ছিল, তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে সেরূপ ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময় হইতেই কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সুনাম-মহিমা ও ঐশ্বর্য্য-গরিমা প্রতিদিন হীয়মান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র ধর্ম্ম-চিন্তায় নিরত থাকিতেন ; কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র বিষয়-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহার রাজ-সংসারে বিষম অর্থাভাব ও নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ অর্থকষ্ট হইলেও উদার-চেতাঃ গিরীশ-চন্দ্র, স্বীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত-গণের সমাদর করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত কৃষ্ণকান্তের পরিচয়।

কি সূত্রে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরের তাৎকালিক মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থানে বিশেষ উল্লেখ্য বিষয়। কথিত আছে যে, কৃষ্ণকান্ত, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের রাজ-সংসারে যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় মহারাজ তাঁহার জমি ক্রোক্ করিয়াছিলেন। যে জমী ক্রোক্ করা হইয়াছিল সে জমী তৎকালে ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা পাইতেছিল। ধান্যগুলি শাঁস মুখে লইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, কিছুদিন পরেই পাকিয়া উঠিবে, এরূপ সময়েই মহারাজ গিরীশচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের বহু আদরের ও আশার বস্তু জমীটুকু ক্রোক্ করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকান্ত অনন্যোপায় হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত কবিতাটী পাঠ করিলেন :—

করিবার লোভ-সংবরণ করিতে পারি নাই। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থে এমন বাঙ্গালা কবিতা আছে যে, তাহা মৎ-প্রণীত উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়েও দৃষ্ট হইবে।—গ্রন্থকার

"অচিরপ্রসবা লক্ষ্মীঃ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা চ যা।
সা পুংবদ্ভাবমাপন্না হঠাৎ কোরকতাং গতা॥" (ক)

শ্লোকার্থঃ। লক্ষ্মীঃ—কমলা; পক্ষে ধান্যম্। অচিরপ্রসবা—অচিরেণ নৈরন্তর্য্যেণ প্রসবো গর্ভমোচনং যস্যাঃ সা, লোকমাতৃত্বাদ্ ইতি ভাবঃ; অচিরেণ স্বল্পেনৈব কালেন প্রসবঃ ফলোৎপত্তির্যস্যাঃ সা লক্ষ্মীঃ কমলা, পক্ষে ধান্যরূপা। কৃষ্ণো মাধবঃ, পক্ষে কৃষ্ণকান্ত-কবিঃ। পুংবদ্ভাবমাপন্না—পুরুষবৎ বন্ধ্যাভাবমাপন্না প্রাপ্তা, যথা বন্ধ্যা নারী ন প্রসূতা, তদ্বদিত্যর্থঃ; পক্ষে পুংবদ্ভাবমাপন্না অফলেত্যর্থঃ। কোরকতাম্—মুকুলাবস্থাম্, পক্ষে 'ক্রোক' ইতি প্রসিদ্ধঃ পারসীকঃ শব্দঃ, তস্য ভাবস্তাম্।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কৃষ্ণকান্তের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে মহারাজের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ নিতান্ত দয়ালু ও উদার-চেতাঃ ছিলেন। এজন্য তিনি এরূপ একটী সুকবিকে স্বীয় সভা-পণ্ডিত করিবেন বলিয়া মনে মনে কৃত-সংকল্প হইয়া তাঁহার মাসিক ৩০৲ (ত্রিশ) টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণকান্ত যে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি লইতেন, তাহা তিনি স্বীয় টোলঘরে নিম্নলিখিত সমস্যা-পূরণ কবিতায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—

(ক) নবদ্বীপ-নিবাসী কবি-কুল-চূড়ামণি পরম-পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার প্রতি সবিশেষ স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। তিনি একদিন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার বাটীতে আসিয়া উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে উপরি-উক্ত গল্পটী শুনিয়াছিলাম। রস-সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও সমস্যা-পূরণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকটে আজীবন উপকৃত ও কৃতজ্ঞ রহিলাম।—গ্রন্থকার

ত্রিদশ মুদ্রার কাত্, তিন মাস উপোস
ত্রাহি ত্রাহি নাথ ! বজ্রাঘাত আর সয় না ॥
(১১ পূরণ-কবিতা দেখুন)

রস-সাগর যে সময়ে মহারাজের সভাসদ্ হইলেন, সে সময়ে কৃষ্ণনগরে খাদ্য-দ্রব্যের কিরূপ মূল্য ছিল, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক। "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত"-রচয়িতা মহাত্মা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র রায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম :—

"৪০ বৎসর পূর্ব্বে [অর্থাৎ ১২৪২ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে] আমরা দেখিয়াছি যে, এ প্রদেশ-মধ্যে তণ্ডুলের মণ ৸৹ আনা; কলাই, ছোলা ও অরহরের মণ ॥৹ আনা; মুগের মণ ১৲ টাকা; তৈলের মণ ৫৲ টাকা; ঘৃতের মণ ১০৲ টাকা; মটর, খেঁসারি ও মসুরির মণ ।৵৹ আনা ছিল। অন্য অন্য খাদ্যও এইরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বে এই সকল দ্রব্যের মূল্য আরও অল্প ছিল।"

কৃষ্ণকান্ত প্রত্যহই মহারাজের সভায় আসিয়া তাঁহাকে কবিতা শুনাইয়া যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মুখে মুখে পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা-রচনা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কেহ কোন বাঙ্গালা-সমস্যা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া তাঁহাকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া দিতেন। দিনের পরে দিন ও বৎসরের পরে বৎসর যাইতে লাগিল,—সেই সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের প্রতি মহারাজেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহার বড় বড় জমীদারী নিলাম হইয়া যাইতে লাগিল। রাজ-সংসারে এরূপ অর্থাভাব হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। এসম্বন্ধে একটী গল্পও এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

রামমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তি মহারাজের খাতাঞ্চী ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত ৩ মাস বেতন পান নাই। অগত্যা তিনি মজুমদারের নিকটে গিয়া মাহিনার জন্য তাগাদা করিলেন। মজুমদারও তহবিলে টাকা না থাকায় কৃষ্ণকান্তকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, তাহাও একটী সমস্যা-পূরণ-কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গিরীশ-চন্দ্রের আর্থিক অবস্থা ও কৃষ্ণকান্তকে "রস-সাগর" উপাধি দান।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র উদার-চেতাঃ ও কোমল-হৃদয় পুরুষ ছিলেন। তিনি দিবানিশি দেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার কিছুমাত্র বিষয়-বুদ্ধি না থাকায় তিনি বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আর্থিক কষ্ট সমধিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে শান্তি রাখিবার জন্য তিনি কৃষ্ণকান্তকে লইয়া সমস্যা-পূরণ করাইয়া নির্ম্মল শান্তি-সুখ অনুভব করিতেন। সমস্যা-পূরণে কৃষ্ণকান্তের অতুল শক্তি দেখিয়া এই সময়ে মহারাজ পরম-প্রীতি-ভরে তাঁহাকে "রস-সাগর" উপাধি দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকান্তও সেই মহারাজ-প্রদত্ত উপাধি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক) তাঁহার যশোগরিমা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত

(ক) শান্তিপুর-বাস্তব্য ৺ লালমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি মহাশয় "সম্বন্ধ-নির্ণয়"-নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে, (৩৫১ পৃষ্ঠে) রস-সাগর কবি ৺ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নাম ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যানিধি-মহাশয়-প্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রস-সাগর মহাশয় বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের দুইখানি "কুলুচি" রচনা করিয়া গিয়াছেন। একখানির নাম "বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা" এবং অপর খানির নাম "বারেন্দ্র-বংশাবলী"। রস-সাগর-প্রণীত এই "বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকায়" "ভরদ্বাজ-গোত্রের" বিবৃতি-স্থলে নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:—

হইয়া পড়িল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকে রাজসভায় আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রস-সাগর ঘাটে, বাটে, মাঠে ও রাজ-সভায় আপনার কবিতা শুনাইয়া ও রসিকতার ফোয়ারা ছুটাইয়া সাধারণের নিকটে অতি আদরের ধন হইয়া উঠিলেন।

এখন হইতে আমরা কৃষ্ণকান্তকে "রস-সাগর" নামে অভিহিত করিব। কোন কারণ-বশতঃ এক সময়ে মহারাজ রস-সাগরের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহার কয়েক মাসের বেতন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রস-সাগর মনের দুঃখে ও অভিমানে রাজ-সভায় না আসিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত সাংসারিক কষ্ট হওয়ায় স্তুীর ধ্বনি দিয়া রস-সাগর, মহারাজকে যে কবিতা শুনাইয়া ছিলেন, তাহাও একটী সমস্যা-পূরণ-কবিতায় পাঠক-গণ দেখিতে পাইবেন।

"ভরদ্বাজ মহামতি গৌতম সুধন্য।
পুত্রে যশে তোরে দেখি তাঁর আছে পুণ্য॥ (১)
গৌতমের অধস্তন ত্রয়োবিংশাপত্য।
মধু-মৈত্রে কন্যা-দানে নৃসিংহই সত্য॥ (২)
নৃসিংহের প্রপৌত্র সুবেরাদ্বৈত-পিতা।
অদ্বৈত শিবাবতার, চৈতন্যের মিতা॥ (৩)
'কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী' কুলীনের সন্তান।
ভণিল বারেন্দ্র-দ্বিজ-বংশ-গুণ-গান॥ (৪)
তাহে দেন উপনাম 'রসের সাগর'।
'নবদ্বীপ-ভূপ' করি বহু সমাদর॥" (৫)

শেষোক্ত দুইটী কবিতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী' মহাশয় অত্যন্ত কুলীন-ব্রাহ্মণ ছিলেন; এবং 'নবদ্বীপ-ভূপ' (মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র) 'বহু সমাদর' করিয়া তাঁহাকে 'রসের সাগর' (রস-সাগর) এই 'উপনাম' (উপাধি) প্রদান করিয়াছিলেন।

রস-সাগর মহাশয় বাস্তবিকই 'রসের সাগর' ছিলেন। যখন তিনি ছোট ছোট মজলিসে বসিতেন, তখন তাঁহার রসের ফোয়ারা ছুটিত। কিন্তু যখন তিনি বড় বড় মজলিসে থাকিতেন, তখন তাঁহার রসের সাগর উথলিয়া উঠিয়া চারিদিক্ প্লাবিত করিয়া দিত। কেহ কোন রসের কথা বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিলে তিনি এরূপ সরস-ভাবে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন যে, পরিহাসকারীকে অপ্রভিত হইয়া নিরুত্তর থাকিতে হইত। রস-সাগরের যেরূপ রসিকতা ছিল, তাঁহার সেইরূপ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বও বিরাজ করিত। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক রসিকতার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল:—

রস-সাগরের রসবত্তা।

১ম গল্প।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে রাজ-সংসারে অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল। এজন্য রস-সাগরের তিন মাসের বেতন বাকী ছিল। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে কলস-উৎসর্গ করিবেন বলিয়া রস-সাগর মহাশয় তৎপূর্ব্ব দিবসে মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতন আনিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াতে তিনি বিষণ্ণ-বদনে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কতকগুলি বয়স্য-সমভিব্যাহারে যুবরাজ সভায় বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আজ নূতন কি?" রস-সাগর উত্তর করিলেন, "শাস্ত্রকার-গণ কহিয়াছেন, কোন পিতৃ-ক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। একারণ আমি কিয়ৎক্ষণ মজুমদারের নিকটে রোদন করিয়া আসিলাম।"

২য় গল্প।

কোন সময়ে নদীয়া-জেলায় কোন জমীদারদের বাটীতে রাজসভান্বিত যাবতীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সুতরাং রস-সাগরকেও সেস্থানে যাইতে হইয়াছিল। কর্ম্মকর্ত্তা, গুরুর সহিত যে গৃহে বসিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে বিদায় করিতেছিলেন, সেই গৃহের প্রবেশ-দ্বার আয়তনে কিছু ক্ষুদ্র ও নিম্ন। এজন্য উন্নতকায় রস-সাগর বিদায়-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় মস্তকে কিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আহা! আপনাকে বড় লাগিয়াছে।" রস-সাগর কহিলেন, "কি করি, ছোট দুয়ারে ত কখনই আসা অভ্যাস নাই!" ইহা শুনিয়া কর্ম্মকর্ত্তা ও সমবেত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণ অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩য় গল্প।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নামক একজন প্রসিদ্ধ পাঁচালি-ওয়ালা কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার মত পাঁচালি-ওয়ালা তৎকালে এ প্রদেশে অতি বিরল ছিল। তিনি যেরূপ সুরসিক ও সুচতুর, সেইরূপ আবার সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন। দুঃখের কথা এই যে, তাঁহার একটীমাত্র চক্ষু ছিল। এই সময়ে নদীয়া-জেলায় একজন ধনাঢ্য বৈদ্য জমীদার বাস করিতেন। তিনি এই লক্ষ্মীকান্তের পাঁচালি, গান ও ছড়া শুনিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা হইতে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে রস-সাগরকেও সমাদর-পূর্ব্বক আহ্বান করেন। উভয়ের মধ্যে রসিকতা ও বাক্-পটুতায় যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়াই বৈদ্য-মহাশয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের অধিকার-মধ্যে কোন বৈদ্যই গলদেশে যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিতে পারিতেন না। যে গ্রামে এই বৈদ্য জমীদার

মহাশয়ের বাস, সেই গ্রাম অন্য রাজার অধিকার-ভুক্ত হওয়ায় সেই স্থানের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের মত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। রস-সাগর আপনার পৈতায় এক কড়া কড়ি বাঁধিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। এক জন, কড়ি বাঁধিবার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে রস-সাগর উত্তর করিলেন "এ বামুণে পৈতে।" ইহা শ্রবণ করিবামাত্র সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং বৈদ্যগণ লজ্জিত ও অপ্রাতিভ হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীকান্ত এক-চক্ষুহীন এবং রস-সাগর শ্রীহীন ছিলেন। "আসুন আটপুণে ঠাকুর!" এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত রস-সাগরের সংবর্দ্ধনা করিলেন; রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ "থাক্ রে ব্যাটা চারপুণে" বলিয়া লক্ষ্মীকান্তের কৃত্রিম শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। সভাস্থ লোক সকল উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি বাক্-চাতুরী হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "প্রথম সম্ভাষণকারী লক্ষ্মীকান্তকেই ইহা জিজ্ঞাসা করুন।" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিলেন, "এই ঠাকুরটীর আটপুণের (দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের) মত চেহারা কি না দেখুন।" রস-সাগর প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি আটপুণে বটে, কারণ আমার দুই চোক, কিন্তু এ ব্যাটার চারি পোণে এক চোক।" ইহা শ্রবণ করিবামাত্র সভাস্থ লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

৪র্থ গল্প।

একদিন সন্ধ্যাকালে রাঢ়-প্রদেশীয় একদল যাত্রা-ওয়ালা "কালিয়-দমন যাত্রা" করিবার মানসে কৃষ্ণনগরে 'আনন্দময়ী দেবীর' সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। রস-সাগর ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু আনন্দময়ী-দর্শনে গমন করিয়া যাত্রার দলের সন্ধান লইলেন, এবং সেই রাত্রিতেই পাড়ার

মধ্যে তাহাদের গানের বায়না করিলেন। নিয়মিত সময়ে গাওনা আরম্ভ হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি যশোদা সাজে, হঠাৎ সে ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হইল। পাছে আমোদ-ভঙ্গ হয়, ইহা দেখিয়া সকলেরই অনুরোধে রস-সাগর 'যশোদা' সাজিলেন। ব্রজাঙ্গনা-গণ যশোদার নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিল, "মা যশোদে! তোমার কৃষ্ণ আমাদের ননী চুরি ক'রে খেয়েছেন।" ইহা শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে কহিলেন, "বাপু কৃষ্ণ! চুরি করায় মহাপাপ। এমন কর্ম্ম আর কখনই করো না।" ব্রজাঙ্গনা-গণ দ্বিতীয়-বার ঐরূপ অভিযোগ করিল। যশোদা পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে কহিলেন, "কৃষ্ণ! কাজ বড়ই অন্যায় হচ্ছে। আমি একবার বারণ করেছি। তথাপি তোমার চৈতন্য হলো না। আবার যদি কাণে শুনি, তুমি ঐরূপ কার্য্য করেছো, তা হ'লে আমি তোমাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিব।" ব্রজাঙ্গনা-গণ তৃতীয়-বার আসিয়া অভিযোগ করিল, "মা যশোদে! কৃষ্ণের জ্বালায় আর আমাদের এখানে বাস করা চলে না। এবার শিকে ছিঁড়ে ভাঁড় ভেঙ্গে ননী চুরি ক'রে খেয়েছে।" এই কথা শুনিবামাত্র যশোদা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাম-হস্তে কৃষ্ণের চূড়া ধরিলেন, এবং দক্ষিণ-হস্তে কৃষ্ণের ডান গালে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, "ব্যাটাকে দুই বার বারণ করেছি, তথাপি চুরি! আজ ননী চুরি, কাল ক্ষীর চুরি, পরশু ঘটী বাটী চুরি,—এই রকম ক'রে কি আমাকে ফাঁসাবে মনে করেছ?" প্রহারের চোটে অস্থির হইয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিতে লাগিল, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং শ্রোতারা হাসিয়া মজলিস্ ফাটাইয়া দিল।

এই গল্পটী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন যে, রস-সাগর যেরূপ পদস্থ ও সম্মানী লোক ছিলেন, তাহাতে তিনি যে একটা যাত্রার দলে যশোদা সাজিবেন, এরূপ কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, রস-সাগর মহাশয়ই

এই ঘটনার অধিনায়ক ছিলেন। তবে ইহা কৃষ্ণনগরে সংঘটিত হয় নাই।

৫ম গল্প।

কোন সময়ে রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমীদার পাল-চৌধুরী বাবুদের বাটীতে প্রসিদ্ধ "গোবিন্দ অধিকারীর" যাত্রা হইতেছিল। ইহার পূর্ব্বে সেই অঞ্চলে এই যাত্রা আর কখনই হয় নাই। উক্ত বাবুদের বাটীতে এত জনতা হইয়াছিল যে, "নং স্থানং তিলধারণম্।" রস-সাগর মহাশয় কতকগুলি বন্ধু লইয়া উক্ত যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু জনতা-ভেদ করিয়া আসর-মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহারা কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কি প্রকারে আসরে প্রবেশ করা যায়, রস-সাগর মহাশয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, এক জন 'বাসুদেব' সাজিয়া সাজ-ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। তখন রস-সাগর তাহাকে বল-পূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিলেন। মুনি-গোঁসাই "বাসুদেব বাসুদেব" বলিয়া যত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন, বাসুদেব ততই চীৎকার করিয়া বলেন যে, "আমার নড়িবার শক্তি নাই। আমায় এক বামুনে ধরিয়া রাখিয়াছে।" সভাস্থ বাবুরা অবাক্ হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, রস-সাগর বাসুদেবকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। তাঁহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রস-সাগর কহিলেন, "বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কিরূপে এই দুস্তর সাগর পার হইয়া স্বর্গরাজ্যে অধিকার লাভ করিতে পারি?" তখন তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুগণকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া অতি উত্তম স্থানেই বসাইয়া দিলেন।

এই গল্পটীর সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে; কেহ কেহ কহেন, রস-সাগর মহাশয় স্বয়ং বাসুদেবকে ধরেন নাই। তাঁহার সঙ্গী ও পরমাত্মীয়

বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় (ক) বাসুদেবকে ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় অতি সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তবে রসের সাগর রস-সাগর মহাশয় যে এই অভিনয়ের পরামর্শ-দাতা, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৬ষ্ঠ গল্প। (খ)

একদিন রস-সাগর মহাশয় কোন ধনাঢ্য লোকের বাটীতে বিদায় লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শোভাবাজার-বালাখানায় বড় রাস্তার দুই পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণিকা বাস করিত। রস-সাগর যখন রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলেন, তখন এক শ্রীমতী তাঁহার শ্রীমানের সহিত দুতোলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া প্রেমালাপ করিতে ছিল। শ্রীমতী নিম্ন-ভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে, একখানি দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশাঙ্গ, কদাকার মূর্ত্তি মৃদু-মন্দ-গমনে চলিয়া যাইতেছে। ইনি আর কেহই নহেন,—আমাদের রস-সাগর মহাশয়। শ্রীমতী এই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি-খানি দেখিয়া স্বীয় শ্রীমান্‌কে বলিলেন, "দেখ দেখ, এক খানি ইকাবনের টেক্কা যাইতেছে"। রসের সাগর রস-সাগর মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। রসালাপ তাঁহার রসনাগ্রেই বিরাজ করিত। শ্রীমতীর উক্ত রসাত্মক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রস-সাগর মহাশয় ঊর্দ্ধদিকে

(ক) বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়, শান্তিপুর-নিবাসিনী মাতৃস্থানীয়া ভবতারিণী দেবীর ও টাচল-ষ্টেটের এঞ্জিনিয়ার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের পিতামহ, এবং মজঃফরপুরের প্রসিদ্ধ উকীল পরম-পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় বি-এল মহাশয়ের পিতামহ রামজয় রায় মহাশয়ের সহোদর। বৈকুণ্ঠনাথ ও রামজয়, রস-সাগর মহাশয়ের জ্যাঠা ছিলেন।

(খ) এই গল্পটী নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

শ্রীমতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রঙের বিবি দিয়া ইস্কাবনের টেক্কা খানা মেরে নাও!" মুখের মত জবাব পাইয়া শ্রীমতী অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

৭ম গল্প।

নবদ্বীপ-নিবাসী কবি-কুল-তিলক অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম নীলমণি ভট্টাচার্য। নীলমণির সহিত বামাকালী দেবীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। এই বামাকালী দেবী ৺রামজয় রায় মহাশয়ের পৌত্রী ৺গিরীশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা, এবং ৺দীননাথ রায় ও শ্রীযুত হরিনাথ রায় মহাশয়ের সহোদরা। রামজয়, স্বীয় ভগিনীপতি রস-সাগর মহাশয় এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, বালক দীননাথকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে অজিতনাথ ন্যায়রত্নের বাটীতে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়াছিলেন। বিবাহ-সম্বন্ধের উপলক্ষে আহারের বিশেষ-রূপ আয়োজন হইয়া থাকে। রস-সাগর মহাশয় রাত্রিকালে আকণ্ঠ ভোজন করায় পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার পেটের অসুখ দেখা দিল। প্রস্রাব করিতে বসিলা তিনি অশমল হইলেন এবং বালক দীননাথকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন, "কালমাণিক! খুঁচি দিতে উঁচিয়ে ফেলিছি; এক গাড়ু জল নিয়ে এস!" (ক)

(ক) নীলমণি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া রস-সাগর মহাশয় আদর করিয়া তাঁহাকে 'কালমাণিক' বলিয়া ডাকিতেন। ৭ম গল্পটী নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও মজঃফরপুরের উকীল শ্রীহরিনাথ রায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি।

৮ম গল্প।

এক সময়ে রস-সাগর মহাশয়, তাঁহার শ্যালক-পুত্র গিরীশচন্দ্র রায় ও বাটীর কয়েক জন এবং অন্যান্য কয়েকটী প্রতিবেশীকে লইয়া কোনস্থানে বরযাত্র হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে কন্যাকর্ত্তা মহাশয় যে জলখাবারের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিজা ছোলার ভাগ প্রচুর এবং মিষ্টান্ন ও ফলের ভাগ অতি অল্পই ছিল। মিষ্টান্ন-রস-প্রিয় রস-সাগর মহাশয় ইহা দেখিয়াই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কন্যাকর্ত্তাকেও এ বিষয় জানাইতে তিনি লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। তখন রস-সাগরের পরামর্শানুসারে সকলে মিলিয়া দুই হাতে রেকাব তুলিয়া ভিজা ছোলা খাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার ন্যায় এক একবার 'চিঁহি চিঁহি' 'চিঁহি চিঁহি' শব্দ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া কন্যাকর্ত্তা ও অন্যান্য কন্যাপক্ষীয়-গণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং ক্রুদ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণনগরের রায়-বংশীয় গণ অতি ভদ্র ও মহাশয় লোক; তবে বিবাহ দিতে আসিয়া এরূপ হ্রেষা-রব করিতেছেন কেন? "ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া কি ভদ্রলোক এরূপ করিয়া থাকেন?" তদুত্তরে রস-সাগর মহাশয় কন্যাকর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমাদের অপরাধ নাই। সম্মুখে প্রচুর দানা (ভিজা ছোলা) দেখিয়া আমরা মনুষ্য-জন্ম ভুলিয়া গিয়াছি, এখন অশ্ব-জন্ম মনে পরিতেছে।" এই কথা শুনিয়া কন্যাকর্ত্তা ও অন্যান্য লোকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচুর-পরিমাণে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল আনাইয়া দিলেন। তখন রস-সাগর মহাশয় ও অন্যান্য বরযাত্র-গণ ষোড়শোপচারে উদরের সেবা করিতে লাগিলেন।

৯ম গল্প।

মেটে আলুর প্রতি রস-সাগর মহাশয়ের বিষদৃষ্টি ছিল। ইহা খাওয়া দূরে থাকুক, তিনি ইহার গন্ধ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহা স্পর্শ করিলে, বোধ হয়, তাঁহার মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগরে কনিষ্ঠ শ্যালক রামজয় রায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। একদিন সংসারে খরচ করিবার জন্য কিছু মেটে আলু কিনিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। রস-সাগর বাহির হইতে বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বমি আরম্ভ হইল। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "অকারণে আমার এত বমি হইতেছে কেন? নিশ্চিতই কেহ মেটে আলু বাটীতে আনিয়াছে।" তখন তাঁহার শ্যালক-পুত্র গিরীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, বাস্তবিকই একটী ঘরের এক কোণে কতকগুলি মেটে আলু রহিয়াছে। আলুগুলি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহুদূরে ফেলিয়া দেওয়া হইল এবং সেই দণ্ডেই রস-সাগর মহাশয়ের বমি বন্ধ হইল। (ক)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ও রস-সাগর।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরের প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু রাজবাটীতে যথাকালে বেতন প্রাপ্ত হইতেন না বলিয়া রস-সাগরকে সাংসারিক চিন্তায় বিশেষ ব্যাকুল থাকিতে হইত। গিরীশ-চন্দ্রের দত্তক-পুত্র যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র অতীব দয়ালু, বুদ্ধিমান্ ও কৃতবিদ্য পুরুষ

(ক) ৮ম ও ৯ম গল্পটী মজঃফরপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি।

ছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই রস-সাগরকে দিয়া সমস্যা-পূরণ করাইয়া নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতেন। রস-সাগরের আর্থিক কষ্ট জানিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শ্রীশচন্দ্র বাঙ্গালা-প্রদেশের তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। তিনি অনেক সময়েই রস-সাগরকে ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্পর্কীয় সমস্যা পূর্ণ করিতে দিতেন।

রস-সাগরের পত্নী-বিয়োগ।

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভাসদ্ থাকিতে থাকিতেই রস-সাগরের পত্নী-বিয়োগ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম দক্ষিণা। দক্ষিণা যেরূপ পরম দয়াবতী ও পতিব্রতা নারী ছিলেন, রস-সাগরও তাঁহার প্রতি সেইরূপ অনুরাগী ও অনুকূল ছিলেন। সময়ে সময়ে পতির বিশেষ আর্থিক কষ্ট হইলেও তিনি তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিয়া রাখিতেন। রস-সাগর বিপত্নীক হইয়া কৃষ্ণনগরে মাঝের পাড়ায় স্বীয় শ্যালক রামজয় রায় মহাশয়ের বাটীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন।

রস-সাগরের নির্ব্বেদ।

রাজার পারিষদ হইয়া জীবন-ধারণ করিতে যেরূপ সুখ, সেইরূপ দুঃখও আছে। সময়ে সময়ে অনেকের সহিত বিচার বা বিবাদ করিয়া অশান্তি ভোগ করিতে হয়,—কখনও বা কাহার সুনয়নে, কখনও বা বিষ-নয়নে পড়িতে হয়। এইহেতু, রস-সাগরকেও সময়ে সময়ে নানাবিধ অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অবশেষে মহারাজের অনুমতি লইয়া ও তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে জামাতৃ-গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ত্রিলোক-তারিণী পতিত-পাবনী গঙ্গা-নদীর তীরে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার নিমিত্তই তিনি শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

রস-সাগর শান্তিপুরে স্বীয় জামতার বাটীতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া ১২৫১ বঙ্গাব্দে (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে) নবদ্বীপে ৺ গঙ্গা-তীরে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। শান্তিপুর-নিবাসিনী পরম-পূজনীয়া ভবতারিণী দেবী, স্বীয় সুপণ্ডিত পুত্র পরম-পূজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় দ্বারা আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—"রস-সাগর দাদা-মহাশয়ের একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিলেন। পুত্রটীর নাম যাদু, এবং কন্যাটির নাম তারা। উলা-গ্রামে চৌধুরী মহাশয়-দিগের বাটীতে যাদুর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি অল্প-বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সন্তান হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিয়া অনেক দিন থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে 'ভাদুড়ী জেঠী' বলিয়া ডাকিতাম। শান্তিপুরে হাটখোলার অন্তঃপাতী গোস্বামী পাড়ায় সান্ন্যাল দিগের বাটীতে তারার বিবাহ হইয়াছিল। তিনিও অল্প-বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান হয় নাই। তাঁহারই বাটীতে রস-সাগর দাদা মহাশয় জীবনের শেষভাগ যাপন করিয়াছিলেন। তারার শ্বশুরের ভিটা যে কোথায় ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। রস-সাগর মহাশয়ের স্ত্রী দক্ষিণা, আমার পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের সহোদরা ছিলেন। রস-সাগর দাদা-মহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স ৮।৯ বৎসর।" কেহ কেহ কহেন যে, রস-সাগরের ১টী পুত্র ও ২টী কন্যা ছিলেন;—পুত্রের নাম গিরীশচন্দ্র এবং কন্যা দুইটীর নাম শিব-সুন্দরী ও তারা-সুন্দরী। এইরূপ মতভেদ থাকিলেও ভবতারিণী দেবী যাহা বলেন, তাহাই সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া আমরা মনে করি।

রস-সাগরের মৃত্যু ও পুত্র-কন্যা।

রস-সাগর মহাশয় দেখিতে কুৎসিত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি সুরসিক, সুচতুর ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার সুরস-বাক্-পটুতায় শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহার রস-ভাব-সমন্বিত সুমিষ্ট কথায় তাঁহার নিত্য-সহচর-গণ সর্ব্বদাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন। অতি দুঃখের সময়েও লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় চিত্তকে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রাখিয়া দিতেন; সহজে কাহাকে বিষণ্ণ ও অপ্রসন্ন করিতে চাহিতেন না। তাঁহার একটী দৈবী শক্তি ছিল —তিনি প্রশ্নকর্ত্তার ভাবভঙ্গী দ্বারা তাঁহার প্রকৃত মনোগত অভিপ্রায় অনায়াসে অনুভব করিয়া লইতে পারিতেন। দ্রুত-রচনা-সম্বন্ধেও তাঁহার শক্তি অতি বলবতী ছিল। তাঁহার দ্রুত-কবিত্ব-শক্তি থাকাতেই তিনি এতাদৃশী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও ভাবের এক বা অর্দ্ধ চরণ অথবা চরণের কিয়দংশ 'সমস্যা' দিলেই তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

রস-সাগরের আকৃতি ও প্রকৃতি।

"ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত"-লেখক স্বর্গত মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগর-রাজবংশে প্রায় ৪০ বৎসর দেওয়ানী ও ১০ বৎসর অন্যান্য কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে রাজ-সংসারে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রস-সাগরকে লইয়া নানা রঙ্গ-ভঙ্গ করিতেন ও তাঁহার রসের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। দেওয়ান মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

রস-সাগরের সমস্যা-পূরণ-শক্তি।

"একদা রাজ-সভায় কোন ব্যক্তি সমাগত হইয়া রস-সাগরকে এই

সমস্যা দিয়াছিলেন, 'নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে দোলে।' নন্দ-নিকেতনে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের দুলিবার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত সমস্যা-দাতার মনে এই সমস্যার উদয় হয়। রস-সাগর সমস্যাটী পাইবামাত্র ইহা চারি চরণে পূরণ করিলেন। রাজা কবিতার অপূর্ব্ব-ভাবে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে চারি টাকা পুরস্কার দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রস-সাগর, মহারাজকে বলিলেন, 'যদি অনুজ্ঞা হয়, তবে পুনরায় আর একভাবে ছয় চরণে ইহা পূরণ করি।' মহারাজ অনুমতি দিলেন। রস-সাগর দ্বিতীয়-বার যাহা রচনা করিলেন, তাহাও অতি চমৎকার হইল। মহারাজ পুনর্ব্বার ছয় টাকা দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রস-সাগর চরণে চরণে পুরস্কার-দর্শনে উৎসাহিত হইয়া মহারাজের অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক তৃতীয়বার নূতন ভাবে আট চরণে এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।" কার্ত্তিকেয় বাবু এই উদ্ধৃত অংশের পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন, "এই কয়েকটী কবিতা আমি কবির নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ স্মরণ না থাকাতে তাহা পাঠক-গণের গোচর করিতে পারিলাম না।" তিনি স্বীয় গ্রন্থের আরও একস্থানে লিখিয়াছেন, "রস-সাগরের নিজের ও প্রাচীন লোকের মুখে তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা শুনিয়াছি, দুর্ভাগ্য-বশতঃ তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং তাঁহার গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না।"

রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তি।

রস-সাগর কেবল নামমাত্র কবি নহেন, তিনি সুকবি। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে কবিত্ব-শক্তির পরিপুষ্ট বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্রুত-রচনা সম্বন্ধে রস-সাগরের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কেহ তাঁহাকে কোন সমস্যা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। তাঁহার অন্য এক বিশেষ বলবতী শক্তি ছিল যে, প্রশ্নকর্ত্তার ভাবভঙ্গী

দেখিয়া তাঁহার মনের অভিপ্রায় অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিতেন। সংস্কৃত-ভাষায় সমস্যা-পূরণে অনেক কবি দেখা যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষায় সমস্যা-পূরণে তাঁহার মত কবি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামবাসী কবি-ওয়ালাদিগের মধ্যে দুই চারি জনকে উপস্থিত কবি দেখা যায় বটে, কিন্ত রস-সাগর সে শ্রেণীর কবি ছিলেন না; কারণ রস-সাগর যেরূপ বুদ্ধিমান্ ও বিষয়গ্রাহী, সেইরূপ তিনি একজন তত্ত্বদর্শী ছিলেন। তাঁহার কবিতায় তত্ত্বদর্শিতার সহিত রসিকতার সমাবেশ হওয়াতে মণি-কাঞ্চনের মেলন হইয়াছে। তাঁহার একটী সমস্যা-পূরণ কবিতা পাঠ করিলে মনে যেরূপ শান্তি-রসের আবির্ভাব হয়, অপর একটী কবিতা পাঠ করিলে সেইরূপ হাস্য-রসের স্রোতঃ বহিয়া যায়। এই সকল কারণেই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রস-সাগর কেবল কবি নহেন তিনি সুকবি। যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে ধারাবাহিক-রূপে নব-রসের অবতারণা সহ মহাকাব্য রচনা করিয়া এ সংসারে মহাকবি নাম প্রাপ্ত হইয়া যাইতে পারিতেন।

রস-সাগর মহাশয় যেরূপ সুরসিক ও সুচতুর, সেইরূপ আবার আমোদ-প্রিয় ও উপস্থিত-বক্তা ছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকেরই সহিত মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি স্পষ্ট কথা মুখের সম্মুখেই বলিয়া ফেলিতেন; তাহাতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না। তবে কাহাকেও কোন কিছু স্পষ্টভাবে বলিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা সরল-ভাবেই বলিতেন, এবং তাহাতে লোকের মনে কষ্ট বা ক্ষোভ হইত না। তাঁহার কবিতায় বিলক্ষণ রস থাকিত। যে কবিতাটী যে রসে রচনা করিলে তাহা বিষয়োপযোগিনী হয়, সেটি তিনি সেই রসেই রচনা করিতেন। তাঁহার কোন কোন কবিতায় ছন্দঃপতন দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, দ্রুত রচনা করিতে গিয়াই মধ্যে মধ্যে এইরূপ ছন্দঃপতন

হইত। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে কোন লোক যে কোন ভাবের সমস্যা-পূরণ করিতে দিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গুপ্তিপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অবিলম্বে সংস্কৃত-সমস্যা পূরণ করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু রস-সাগরের মত বাঙ্গালা সমস্যা পূরণ করিবার লোক বড়ই বিরল। রস-সাগর যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্তই ফরমাইস জনিত। ফরমাইশ-কবিতা বস্তুতঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। কবি স্বাধীন-ভাবে কবিতা রচনা করিলে তাহা যেমন তাঁহার মনঃপূত হয়, ফরমাইশ-অনুসারে কবিতা রচনা করিলে তাহা তেমন মনঃপূত হয় না। রস-সাগর স্বকৃত কবিতায় যে পরিমাণে কবিত্ব-শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি যে তদপেক্ষা অধিক ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার স্বরচিত সমস্যা-পূরক কতকগুলি কবিতা সংস্কৃত শ্লোকের রূপান্তর ও ভাষান্তর বলিয়াই বোধ হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। নতুবা কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকের সহিত তাঁহার স্ব-রচিত কবিতার ঠিক ঐক্য হয় কেন! যাহা হউক, ইহা দোষের বিষয় নহে। ভাব লাগাইয়া যে কোন প্রকারে সমস্যাটীর যথাযথ পূরণ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এস্থলে তিনি সংস্কৃত কিংবা যে কোন ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই।

সূচীপত্র।

সমস্যা			পত্রাঙ্ক

সমস্যা			পত্রাঙ্ক

সমস্যা			অঙ্ক

সমস্যা			পত্রাঙ্ক

ভ

সমস্যা			পত্রাঙ্ক

হ

পরিশিষ্ট।

গ্রন্থোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণের জন্ম ও মৃত্যুর সময়-নিরূপণ।

(বাঙ্গালা সাল।)

		জন্ম	মৃত্যু	বয়ঃক্রম
১।	ফতেচাঁদ জগৎশেঠ	১০৭০	১১৫০	৮০ বৎসর
২।	মহারাজ নন্দকুমার	১১১২	১১৮২	৭০ "
৩।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র	১১১৭	১১৮৯	৭২ "
৪।	ভারতচন্দ্র	১১১৯	১১৬৭	৪৮ "
৫।	রাণী ভবানী	১১২১	১২০০	৭৯ "
৬।	রামপ্রসাদ	১১২৭	১১৮২	৫৫ "
৭।	শিবচন্দ্র	১১৩৫	১১৯৫	৬০ "
৮।	মহারাজ নবকৃষ্ণ	১১৩৯	১২০৪	৬৫ "
৯।	নিধু বাবু	১১৪৮	১২৩৫	৮৭ "
১০।	ঈশ্বরচন্দ্র	১১৫৪	১২০৯	৫৫ "
১১।	গিরীশচন্দ্র	১১৯৩	১২৪৮	৫৫ "
১২।	রস-সাগর	১১৯৮	১২৫১	৫৩ "
১৩।	গোবিন্দ অধিকারী	১২০৫	১২৭৭	৭২ "
১৪।	দাশু রায়	১২১২	১২৬৪	৫২ "
১৫।	ঈশ্বর গুপ্ত	১২১৮	১২৬৫	৪৭ "
১৬।	শ্রীশচন্দ্র	১২২৬	১২৬৩	৩৭ "
১৭।	দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়	১২২৭	১২৯১	৬৪ "
১৮।	কান্ত বাধু	?	১২০০	?
১৯।	দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ		?	?

রস-সাগর

কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণ।

(১)

কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা "মহারাজেন্দ্র-বাহাদুর" (ক) সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত তদীয় বংশধর-গণও পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তদনুসারে তদীয় প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রও বিদ্যার এবং বিদ্বানের পরম সমাদর করিতেন। পরলোক-গত কবি রস-সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় স্বকীয় কবিত্ব-প্রভায় তাঁহার সভা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগর মহাশয়ের সহিত রসালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে

(ক) নবদ্বীপাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বনাম-ধন্য মহাপুরুষ। তিনি পরম বিদ্যোৎসাহী ও বিবিধ-রাজ-গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই হেতু দিল্লীর সম্রাট্ সাহালম তাঁহাকে "মহারাজেন্দ্র-বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া সেই সঙ্গে এক খানি ফরমান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ফরমানের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"একান্ত রাজানুগত, বিবিধ-গুণান্বিত এবং রাজানুগ্রহের যোগ্যপাত্র মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর অবগত হইবে যে, বর্ত্তমান শুভ সময়ে তোমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক "মহারাজেন্দ্র-বাহাদুর" উপাধি, পতাকা, নাকাড়া, ঝালরদার পাল্কী প্রদান করা গেল। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, এই অসীম অনুগ্রহের জন্য তুমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে বাদসাহের মঙ্গল-সাধনে তৎপর থাক। তারিখ সপ্তম জলুস।"

মহারাজের বিশেষ পরিচিত কৃষ্ণনগর-নিবাসী কোন ভদ্রলোক মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রস-সাগর মহাশয়েরও সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। কথায় কথায় তিনি হাসিতে হাসিতে রস-সাগর মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—" 'অতি' কথা ভাল নয়, ওহে যদুপতি!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা ঐইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—" 'অতি' কথা ভাল নয়, ওহে যদুপতি!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

অতি দর্পে রাবণের নিধন ঘটিল,
অতি মানে কৌরবের সর্ব্বনাশ হ'ল।
অতি দানে বলিরাজ পাতালে যাইল,
অতি শোকে দশরথ জীবন ত্যজিল।
অতি রূপে শীতাংশুর কলঙ্ক রটিল,
অতি প্রেমে হর-গৌরী দেখিতে নারিল। (ক)
অতি হইলেই শেষে বিষম দুর্গতি,
∴ 'অতি' কথা ভাল নয়, ওহে যদুপতি!"

(২)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,—"অদ্যাপি মার্হাট্টা ডিচ্ রহে বিদ্যমান।" রস-সাগর বর্গীর হাঙ্গামের বিষয় লক্ষ্য করিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

(ক) "অত্যন্তপ্রেমসম্বদ্ধো ন সুখায় কদাচন।
পূর্ণং দ্রষ্টুং সমর্থো ন শিবাশিবৌ পরস্পরম্।"
উদ্ভট-শ্লোকঃ।

সমস্যা—"অদ্যাপি মার্হাট্টা ডিচ্ রহে বিদ্যমান।"

কি কাণ্ড হইয়াছিল হায় কাটোয়ায়,
শুনিলেই বাঙ্গালীর বুক ফেটে যায়।
কাটোয়ায় ছিল এক শস্যের ভাণ্ডার,
অগ্নি দিয়া বর্গীগণ করে ছারখার।
যাহা কিছু প্রজাদের ছিল টাকা-কড়ি,
লুঠিয়া লইল সব করি' হুড়াহুড়ি।
ভীষণ বর্গীর ভয়ে যত প্রজাগণ
মাটির ভিতরে পুঁতে রেখে দিল ধন।
কাল হাঁড়ি ছ্যাঁদা করি মাথায় থুইয়া
প্রাণভয়ে জলে যায় ব্যাকুল হইয়া।
মৃত্তিকায় গর্ত্ত করি' ল'য়ে ছ্যাঁদা টোকা
আশ্রয় লইল সবে দিয়া মাথা ঢাকা।
কোম্পানীর কৃপাবলে কত শত জন
ধন মান প্রাণ রক্ষা করিল তখন।
গঙ্গার পশ্চিম পারে অধিবাসি-চয়
প্রাণভয়ে নিল কলিকাতায় আশ্রয়।
আলীবর্দ্দী নবাবের লইয়া সম্মতি
নিরমিলা গড়-খাত ইংরাজ সুমতি।
বাগ্‌বাজার হ'তে খাত আরম্ভ করিলা,
ছয় মাসে দেড় ক্রোশ প্রস্তুত হইলা।
করিল দেশের লোক কিবা পরিশ্রম,
এক এক বিশ্বকর্ম্মা ব'লে হ'ল ভ্রম।

বর্গী-হাঙ্গামের এক প্রধান প্রমাণ,
'অদ্যাপি মার্হাট্টা ডিচ্ রহে বিদ্যমান।'

(৩)

ত্রিশ (সন ১২৩০) সালের বন্যার কিছুদিন পরে সভায় বসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র ও রস-সাগর ভীষণ বন্যা ও তৎকালীন লোকের অন্নকষ্ট সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলেন। মহারাজ বন্যার কথায় চমকিত হইয়া কহিলেন, "অন্ন বিনা অন্য ধন্য বস্তু কিবা আর!" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"অন্ন বিনা অন্য ধন্য বস্তু কিবা আর!"

এ সংসারে সকলেরি অন্নগত প্রাণ,
অন্ন বিনা কোন্ জীব রহে বিদ্যমান!
কঠোর জঠর-জ্বালা যখন জ্বলিবে,
অন্ন বিনা কিবা তাহা নির্ব্বাণ করিবে।
মানুষ না কি ক'রেছে অন্নের কারণ,—
অগাধ অপার জলে হ'তেছে মগন।
বাঘের মুখেও যায় নির্ভয় হইয়া,
দিতেছে সর্পের মুখে হাত বাড়াইয়া।
তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়,
অন্নাভাবে কত লোক যমালয়ে যায়।
দায়ে পড়ি' কত লোক স্ত্রী পুত্র বেচিল,
পত্নীরে ফেলিয়া পতি কোথায় পলাল।
দেখিলাম তন্ন তন্ন করিয়া বিচার,—
'অন্ন বিনা অন্য ধন্য বস্তু কিবা আর!'

(৪)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজসভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত রসালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বাত-ব্যাধি-গ্রস্ত ভদ্রলোক মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি মহারাজের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং রস-সাগরেরও সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ! 'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল'।" তখন মহারাজ সহাস্য-বদনে রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রস-সাগর! 'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল!'—এই সমস্যাটী এখনই পূর্ণ করিয়া দিন।" প্রত্যুৎপন্ন-মতি রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল!"

ওরে নিদারুণ বিধি! কত খেলা খেল,
সংসার-যন্ত্রণা যত বাবাতের ঘাড়ে ফেল।
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন্ দিন বা ভাল,
'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল!'

(৫)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল:—"অম্বুধি উদধি অব্ধি বনধি বারিধি।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"অম্বুধি উদধি অব্ধি-বনধি বারিধি।"

(সমুদ্রের প্রতি রাবণের তিরস্কার-বাক্য)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, শুন রে সাগর!
কুম্ভ-পুত্র পূরে তোরে পেটের ভিতর!

লক্ষ লক্ষ দেবাসুর মিলিত হইয়া
লণ্ডভণ্ড করে তোরে মন্থন করিয়া!
বুনো রাম নামে ছোঁড়া এত দিন পরে
সেতু বেঁধে রাখে তোর বুকের উপরে!
পাথর পরম ভারী,—সকলেই বলে,
তাহাও ভাসিছে আজ দেখি তোর জলে!
যে সব বানর সদা ডালে ডালে ঘুরে,
তাহারাও এক লাফে গেল তোর পারে!
রে সমুদ্র! তোর কথা কি 'কব অধিক,
দশমুখে তোর দশ নামে দিই ধিক্,—
পাথোধি পয়োধি বার্দ্ধি জলধি তোয়ধি
'অম্বুধি উদধি অব্ধি বনধি বারিধি!'

(৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটী জটিল সমস্যা দিব।" রস-সাগর কহিলেন, "কৃপা করিয়া দিন।" মহারাজ কহিলেন, "অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন।" রস-সাগর জয়দ্রথ-বধের বিষয় লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার পূরণ-পূর্ব্বক মহারাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন।"

জয়দ্রথ-বধ হেতু অর্জ্জুনের পণ,—
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তারে করিব নিধন;
যদি না বধিতে পারি অনলে প্রবেশ করি'
জুড়াইব হৃদয়ের যতেক যাতনা।

শুনি অর্জ্জুনের পণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন
শীঘ্রই সূর্য্যাস্ত হোক্‌—করিলা কামনা।
অর্জ্জুনের ইচ্ছা রয় সূর্য্যাস্ত বিলম্বে হয়,
উভয়ে সূর্য্যের দিকে রাখিলা নয়ন।
বালিকা না সন্ধ্যা চায়, প্রৌঢ়া নারী চায় তায়,
'অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন॥' (ক)

(৭)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র ৺শিব-চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিব-পূজা-পূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃকালে রস-সাগরকে সঙ্গে লইয়া শিব-মন্দিরে গিয়া দেখিলেন যে, শিব-শিরঃ-স্থিত অর্দ্ধচন্দ্রের উপরি-ভাগে যে পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পিপীলিকায় ভক্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মহারাজ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, "অমাবস্যার চন্দ্র পিপীলিকায় খায়"। রস-সাগর এই সমস্যাটি বাঙ্গালায় পূরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় মহারাজ কহিলেন, "হিন্দী ভাষায় ইহা পূরণ করা চাই"। তখন রস-সাগর হিন্দী ভাষাতেই ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"আঁচ্‌কো চাঁদ পিপীলা নে খাওয়ে।"

শিবরাত্রি ঘটাওয়ে, তিন লোক জানাওয়ে,
পঞ্চামৃত শশিচূড়ে চড়াওয়ে।

(ক) নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়াই, বোধ হয়, রস-সাগর মহাশয় এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন :—

"জয়দ্রথবধে রাজন্‌ দুর্য্যোধনধনঞ্জয়ৌ।
সবিতারং নিরীক্ষেতে প্রৌঢ়া বালা বধূরিব।"

ভোরে সি অরুণা, মেরে হাঁকাওয়ে
'আঁচ্‌কো চাঁদ পিপীলা নে খাওয়ে॥'

(৮)

শান্তিপুরে কোনও এক ধনাঢ্য লোকের বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। রস-সাগরও সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, "যদি আপনি এই সভায় বসিয়া একটি করুণ-রসাত্মক সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে কৃতী মহাশয় আপনাকে ইহার জন্য উত্তমরূপ পৃথক্ বিদায় দিবেন।" ইহা বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া বিলক্ষণ বিদায় আদায় করিয়া আনিলেন।

সমস্যা—"আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!"

(রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত বন-গমন-কালে
পথিমধ্যে সীতার কাতরোক্তি)

সূর্য্য-কুল-বধূ আমি,—ইহাও জানিয়া
দহিছেন মোরে সূর্য্য তীক্ষ্ণ তাপ দিয়া!
পৃথিবী আমার মাতা,—হায় আজ তিনি
করিছেন কণ্টকেতে বিদ্ধ পা দুখানি!
কহিছেন মোর পতি স্বয়ং শ্রীরাম,—
"দ্রুতবেগে চল সীতে! না করি' বিশ্রাম!"
"অদূরে আশ্রম"—বলি' দেবর লক্ষ্মণ
দিতেছে আমায় মিথ্যা আশ্বাস-বচন!

'এ রস-সাগর তাই মনোদুঃখে কয়,—
'আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!'

(৯)

এক 'ফলারে' ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত না হইলেও যার তার বাটীতে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। আহার পাইলে তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। একদা তিনি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রস-সাগরও সেই সভায় উপবিষ্ট ছিলেন। 'ফলারে' ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া "আর না, আর না",—এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলেন। রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"আর না, আর না"।

১ম পূরণ।

শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন যবে শ্রীরাম ধানুকী,
রুক্মিণীরে আজ্ঞা দিলা হইতে জানকী।
রুক্মিণী কহেন, নাথ! মনে বড় ঘেন্না,
অভাগী হইবে সীতা! 'আর না, আর না'॥

[ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, সুদর্শন-চক্র এবং গরুড়কেও তিনি সেইরূপই ভাল বাসিতেন। এই কারণ-বশতঃ ইহাদের মনে মনে অত্যন্ত দর্প হইয়াছিল। তখন দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সত্যভামার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য এক কৌশল কল্পনা করিয়া স্বয়ং রামরূপ ধারণ করিলেন এবং সত্যভামাকে সীতারূপ ধারণ করিতে কহিলেন। সত্যভামা তাহা করিতে না পারায় তিনি প্রিয়তমা রুক্মিণীকে সীতারূপ ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। সীতারূপ ধারণ করিবার কি দুঃখ, তাহাই কবি এই কবিতায় রুক্মিণীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।]

প্রশ্নকর্তা 'ফলারে' ব্রাহ্মণ ঠাকুর এই কবিতাটী শুনিয়া প্রীতিলাভ

রায় রস-সাগর তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া নিম্ন-লিখিত কবিতাটী রচনা করিলেন :—

২য় পূরণ।

পতিত হবার লাগি, পরের খাড়ী ধন্না,
পতিত হইয়া কন্ বৃথা ঘর কন্না।
আপন বাড়ী একাদশী, পরের বাড়ী পান্না,
ফলারে ব্রাহ্মণ-জন্ম 'আর না, আর না'॥

(১০)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণনগর-রাজবংশের যেরূপ সুনাম, সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ছিল, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময় সেরূপ ছিল না। তাঁহার সময় রাজ-সংসারে বিষম আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে রামমোহন মজুমদার-নামক এক ভদ্রলোক রাজবাটীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া নানা কৌশলে রাজার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং পাওনাদারদিগকে "দিব, দিচ্চি" বলিয়া নানা কৌশল-সহকারে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া রাখিতেন। এই সময়েই প্রাউড্ডিন্-নামক এক সাহেব ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের যাবতীয় ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ভূমি বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহার উপরি কর-সংস্থাপন করিতে-ছিলেন। মহারাজের এই দুঃসময়ে রস-সাগরের তিন চারি মাসের বেতন বাকী ছিল। তিনি ত্রিশ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। মাসে মাসে তাহা প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বীয় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তৎকালে ত্রিশ টাকা বেতন পাইলে ভদ্রলোকের সংসার পরম-সুখে চলিত; কিন্তু এখন দুই শত টাকা বেতন পাইলেও সেরূপ সুখে সংসার চলে না। অর্থাভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রস-সাগর মহারাজের

সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, প্রধান কর্মচারী রামমোহন মজুমদার সে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। রস-সাগর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আমার বেতন দিন।" তখন মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আর মেনে পারি নে"। ইহা শুনিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন (ক):—

সমস্যা—"আর মেনে পারি নে।"

দাঁড়ি ফেলে শ্রী ফেঁদে, শুধু হাঁড়ি পাতে বেঁধে,
বচনে রেখেছি ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করি নে।
সবে বলে মজুন্দার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার পুরস্কার, তৃণ বোধ করি নে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মেলে রজত-খণ্ড,
কোন-রূপে কর্ম্ম-কাণ্ড, ক্রিয়া পণ্ড করি নে।
কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য-উদয়,
প্লাউডিনের পূর্ণোদয়, বাঁচিও নে মরিও নে॥
সকলি দুঃখের পড়া, এ রস-সাগরে চড়া,
শ্রীচরণ-ছায়া ছাড়া, কারো ধার ধারি নে।
তিন দিকে তিন তেতম্বা, কি হইবে অপরম্বা,
কূল দাও মা জগদম্বা, 'আর মেনে পারি নে'॥

(১১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভা-পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া রস-সাগর ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। তিন মাস বেতন না পাওয়াতে তাঁহার

(ক) "ক্ষিতীশ-বংশাবলি"-রচয়িতা বর্গত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় এই পাদ-পূরণের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সারার্থ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

অত্যন্ত সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল। তখন তাহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি একদিন প্রাতঃকালে রাজবাটীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদারের নিকট টাকার তাগাদা করিতে গেলেন। মজুমদার তাঁহাকে নানা আশ্বাস-বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া অনেক অপমান-সূচক কথা বলিতে লাগিলেন। একে নিরতিশয় অর্থকষ্ট, তাহাতে আবার নিদারুণ অপমান! এজন্য রস-সাগর তাহা আর কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া ও নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অবশেষে স্বয়ং মহারাজের সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! "আর সয় না।" তখন মহারাজও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "রস-সাগর! আমারও 'আর সয় না।'" মহারাজের এই কথা শুনিবামাত্র রস-সাগর আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া সমস্যাটী এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"আর সয় না"

চাতক পাতকী বড়, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে দড়,
পর্জ্জন্যের জল ভিন্ন অন্য জল খায় না।
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস,
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাস, অন্য পানে চায় না॥
বিস্তারিয়া ওষ্ঠাধর নাহি পায় ধারাবর,
ধরণীই মূল তার, সেও ত যোগায় না।
বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, কুস্পষ্ট ও কুজপৃষ্ঠ,
নবঘনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না।
ঝটিতি ঝটিতি ঝড়, ঝন্ ঝন্ চড়্ চড়্
গগনেতে গড়্ গড়্, ধড়ে প্রাণ রয় না।
ত্রিদশ মুদ্রার কাত, তিন মাস তস্য়াত,
ত্রাহি ত্রাহি নাথ! বজ্রাঘাত 'আর সয় না'॥

[ব্যাখ্যা। রস-সাগর এই কবিতায় আপনাকে চাতক-পক্ষীর সহিত ও মহারাজকে মেঘের সহিত তুলনা করিতেছেন। পর্জ্জন্য=মেঘ। চাতক-পক্ষী যেমন মেঘের জল ভিন্ন অন্য কোন জল খায় না, রস-সাগরও সেইরূপ মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কৃপা ভিন্ন অন্যের কৃপাপ্রার্থী নহেন। ধারাবর=প্রবল বৃষ্টি। ধরণী=পৃথিবী (পৃথিবী হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিলে মেঘ উৎপন্ন হয়) ; পক্ষে, রামমোহন মজুমদারের এক বন্ধু (তাঁহারই পরামর্শে মজুমদার লোকের প্রাপ্য টাকা কড়ি দিয়া থাকেন)। পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ=সর্ব্বপ্রধান মহাপাপী। কুব্জপৃষ্ঠ=ইন্দ্রধনু। ইন্দ্রধনু নব-ঘনের উপর প্রকাশমান হইয়া ইহাকে সরাইয়া দেয়,—বৃষ্টি হইতে দেয় না ; পক্ষে, কলেক্টর সাহেব। ইনি মহারাজের নিষ্কর জমির উপরি কর বসাইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। নাথ=ঈশ্বর ; পক্ষে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র।]

(১২)

এক তহশীলদার মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বেতনাদিতে তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতে বহু পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি খাজনার টাকা ভাঙ্গিয়া খরচ করিয়া ফেলিতেন। রাজ-সরকারে কিছুই জমা দিতেন না, এবং দেওয়ানজীর পুনঃ পুনঃ কড়া হুকুমও গ্রাহ্য করিতেন না। এক দিন মহারাজের সভামধ্যে তাহার অবাধ্যতা সম্বন্ধে কথা উঠায় দেওয়ানজী স্বীয় ভৃত্য-গণ-সমভিব্যাহারে স্বয়ং গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবেন বলিয়া বিলক্ষণ আস্ফালন করেন। মহারাজও তাহাতে সম্মতি দিয়া গোপনে তহশীলদারকে সাবধান হইতে সংবাদ দেন। দেওয়ানজী তহশীলদারের কিছুই করিতে না পারায় লজ্জাবশতঃ মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন

নাই। লোক-পরম্পরায় এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, একদিন রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইবার জন্য মহারাজ তাঁহার প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশানুসারে তিনি সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় দিনের সভাতেই রস-সাগর উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেওয়ানজীকে আসিতে দেখিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।" মহারাজ এই সমস্যা পূরণ করিবার জন্য রস-সাগরকে অনুরোধ করিলে তিনি ইহা তৎক্ষণাৎ এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

পেটে খেলে পিটে সয়, গোবর্দ্ধন কি লোক,
গোবৎস লইয়া গোপ নিরুদ্বেগে রোক।
কাছের মানুষ চিন্‌তে নার, সর্ব্বাঙ্গেই চোক;
মতিভ্রম পরিশ্রম 'আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।'

[ব্যাখ্যা। বৃন্দাবনে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ প্রতিবৎসর নানা উপচারে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। একবার শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরির যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের মায়ায় গোবর্দ্ধন-গিরি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই সকল পূজাদ্রব্য ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তদুপরি অসহ্য শিলাবৃষ্টি করিতে এবং বৃন্দাবন প্লাবিত করিবার জন্য মুষল-ধারায় বারিবর্ষণ করিতে মেঘগণকে আদেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোবৎসাদি লইয়া গোপগণকে গোবর্দ্ধন-গিরির গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং উহাকে হস্ত দ্বারা ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন। ইন্দ্র এত করিয়াও গোবর্দ্ধন ও বৃন্দাবনবাসীদিগের কোনও অনিষ্ট-সাধন করিতে না পারিয়া

লজ্জিত হইয়া স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শচী উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আসতে আজ্ঞা হোক্।" সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই এই সমস্যা পূর্ণ করা হইয়াছিল। বাছের' মানুষ—শ্রীকৃষ্ণ; পক্ষে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র। সর্ব্বাঙ্গেই চোক—ইন্দ্রের সহস্র লোচন; পক্ষে, দেওয়ানজীর সকল বিষয়েই প্রখর দৃষ্টি।]

(১৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র আনন্দময়ীর চরণ-দর্শন করিতে গমন করেন। রস-সাগর এবং দুই একটী পণ্ডিত লোকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন যে, এক জন পাদ্রী খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তখন এক জন পণ্ডিত মহারাজকে বলিলেন যে, ইনিই আবার বড় লোক। ইহা শুনিয়া মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া রস-সাগরকে বলিলেন, "ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মার্গে খুদের পরো।" রস-সাগরও ইহা তৎক্ষণৎ পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মার্গে খুদের পরো।"

খৃষ্টান হলেন ভক্ত, দেবতা হলেন ঈশু,
মজাইতে একবারে যত হিঁদুর শিশু।
সতী হলেন অধোগামী, স্বর্গে গেলেন জেরো,
'ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মার্গে খুদের পরো।'

(১৪)

একদা রস-সাগরের এক বন্ধু তাঁহাকে "ইস্ ইস্" এই সমস্যাটী করুণ-রসে পূর্ণ করিতে বলেন। রস-সাগরও ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ইস্ ইস্।"

নিম-কাষ্ঠে রং, কৃষ্ণ পদ বাড়াইয়া,
না জানি' হানিল বাণ ব্যাধ-পুত্র গিয়া।
অভাগ্যে বাণের মুখে ছিল মহাবিষ,
পড়িল ত্রৈলোক্য-নাথ করি' 'ইস্ ইস্।'

(১৫)

এরূপ প্রবাদ আছে যে, কলিকাতার অন্তর্গত হোগলকুঁড়িয়া-নিবাসী শ্রীশঙ্ক গুহ-বাবুদের বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে রস-সাগর মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। যে স্থানে সভা হইয়াছিল, গুহ-বাবুদের প্রতিবেশী কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রস-সাগর, ঈশ্বর গুপ্তের অপেক্ষা ২০ বৎসরের বয়োধিক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ব্ব হইতেই রস-সাগরের উপস্থিত কবিত্বের কথা শুনিয়া আসিতেছিলেন। দুই জনকেই কবি জানিয়া গুহ-বাবু উভয়ের মধ্যে আলাপ ও পরিচয় করিয়া দিলেন। রস-সাগর, ঈশ্বর গুপ্তের নাম শুনিয়াই তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে।" তখন ঈশ্বর গুপ্ত বিনীত-ভাবে কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনি আমার বয়োধিক ও এক জন সুকবি। আমি আপনার কনিষ্ঠ সহোদর। আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি অদ্য ধন্য হইলাম।" তখন গুহ-বাবু, "ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে,"—এই সমস্যাটী রস-সাগরকে পূরণ করিতে বলায় তিনি ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

(ক)

(ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি রস-সাগরের উক্তি)

সমস্যা—"ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে।"

কিবা গদ্য, কিবা পদ্য, তব বৈদ্যরাজ!
বাঙ্গালা জুড়িয়া আজ করিছে বিরাজ।
রসিকতা, ভাবুকতা, পাণ্ডিত্য তোমার
তোমারি কবিতা-মধ্যে করিছে বিহার।
ঈশ্বরের স্তুতি-কালে তুমি ভক্তিমান্,
পড়িলে তোমার স্তুতি জুড়ায় পরাণ।
যখনি রাগের চোটে কিম্বা ধর যারে,
দফা-রফা ক'রে তুমি ছেড়ে দাও তারে।
কিবা শাদা কথা তুমি শিখিয়াছ ভাই!
হাঁদাও বুঝিতে পারে,—কষ্ট তার নাই।
গুণের সাগর তুমি, রসের সাগর,
প্রাণ খুলে কহে তাই এ রস-সাগর,—
বাঙ্গালায় যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য রবে,
'ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে।'

রস-সাগরের রচিত উক্ত কবিতায় স্বীয় প্রশংসা-বাদ শুনিয়া ঈশ্বর গুপ্ত রস-সাগরের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "রস-সাগরের রস শুষ্ক নাহি হবে।" ইহা শুনিয়া গুহ-বাবু ঈশ্বর গুপ্তকে তাঁহার স্বীয় সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলিলে তিনি ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

(খ)

(রস-সাগরের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি)

সমস্যা—"রস-সাগরের রস শুষ্ক নাহি হবে।"

সূর্য্যোদয় যদি হয় পশ্চিম গগনে,
আকাশের চাঁদ ধরে যদ্যপি বামনে,
বায়ু-বেগে ন'ড়ে উঠে যদি হিমাচল,
যদ্যপি শুকায় সপ্ত সাগরের জল,
এ জগতে যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য রবে,
'রস-সাগরের রস শুষ্ক নাহি হবে।'

(১৬)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই অদ্ভুত সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের মত পাপী কেবা আছে আর!" রস-সাগর শাস্ত্র-সম্মত করিয়া এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"ঈশ্বরের মত পাপী কেবা আছে আর!"

হে ঈশ্বর! পরাৎপর নামটী তোমার,
পরম দয়ালু তুমি,—বলে ত্রিসংসার।
সবে বলে তুমি দেব! দাতার প্রধান,
তব সম দাতা আর নাই বিদ্যমান,—
এই কথা কত সত্য,—বুঝে উঠা ভার,
প্রাণ দিয়া তাহা তুমি লও পুনর্ব্বার!
সুতরাং 'দত্তহারী' হইলে যখন,
শাস্ত্রমতে মহাপাপ করিলে অর্জ্জন!

এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,
'ঈশ্বরের মত পাপী কেবা আছে আর!'

(১৭)

যখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র, কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকে "রস-সাগর" এই উপাধি প্রদান করেন, তখন ভাদুড়ী মহাশয় মহারাজকে পরিহাস-সহকারে কহিয়াছিলেন, "উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার!" ইহা শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনিই পূরণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর মহাশয় অবিলম্বে ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার।"

সুন্দরী নারীর রূপে কোন্ প্রয়োজন,
যদি নাহি থাকে তার সতীত্ব-রতন।
কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি থাকে যার,
'উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার!'

(১৮)

একদিন রস-সাগর ও তাঁহার এক বন্ধু রাজবাটী যাইতেছিলেন। উভয়েই দেখিলেন যে, এক দুঃখিনী নারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া বাটীতে আসিয়া পুত্রটীকে ডাকিতেছে। পুত্রটীকে কুটীরে দেখিতে না পাইয়া বিরক্তি ও ক্রোধ-ভরে সে বলিতে লাগিল "এই আছিস্, এই নাই, বাপ্ রে বাপ্!" রস-সাগরের বন্ধু রস-সাগরকে ইহা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এই আছিস্, এই নাই, বাপ্ রে বাপ্!"

এই কতক্ষণ রেখে এলাম দুয়ারে দিয়া ঝাঁপ,
বারে বারে কৃষ্ণ! তুই দিচ্চিস মনস্তাপ।

ক্রোধ ভরে মহামুনি পাছে দেন শাপ,
'এই আছিস্, এই নাই, বাপ্ রে বাপ্!'

[ব্যাখ্যা। একদিন মধ্যাহ্ন-কালে দুর্ব্বাসা নন্দালয়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন। নন্দ ও যশোদা সসম্ভ্রমে ও যথাবিধানে তাঁহার তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা পাক-সমাপন করিয়া ইহা স্বীয় ইষ্টদেবের উদ্দেশে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মুনির নিবেদিত অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা এই ব্যাপার দেখিয়া যশোদাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন পাছে দুর্ব্বাসার ক্রোধ হয়, এই ভয়ে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দুর্ব্বাসা পুনরায় ইষ্টদেবকে স্বরচিত অন্ন নিবেদন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার আসিয়া তাহা আহার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মুনি পুনরায় যশোদাকে ডাকিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন যে, বালক শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার ইষ্ট-দেবতা। যাঁহাকে অন্ন নিবেদন করিতেছি, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার দোষ কি! ইহা ভাবিয়া দুর্ব্বাসা মুনি অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন!]

(১৯)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী আদি রসে পূর্ণ করিতে দেন, "এক জন করে দোষ, অন্যে পায় সাজা!" তখন রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এক জন করে দোষ, অন্যে পায় সাজা!"

যত কিছু অপরাধ করিল নয়ন,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শেষে বন্দী হ'ল মন!

একি অরাজক দেশ,—নাই কি রে রাজা
'এক জন করে দোষ,' অন্যে পায় সাজা।'

(২০)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের সভায় সমস্যা উঠিল,.. "এক জন করে দোষ, অন্যে শাস্তি পায়!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—'এক জন করে দোষ, অন্যে শাস্তি পায়!'

রামের সীতায় চুরি করিল রাবণ,
রাম কিন্তু করিলেন সমুদ্র বন্ধন।
এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড নাহি দেখা যায়,
'এক জন করে দোষ, অন্যে শাস্তি পায়!'

(২১)

একদা এক সন্ন্যাসী, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! এ সংসারে সন্ন্যাস-গ্রহণের অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। একই যষ্টি-প্রহারে সপ্ত সর্প বিনাশ করিতে না পারিলে সন্ন্যাস-গ্রহণ করা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব।" মহারাজ ইহা শ্রবণ করিয়াই রস-সাগরকে কহিলেন, "এক নড়ীতে সাত সাপ মারে।" রস-সাগর সন্ন্যাসীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এই ভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এক নড়ীতে সাত সাপ মারে।"

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য অতি
ছয় সর্প, আর এক সর্পী এ সংস্থিতি॥
কাশীবাসী করক কৌপীন দণ্ড ধরে,
মায়া ছাড়িতে 'এক নড়ীতে সাত সাপ মারে।'

[ব্যাখ্যা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য,—এই ছয়টী দুর্জ্জয় রিপু ছয়টী সর্পের মত, এবং সংসৃতি (সংসার) সর্পীর তুল্য। যিনি কাশীবাসী, তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া করঙ্ক (কমণ্ডলু), কৌপীন ও দণ্ড ধারণ করেন। প্রকৃত সন্ন্যাস লইবার সময় এককালে, তাঁহাকে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টা দুর্জ্জয় রিপু জয় করিতে এবং সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। তাহা হইলেই তাঁহার "এক নড়ীতে সাত সাপ মারা" হইল !]

(২২)

একদিন রাজ-সভায় বসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "রস-সাগর মহাশয় ! শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে যশোদার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "এক নীলমণি বিনা তথা নন্দরাণী !" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

-সমস্যা—"এক নীলমণি বিনা তথা নন্দরাণী !"

গৌরী বিনা যথা হর, রতি বিনা স্মর,
শচী বিনা যথা ইন্দ্র, লক্ষ্মী বিনা নর ;
চন্দ্র বিনা যথা রাত্রি, সূর্য্য বিনা দিন,
চক্র বিনা যথা রথ, জল বিনা মীন ;
পুত্র বিনা যথা বাপ্, শক্তি বিনা দাপ্,
অস্ত্র বিনা যথা খাপ্, গর্ত্ত বিনা সাপ্,
পতি বিনা যথা পত্নী, সত্য বিনা বাণী,
'এক নীলমণি বিনা, তথা নন্দরাণী !'

(২৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের নিরতিশয় আর্থিক কষ্ট হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তিনি রস-সাগরের সহিত স্বীয় সাংসারিক দুরবস্থার কথা কহিতেন। একদিন তিনি রস-সাগরকে কহিলেন, "একমাত্র বিষবৈদ্য তুমি নারায়ণ!" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"একমাত্র বিষ-বৈদ্য তুমি নারায়ণ!"

সংসার-ভুজঙ্গ মোরে ক'রেছে দংশন,
বিষের জ্বালায় আমি জ্বলি সর্ব্বক্ষণ।
এ বিষম জ্বালা কেবা করে নিবারণ,
'একমাত্র বিষ-বৈদ্য তুমি নারায়ণ!'

(২৪)

একদিন রস-সাগর মহাশয় শান্তিপুরে কোন এক ব্যক্তির গৃহে বিদায় আনিতে গিয়াছিলেন। গৃহস্বামী বিলক্ষণ ধনাঢ্য ও বিদ্বান্ লোক হইলেও তিনি কিঞ্চিৎ দাম্ভিক ছিলেন। তখন রস-সাগর কথায় কথায় গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে?" ইহা শুনিয়া বিদায় করিবার অধ্যক্ষ মহাশয় কহিলেন "এই সমস্যাটী আপনাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে?"

লক্ষ্মী থাকেন যেখানে লক্ষ্মী থাকেন যেখানে,
সরস্বতী কিছুতেই না যান্ সেখানে!
সরস্বতী যথা র'ন্ সরস্বতী যথা র'ন্
কিছুতে না লক্ষ্মী তথা করেন গমন॥

যদি লক্ষ্মী সরস্বতী যদি লক্ষ্মী সরস্বতী.
দুইটাই এক সঙ্গে করেন বসতি।
বিনয় না আসে তবে বিনয় না আসে তবে
"এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে?'

(২৫)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় এক জন মোসাহেব ছিল। সে ব্যক্তি এত 'খোসামোদ' করিতে পটু ছিল যে, মহারাজ তাহার মুখে "জল উঁচু, জল নীচু" শুনিয়া হাস্য ও পরিহাস করিবার জন্যই তাহাকে বেতন-ভোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মোসাহেব রস-সাগরের প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। একদিন এই ব্যক্তি সভায় বসিয়া অসম্ভব খোষামোদ আরম্ভ করিলে মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন :—"এ সংসারে খোসামুদে বিসর্গের মত!" রস-সাগরও প্রাণ খুলিয়া সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এ সংসারে খোসামুদে বিসর্গের মত!"

যে স্বর আশ্রয় করে বিসর্গ যখন,
সে স্বরের মত তার হয় উচ্চারণ।
বড় লোক ভাল' মন্দ যাহা কিছু বলে,
খোসামুদে সে কথায় 'সাই' দিয়া চলে!
বড় দুঃখে বলে তাই এ রস-সাগর,—
বড় লোক যত দেখ, সকলেই স্বর।
খোষামুদে ব্যাটাদের গুণ কব কত,
"এ সংসারে খোসামুদে বিসর্গের মত!'

(২৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন বৈবাহিক, মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"এ সংসারে রমণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী!" রস-সাগরও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে ইহা পূণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"এ সংসারে রমণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী!"

দৃষ্টিমাত্র ভুলাইবে পুরুষের মন,
স্পর্শমাত্র হরণ করিবে তার ধন;
সঙ্গমাত্র দিবে তার যত বল নাশি,'
'এ সংসারে রমণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী!'

(২৭)

রস-সাগর মহাশয় সংসার চালাইবার উদ্দেশে কোনও এক মুদির দোকানে ধার করিয়া কিছু জিনিস খরিদ করিয়াছিলেন। রাজবাটীতে যথাকালে বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি উক্ত মুদির দেনা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। মানের ভয়ে তিনি মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়াও যাইতেন না। কোনও কারণ-বশতঃ রস-সাগর একদিন অতি প্রত্যুষে রাজসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় মুদি আসিয়া তাঁহাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডা হইয়া গেল। মুদি তাঁহাকে দুই চারিটা কড়া কথা বলায় তিনি আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিয়া রাজ-সভায় গিয়া বসিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ-ভরে ও বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রও সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রস-সাগরকে মলিন-মুখ ও আরক্ত-নয়ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রস-সাগর মহাশয়! আজ আপনার এরূপ ভাব কেন?" তখন রস সাগর কহিলেন, "মহারাজ! এক ব্যাটা মুদির জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। তাহার নিকটে ধার করিয়া কিছু জিনিস-পত্র কিনিয়া সংসার-খরচ করিয়াছি। টাকা দিতে না পারায় সে অদ্য প্রত্যুষে আমাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া গেল। আপনার খাতাঞ্চী মজুমদারও টাকা দিবার নাম করে না। এখন কি করি! মুদি ব্যাটা ত পাগল করিল!" তখন মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওজনে কমায় ব্যাটা, দামেতে চড়ায়!" ইহা শুনিয়া তখন রস-সাগর প্রাণভরে মুদির গুণগ্রাম বর্ণনা সহ এই সমস্যাটি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ওজনে কমায় ব্যাটা, দামেতে চড়ায়!"

মুদি ব্যাটাদের নাই কর্ম্ম-কাণ্ড-জ্ঞান,
যাহা মুখে আসে বলে, না রাখে সম্মান।
বেচিবার কালে দেয় ঘাড়ে চাপাইয়া,
আদায়ের কালে বসে মাথায় চাপিয়া।
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা সদুত্তর নাই,
কথায় কথায় শুধু নিজের বড়াই।
ময়দা বেচিলে ব্যাটা নীচে লেখে ঘৃত,
অড়র বেচিলে পুনঃ লেখে সেই মত।
বস্তা-পচা সস্তা মাল কিনি' কম দরে
রাস্তায় রাখিয়া ব্যাচে আগুনের দরে।
সত্য কথা কারে বলে,—নাহি তার জানা।
মিথ্যা কহিবার কালে কিন্তু ষোল আনা।
নিরীহ ভ্যাড়ার মত তর্কেতে হারিলে,
প্রচণ্ড ম্যাড়ার মত তাহাতে জিতিলে।

ভুঁড়ি আছে, মুড়ি নাই, চাই শুধু কড়ি.
কলসী না জোটে যদি, গলে দিগ্ দড়ি।
হিসাব মিলায়ে লয় কড়ায় কড়ায়,
'ওজনে কমায়' ব্যাটা, দামেতে চড়ায়!'

(২৮)

শান্তিপুর-নিবাসিনী সরস্বতী-নাম্নী এক প্রাচীনা বিদুষী ব্রাহ্মণ-কন্যা রস-সাগরের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বাটীতে সরস্বতী-পূজার উপলক্ষে রস-সাগর মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা কহিলেন, "বাবা রস-সাগর! আমার ভাণ্ডার অতি সামান্য, বিশেষ কিছুই যোগাড় করিতে পারি নাই।" তখন রস-সাগর মহাশয় বিনীত-ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ওমা সরস্বতি! তব অপূর্ব্ব ভাণ্ডার!" ইহা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ-কন্যা কহিলেন, "বাবা! তোমার সমস্যাটী তোমাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ওমা সরস্বতি! তব অপূর্ব্ব ভাণ্ডার!"

যতই হইবে ব্যয়, তত বৃদ্ধি হয়,
যত না হইবে ব্যয়, তত হয় ক্ষয়।
ভাণ্ডারের কথা তব কি বলিব আর,
'ওমা সরস্বতি! তব অপূর্ব্ব ভাণ্ডার।'

(২৯)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে বিশেষ-ক্ষমতা-প্রাপ্ত এক কলেক্টর সাহেব গভর্ণমেণ্টের আদেশে নিষ্কর ভূমির উপরি দুঃসহ কর বসাইতে আরম্ভ করেন। কোনও এক বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টর বাবু উক্ত

সাহেবের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সাধারণ প্রজাগণের অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন উক্ত বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টর বাবু মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া রস-সাগরকে বলিলেন, "কলেক্টর বাবু আসিলে তাঁহাকে একটু শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি আসিলেই প্রসঙ্গ-ক্রমে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব এবং আপনিও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্যা পূর্ণ করিবেন।" নির্দ্দিষ্ট দিবসে ডেপুটী বাবু মহারাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজের সহিত নিষ্কর-ভূমি সম্বন্ধে তাঁহার কথা চলিতে লাগিল। রস-সাগর নিকটে বসিয়া সমস্তই শুনিতে লাগিলেন। তখন ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "ইনি এক জন উপস্থিত কবি। কেহ কোন সমস্যা দিলে ইনি তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন।" তখন ডেপুটী বাবু প্রশ্ন করিলেন, "ওরে আমার তুমি!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ওরে আমার তুমি!"

১ম পূরণ।

কোম্পানীর কৃপা-বলে পদ পাইয়াছ,
সভায় আইন-জারি ক'রে বসিয়াছ।
বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলে ব্রহ্মোত্তর ভূমি,
ডেপুটী কলেক্টর বাবু, 'ওরে আমার তুমি!'

তখন মহারাজ কৃত্রিম-ক্রোধ-ভরে রস-সাগরকে বলিলেন, "কাহাকে

কি বলিতেছ?" গুণধর রস-সাগর মহাশয়ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য প্রকারে উক্ত সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া বলিলেন :—

২য় পূরণ।

সোণা রূপা পার ক'রে, দেশে দিলে গমি,
টাকায় আনন দয়েম কানন জমীদারের জমি॥
দেবতা-ব্রাহ্মণে হিংসা, লাখেরাজ ভূমি,
ডেপুটী কলেক্টর বাবু 'ওরে আমার তুমি!' (১)

(৩০)

একদা প্রশ্ন হইয়াছিল "ওরে সর্ব্বনেশে।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা।—"ওরে সর্ব্বনেশে।"

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সাঙ্গ ক'রে এসে
মন তো ভুল্লি গুপ্ত-পল্লী তুচ্ছ করি হেসে।
কামার-ডিঙ্গীর খালের ধারে কাল র'য়েছে বসে,
'তোরে যা বলেছি, তাই করেছিস্ 'ওরে সর্ব্বনেশে।'

(৩১)

একবার রস-সাগর স্বয়ং পীড়িত হইলে রাজ-বৈদ্য তাঁহার বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় সুস্থ হইয়া রস-সাগর রাজ-বৈদ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজ-বৈদ্য বিনীত-ভাবে কহিলেন, "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্।" রস-সাগরও

(১) নিষ্কর ভূমির উপরি কর ধার্য্য করিবার সময় কৃষ্ণনগর-রাজবংশের ও সাধারণ প্রজাগণের কিরূপ নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রণীত "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" গ্রন্থের ১৮৭—১৯০ পৃষ্ঠে সবিস্তর বর্ণিত আছে।

হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ঔষধ জাহ্নবী-জল, বৈদ্য নারায়ণ!" ইহা শুনিবামাত্র রাজ-বৈদ্য কহিলেন, "এখন আপনার সমস্যাটি আপনিই পূরণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ঔষধ জাহ্নবী-জল, বৈদ্য নারায়ণ!"

এই দেহে বিদ্যমান ব্যাধি শত শত,
নয়টী ছিদ্রও তাহে রহে অবিরত।
কোন্ ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহিরিবে কবে,
কেহই বলিতে তাহা, নাহি পারে ভবে।
হেন সারশূন্য দেহ নীরোগ রাখিতে
ইচ্ছা করে যদি কেহ এই পৃথিবীতে,
দুইটী উপায় তার রহে সর্ব্বক্ষণ,—
'ঔষধ জাহ্নবী-জল, বৈদ্য নারায়ণ!'

(৩২)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কয়েকটী বন্ধু লইয়া সভায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুবরাজ প্রশ্ন করিলেন, "কচু ঘেঁচু নীচু বটে, উঁচু কিন্তু কাজে!" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কচু ঘেঁচু নীচু বটে, উঁচু কিন্তু কাজে।"

কচু-আটা, কচু-ডাঁটা, কচু-শাক আর
কচু-তরকারী কত করে উপকার।
কচু-বন রাখে কচু-রায়ের জীবন;—
কচু-সম উঁচু বস্তু না দেখি কখন।
বৃহৎ হইলে ক্ষুদ্র প্রাণে বড় বাজে,
'কচু ঘেঁচু নীচু বটে, উঁচু কিন্তু কাজে!'

(৩৩)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই ঐতিহাসিক সমস্যাটী পূর্ণ করিতে, দিয়াছিলেন,—"কত দেবী পড়ে দেবী-সিংহের কবলে!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কত-দেবী পড়ে দেবী-সিংহের কবলে!"

হেষ্টিংস করেন সভা মুরশিদাবাদে,
দেবীসিংহ সে সভায় এক ফাঁদ ফাঁদে।
নবীন সাহেব যত কর্ত্তা এ সভার,
দেবী-সিংহ হইলেন তাঁদের সর্দ্দার।
নর্ত্তকী গণিকা যারা, তাদের তখন
দিতে হ'ত সরকারে কর বিলক্ষণ।
আদায় করিতে দেবী-সিংহ এই কর
কুতূহলে চলিলেন বাঁধিয়া কোমর।
দিলজান্ দেলখোস্ মতিবিবি আর
কত বা করিব নাম,—হাজার হাজার।
দেবী-সিংহ এক এক বাছিয়া লইয়া
এক এক প্রভুপদে দিতেন সঁপিয়া।
এইরূপে তাঁহাদের যোগাইয়া মন
ইষ্টসিদ্ধি করিতেন নিজে বিলক্ষণ!
এ রস-সাগর তাই কহে কুতূহলে
'কত দেবী পড়ে দেবী-সিংহের কবলে!'

(৩৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের অর্থাভাব হওয়ায় রস-সাগর কয়েক মাসের বেতন পান নাই। তিনি যখন মহারাজের খাতাঞ্জী রামমোহন

মজুমদারের নিকটে টাকার তাগাদা করিতে যান, তখন রামমোহন টাকা দিতে না পারায় কোন কথা না কহিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া থাকেন। একদিন রামমোহনের মুখে কোন উত্তর না পাওয়াতে রস-সাগর ক্রোধভরে স্বয়ং মহারাজের নিকটে গিয়া কহিলেন "মহারাজ! টাকার তাগাদা করিতে গেলে রামমোহন 'ক'নে ব'য়ের' মত মুখ খানি নীচু করিয়া থাকে।" তখন মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, "যদি আপনি আমার এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার 'টাকার সমস্যা' এখনই পূর্ণ করিয়া দিব।" ইহা বলিয়াই তিনি এই 'সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "ক'নে বৌ রহে যথা ঘোমটা ভিতরে!" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ক'নে বৌ রহে যথা ঘোমটা ভিতরে।"

হেঁটে হেঁটে প্রাণ গেল, মাহিনা না পাই,
রামমোহনের কাছে লাথি ঝাঁটা খাই।
কহিলে টাকার কথা না দেয় উত্তর,
গুড়ুক টানিয়া কে'সে মরে নিরন্তর।
রাঙা রাঙা চোক দুটী, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা,
পেটের ভিতর তার আছে কত ছলা।
ভাঁড়ে মা ভবানী তার, কিন্তু আসবাব,
ঠিক ব'সে আছে যেন সিরাজ নবাব।
হাই তোলে, তুড়ি মারে, মাথা হেঁট করে,
'ক'নে বৌ রহে যথা ঘোমটা ভিতরে।

(৩৫)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র স্বীয় সভায় বসিয়া কতিপয় বন্ধুর সহিত

গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে রস-সাগর সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র পার্শ্ববর্ত্তী একজন বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আমার এই বন্ধুটী আপনার মত বাঙ্গালা-ভাষায় সমস্যা-পূরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "কবিতা লিখিতে যেন কপিতা না হয়।" ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনাকেই পূরণ করিয়া দিতে হইবে।" রস-সাগরও এইভাবে সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কবিতা লিখিতে যেন কপিতা না হয়!"

কবিতা লেখেন যিনি বিদ্বান্ হইয়া,
তিনিই যথার্থ কবি,—দেখহ ভাবিয়া।
যে জন কবিতা লেখে, কিন্তু বিদ্যা নাই,
সে জন যথার্থ কপি,—জানিও ইহাই।
সৎকুল-সম্ভূতা যিনি, তারে বলি জায়া,
নামে মাত্র জায়া যেই, তারে বলি মায়া।
এ কথাটী মনে রেখো কবি মহাশয়!
'কবিতা লিখিতে যেন কপিতা না হয়!'

(৩৬)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন,—"আপনাকে এখন একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব। কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া আপনাকে ইহা পূরণ করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন,—"কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে!" রস-সাগর যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে।"

(মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের উক্তি)

অগস্ত্য ঋষির বংশে জনম লভিয়া
এতদিন কাটাইনু বাতাপি সেবিয়া।
ওহে নবকৃষ্ণ দেব! তোমারি কৃপায়
কমলা আমার ঘরে আসিলেন হায়!
বিচিত্র ব্যাপার ইহা দেখিনু সংসারে,—
'কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে!'

(৩৭)

কৃষ্ণনগরে কোন এক দোকানদারের দোকানে রস-সাগর মহাশয় সংসার-যাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। দোকানদারের নিকটে অনেক দিন হইতেই তাঁহার কিছু দেনা ছিল। রাজবাটী হইতে যথাসময়ে বেতন না পাওয়াতেই তিনি এই দেনা এতদিন পরিশোধ করিতে পারেন নাই। কিয়ৎকাল পরে তিনি রাজবাটী হইতে কিঞ্চিৎ টাকা হস্তগত করিয়া ইহা দোকানদারকে দিতে গেলেন। দোকারদার ইহা পাইয়াও বলিল, "এখনও আপনার অনেক দেনা রহিল।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক!" দোকানদার অতি সুরসিক লোক। সে ব্যক্তি কহিল, "রস-সাগর মহাশয়! কৃষ্ণ-বিষয়ক কোন একটী ঘটনা লইয়া আপনার সমস্যা আপনাকেই পূরণ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া দোকানে দাঁড়াইয়াই তিনি সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিলেন:—

সমস্যা—"কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক!"

লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্ম্মভোগ,
নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ, গোকুলে আতঙ্ক।

কেঁদে কন্ যশোমতী, জটিলা কুটিলা সতী,
জল আন শীঘ্রগতি উভয়ে নিঃশঙ্ক ॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ, পড়িল কলঙ্ক-বাজ,
ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ পাতিলেন অঙ্ক।
ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরি হরি ঘরে যাই,
'কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক ॥'

(৩৮)

একদা কৃষ্ণনগরে কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্নপূর্ণা-পূজা হওয়ায় রস-সাগর মহাশয় সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেস্থানে গমন করিয়াছিলেন। গৃহস্বামী মহাশয় হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাচ্ছা বাচ্ছা ল'য়ে কিসে বাঁচে দিগম্বর!" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগর মহাশয় তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলেনঃ—

সমস্যা—কাচ্ছা বাচ্ছা ল'য়ে কিসে বাঁচে দিগম্বর!"

বুঝে লও সে সংসারে হয় কত সুখ,
স্বয়ং কর্ত্তার যদি রহে পাঁচ মুখ!
একটী পুত্রের মুখ হাতীর মতন,
অন্যটীর ছটী মুখ রহে সর্ব্বক্ষণ!
মাঝে মাঝে আসে এক অতিথি বাটীতে,
"চতুর্ম্মুখ" নাম তাঁর বিখ্যাত জগতে!
অম [illegible] রহিলে গৃহে নিরন্তর,
'কাচ্ছা বাচ্ছা ল'য়ে কিসে বাঁচে দিগম্বর!'

(৩৯)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অন্যান্য পারিষদ-বর্গের সহিত মহারাজেন্দ্র বাহাদুর ৺কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে

যে সমারোহ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। গল্প করিতে করিতে তিনি রস-সাগরকে বলিলেন, "বাছে আগুয়ান্।" রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া সভাস্থ সকল লোককেই চমৎকৃত করিয়া রাখিলেন :—

সমস্যা—"কাছে আওয়ান।"

তিন জনে তিন মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিলেন যবে,
গগন ফাটিয়া ছিল তাঁহাদের রবে।
কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ-দেওয়ান,—
কার সাধ্য ইঁহাদের 'কাছে আগুয়ান।'

(৪০)

কোন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা সাতুরায় (ছাতুরায়) কৃষ্ণনগরে কবির গাওনা করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় রস-সাগর-নামক এক কবি উপস্থিত পাদ-পূরণ করিতে পারেন। তাঁহার গাওনা শেষ হইলে তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে যান। রস-সাগরও তৎকালে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাতুরায় কহিলেন "রস-সাগর মহাশয়! আমি কি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" রস-সাগর আহ্লাদ-সহকারে অনুমতি প্রদান করিলে সাতুরায় কহিলেন, "কাঠ পাথরে বিশেষ কি?" "আপনার এইরূপ সহজ ভাষাতেই আমি পূরণ করিয়া দিই"—ইহা বলিয়াই রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কাঠ পাথরে বিশেষ কি?"

(বিশ্বামিত্রের প্রতি মাঝির উক্তি)

তোমার চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো
পদ্মের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতক গুলি কুপুষ্যি॥
যখন ঠেক্‌বে পা, ঘুচ্‌বে লা
লা হ'য়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি
'কাঠ পাথরে বিশেষ কি'?

[ব্যাখ্যা। যখন বিশ্বামিত্র-মুনি রাম ও লক্ষণকে লইয়া মিথিলায় গমন করেন, তখন তাঁহারা পথিমধ্যে একটী নদী দেখিতে পাইলেন। তখন সকলকে নদীর অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য বিশ্বামিত্র মাঝিকে আদেশ করিলেন। মাঝি কিছুতেই তাঁহার আদেশ পালন করিতে চাহিল না। সে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ও জ্যোতিঃ দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে, এই মহাপুরুষের চরণ-স্পর্শেই এক খানি প্রস্তর মানুষ হইয়া গিয়াছে। পাছে তাহার নৌকা খানিও মানুষ হইয়া যায়, এই ভয়ে মাঝি আর তাঁহাদিগকে নদীর অপর পারে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। মাঝি নিজ অপভাষায় বিশ্বামিত্র মুনিকে এইভাবে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে।]

কথিত আছে, সাতুরায় এই উপস্থিত মনোহর পাদ-পূরণ শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ রস-সাগরের চরণে সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৪১)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু তাঁহার সভায় বসিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন,—"কান্ত বাবু হ'য়ে কাবু হাবু-ডুবু খায়।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কান্ত বাবু হ'য়ে কাবু হাবু-ডুবু খায়।"

"কান্ত বাবু যান মণি-বেগমের ঘরে
হেষ্টিংস-লাটের পেট ভরাবার তরে।
এই কথা সত্য কিনা,—বলিবার তরে
শ্রীনন্দকুমার সাক্ষী কাউন্সিল-ঘরে।
কাউন্সিল হ'তে এক সমন আসিল,
হেষ্টিংসের হাতে তাহা কান্ত বাবু দিল।
হেষ্টিংসের নিষেধেই সাহসী হইয়া
কান্ত বাবু সে সমন দিল উড়াইয়া।
হেষ্টিংসের মহামিত্র সেই কান্ত বাবু,—
কৃতান্তেরো শক্তি নাই,—করে তারে কাবু।
নিতান্ত অশান্ত যদি কান্ত বাবু হয়,
হেষ্টিংস তাহারে শান্ত করিতে তন্ময়।
ক্লেভারিং কহে,—যদি রাস্তার উপর
প্রস্রাব করিলে শাস্তি দেন গভর্ণর,
তখন হুকুম আমি দিতেছি এক্ষণে,—
তুড়ুং লাগান হোগ কান্তের চরণে।
এ. রস-সাগর তাই বলে হায় হায়,—
'কান্ত বাবু হ'য়ে কাবু হাবু-ডুবু খায়।'

[প্রস্তাব। "মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ লওয়া সম্বন্ধে কান্ত

বাবু বিশেষ-রূপে লিপ্ত ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা কাউন্সিলের নিকটে তিনি সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইয়া মণিবেগমের একখানি পত্র উপস্থাপিত করেন। তাহাতে মণিবেগমের পদোন্নতির জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে এক লক্ষ টাকা মুরশিদাবাদে ও আর এক লক্ষ টাকা কলিকাতায় দিবার কথা উল্লিখিত থাকে। পূর্ব্বে যে দেড় লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল, এই দুই লক্ষ টাকা তাহা হইতে বিভিন্ন! মণিবেগমের সেই মূল পত্র নন্দকুমারের নিকট হইতে হেষ্টিংস কিংবা তাঁহার কোন লোক লইয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্ন কাউন্সিল হইতে জিজ্ঞাসা করা হইলে, নন্দকুমার উত্তর দেন যে, মণিবেগম কান্ত বাবু দ্বারা তাহা পেশ করিতে বলেন। কান্ত বাবুকে মূল পত্র না দেওয়ায় তিনি ইহার নকল লইতে চান; সেদিন সন্ধ্যা হওয়ায় তৎপর দিন লইবার কথা হয়। কাউন্সিল হইতে এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণের জন্য কান্ত বাবুকে সময় দেওয়া হয়, কিন্তু হেষ্টিংসের নিষেধ-ক্রমে তিনি প্রথমে উপস্থিত হন নাই; সুতরাং কাউন্সিলের সভ্যেরা নন্দকুমারের উপস্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে আপনাদের বিবেচনানুযায়ী বিচার নিষ্পন্ন করেন।

অনন্তর কাউন্সিলের অবমাননার হেতু-প্রদর্শনের জন্য পুনরায় কান্ত বাবুর নামে সমন-প্রেরণের জন্য কাউন্সিলে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। বারওয়েল সাহেব প্রথমে আপত্তি করেন। গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান দেশীয় অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সাধারণ বেনিয়ানদিগের ন্যায় তিনি গণ্য হইতে পারেন না। এই সময়ে তিনি কান্ত বাবুর বংশ-মর্য্যাদার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ক্লেভারিং সাহেব তাঁহাকে সাধারণ বেনিয়ান-গণ হইতে বিভিন্ন মনে করেন নাই। তিনি প্রকাশ করেন যে, কান্ত বাবু যখন

কোম্পানীর ইজারদার, তখন তিনি কাউন্সিলের আদেশ মানিতে বাধ্য।" বারওয়েল সাহেবও তখন ইহাতে মত দেন।" বারওয়েল প্রথমে আপত্তি করিলেও পরে ক্লেভারিং এর প্রস্তাবে সম্মত হন। পরে কান্ত বাবুর নামে সমন প্রেরিত হইলে তিনি তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহাকে পূর্ব্ব সমনে উপস্থিত না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, গভর্ণর সাহেবের নিষেধ-ক্রমে তিনি উপস্থিত হন নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরা গভর্ণরের আদেশের পরে কাউন্সিলের আদেশ মান্য করিয়া থাকে। গভর্ণর যদি উপস্থিত হইতে বলিতেন, তাহা হইলে তিনি কাউন্সিলের আদেশ মান্য করিতে ক্রুটী করিতেন না।

কাউন্সিলের অবমানার জন্য ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করেন যে, কান্ত বাবুকে কোন প্রকার গুরুতর শাস্তি দেওয়া হউক। গভর্ণর জেনারল বলেন যে, কান্ত বাবু উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। তাঁহার প্রতি কোন প্রকার শাস্তি-বিধান হইতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি গভর্ণর জেনারলের কর্ম্মচারী বলিয়া সুপ্রিমকোর্টের সীমা-নিবিষ্ট ও কাউন্সিলের সীমা-বহির্ভূত। হেষ্টিংস আরও বলেন যে, তিনি তাঁহার নিজ জীবন দিয়াও কান্ত বাবুকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।' অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ক্লেভারিং সাহেব পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিলেন যে, গভর্ণর অতি সামান্য অপরাধের জন্য প্রত্যহ দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগকে যে তুড়ুং পরাইয়া থাকেন, আমি কান্ত বাবুকেও সেই শাস্তি-প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। যাহা হউক, কান্ত বাবু তৎকালে অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছিলেন।"] (১)

(১) "He should be put in the stocks to have that same punishment upon him which the Governor inflicts every day upon many miserable Hindoos for easing themselves upon the Esplanade two miles distant from the town."—Minutes of the Evidence of Hastings' Trial P. 1010.

(৪২)

একদা কলিকাতা হইতে কয়েকটী শিক্ষিত ও ধনাঢ্য লোক কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে কোন বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। তখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রও সভায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে ছিলেন। কথায় কথায় তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "কামানের গোলা দিয়া উড়াইয়া দিলি।" তিনি আরও অনুরোধ করিলেন, "আপনাকে নবাব-সরকারের কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে হইবে।" তৎকালে বাঙ্গালা দেশের ঘটনাবলীর কথা রস-সাগরের কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া এই সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"কামানের গোলা দিয়া উড়াইয়া দিলি।"

আলিবর্দ্দী-নবাবের কারাগারে পশি'
কতদিন কৃষ্ণচন্দ্র রহিলেন বসি'।
তাঁহার উদ্ধার হেতু শ্রীরঘুনন্দন
সহিলেন কত কষ্ট, কে করে গণন!
ধিক্ রে মাণিকচাঁদ! ধিক্ ধিক্ তোরে,
চড়ালি তাঁহারে তুই গাধার উপরে।
তাহাতেও জাতক্রোধ না তোর মিটালি,
'কামানের গোলা দিয়া উড়াইয়া দিলি।'

প্রস্তাব।* একদা মুরশিদাবাদে আলিবর্দ্দী খাঁর প্রাসাদে এক মহতী সভা হয়। বর্দ্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি নানা স্থান হইতে রাজা ও মহারাজ-গণ স্ব স্ব দেওয়ান, উকীল ও অন্যান্য সম্রান্ত

* আমার পরম-সুহৃৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল্ মহাশয়ের রচিত "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী" হইতে এই প্রস্তাবটি উদ্ধৃত হইল।—গ্রন্থকার

ব্যক্তিগণ সহ সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময় আলিবর্দ্দীর কারাগারে বন্দিভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রঘুনন্দন মিত্র নামক এক উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান এই সময় মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিরতিশয় প্রভুভক্ত ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া নবাবের আদেশানুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সভায় অনেক লোক উপস্থিত থাকায় বসিবার স্থান ছিল না। এই হেতু প্রবেশ-কালে রঘুনন্দনের পরিচ্ছদের একাংশ বর্দ্ধমান-রাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ইহাতে মাণিকচাঁদ ক্রোধভরে হিন্দী-ভাষায় কহিলেন— দেখ্‌তে নেহিঁ পাজি?" রঘুনন্দন বলিলেন, "হাঁ নওকর! সব হি পাজি হায়, কোই ছোটা, কোই বড়া।" ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল লোকেই হাসিয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে রঘুনন্দনের উপরি মাণিকচাঁদের তীব্র জাতক্রোধ বিদ্যমান রহিল। কিয়ৎকাল পরে মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমান-রাজকে ত্যাগ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁর দেওয়ানী-পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে নিযুক্ত হইয়াই তিনি রঘুনন্দনের সর্ব্বনাশের সংকল্প করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমান-রাজের কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব হুগলী হইতে মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইতেছিল। এই টাকা কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্গত পলাশী-নামক স্থানে উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে কয়েক জন দস্যু বাহকদিগকে হত ও আহত করিয়া তাহা সমস্তই অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারি-গণ বহুচেষ্টা করিয়াও অপহৃত ধনের বা দস্যুদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে বা তাঁহার শাসন-দোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনকেই অপরাধী স্থির করিলেন। মাণিকচাঁদ এই রঘুনন্দনকে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মুরশিদাবাদ ও কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান রাজ-

পথে পরিভ্রমণ করাইলেন এবং পরিশেষে কামানের গোলা দ্বারা তাঁহাকে উড়াইয়া দিলেন। রঘুনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের পরম হিতৈষী ছিলেন। ইনিই স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁকে পাঠাইয়া দেন, এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহার কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন। ইহাঁরই প্রদত্ত সনন্দকে "রঘুনন্দনী ছাড়" কহে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মত্র ভূমি ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই গৃহে এই ছাড় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রঘুনন্দনের হৃদয়-বিদারক মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া তাঁহার বংশধর-গণকে পলাশী-পরগণার অন্তর্গত ১৪০০ বিঘা নিষ্কর মহাত্রাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতৃবংশীয় মিত্র-মহাশয়-গণ অদ্যাপি দুর্গাগ্রামে বাস করিতেছেন।] (১)

(৪৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের দত্তক পুত্র যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটী সমস্যা দিব, কিন্তু আমাদিগের রাজবংশীয় কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ইহা এখনই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" সমস্যাটী এই :—"কারো ভাগ্যে পৌষ-মাস, কারো সর্ব্বনাশ।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া যুবরাজ ও সভাস্থ সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

সমস্যা—"কারো ভাগ্যে পৌষ-মাস, কারো সর্ব্বনাশ।"

হুগলীর দরবারে কাশিম বসিয়া
কৃষ্ণচন্দ্রে আনিলেন তলব করিয়া।
শিবচন্দ্রে সঙ্গে করি' যাইলেন রাজা,
কে জানে তাঁহার ভাগ্যে ছিল এত সাজা!

(১) এই প্রস্তাব "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে গৃহীত।

"ইংরাজের চর তাঁরা",—নবাব ভাবিয়া
রাখেন মুঙ্গের-দুর্গে আবদ্ধ করিয়া।
"পিতা পুত্র উভয়েরে করহ সংহার",—
মীর-কাশিম এ আদেশ করেন প্রচার।
প্রাণ ভরি' পূজা করি' কালীর কৃপায়
পিতাপুত্র এড়ালেন এ বিষম দায়।
রাজপুত্র শম্ভুচন্দ্র ভাবিলেন মনে,—
দু'জনাই গিয়াছেন শমন-সদনে।
আজ হ'তে আমি রাজা, রাজ্যই আমার,—
ইহা বলি' সাধারণে করেন প্রচার।
পিতার ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া উল্লাস,
'কারো ভাগ্যে পৌষ-মাস, কারো সর্ব্বনাশ।'

[প্রস্তাব। স্বীয় পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে মীরজাফর পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। তখন তাঁহার জামাতা মীরকাশিম তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইংরাজদিগের আধিপত্য-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইংরাজের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন; এবং যাঁহাদিগকে ইংরাজের মিত্র বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি নানা কৌশলে হস্তগত করিতে লাগিলেন। একদা নবাব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে হুগলীতে আসিতে আদেশ দেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব-চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নবাবের সহিত কথা কহিয়া শিবপুরের মোহনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে নবাবের একজন দূত আসিয়া কহিল, "মহারাজ কি জন্য আপনাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকিয়াছেন।" মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র শিবচন্দ্রকে কহিলেন,

"এ ডাক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।" তখন তিনি শিবচন্দ্রের পরামর্শে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার হুগলী-যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র বন্দীভূত হইয়া নৌকাযোগে মুঙ্গের-দুর্গে প্রেরিত হইলেন। সেস্থানে উপস্থিত হইয়া পিতা-পুত্রে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কাটোয়া, গড়িয়া ও উদয়নালা নামক স্থানে ইংরাজদিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ হয়। এই ৩টী যুদ্ধেই ইংরাজদিগের জয় হইয়াছিল। নবাব এতদিন মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বীয় সৈন্যের পুনঃ পুনঃ পরাজয়-বার্ত্তা শুনিয়া তিনি রাজমহলে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানেও পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইংরাজ-সৈন্যও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। গর্গিণ-নামক এক জন রণ-কুশল আর্ম্মাণী নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন, এবং ইহাতেই নবাবের পরাজয় ঘটে।

মীরকাশিম ইংরাজদিগের ভয়ে মুঙ্গের হইতে পাটনায় পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় সেনাপতি গর্গিণের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধান্ধ হইয়া বন্দিগণকে বধ করিবার আদেশ দেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র উভয়েরই সত্বর প্রাণ-সংহার করিবার অনুমতি দিলেন। যে সময়ে মুঙ্গের হইতে নবাবকে প্রস্থান করিতেই হইবে, কৃষ্ণচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি অবগত হইয়া যাহাতে আপনাদের প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটে, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন।

যে সময়ে হতভাগ্য বন্দিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রকাশ হইবে, তাহার ঠিক পূর্ব্বেই পিতাপুত্রে অন্যদিন অপেক্ষা বিশেষ সমারোহ-সহ-

কারে পূজা করিতে বসিলেন। উভয়েই অতি সুপুরুষ ও গৌরবর্ণ ছিলেন। বহুদিবস বন্দী থাকায় তাঁহাদের শ্মশ্রু, কেশ ও নখ সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে ধূপ, ধুনা, দীপ ও নৈবেদ্যাদি বিন্যস্ত ছিল। তাঁহারা এইরূপ সমারোহে আন্তরিক ভক্তি-সহকারে পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে নবাবের প্রহরি-গণ তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য লইতে আসিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সজল-নয়নে ও কাতর-বচনে কহিলেন "বাপু সকল, একটু অপেক্ষা কর; আমরা জন্মের মত ভগবানের পূজা করিয়া লই। পূজা শেষ হইলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।" তাঁহারা পূজা করিতে লাগিলেন এবং জল্লাদ-গণ তাঁহাদের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা পূজা-শেষ করিবার জন্য যতই তাড়না করে, মহারাজ ততই বলেন, "এই শেষ হইল, এই শেষ হইল।" এদিকে এইরূপ বিলম্ব হইতেছিল, অন্যদিকে নবাব সঙ্গিগণ সহ পলায়ন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এজন্য দুর্গ-মধ্যে একটা বিষম গোলমাল ও কোলাহল উপস্থিত হইল। জল্লাদ-গণ নবাবের প্রস্থান দেখিতে ব্যগ্র হইয়া চলিয়া গেল। কথিত আছে, এই সময় মহারাজ জল্লাদ-গণকে বিলক্ষণ অর্থ-লোভ দেখাইতেও ক্রটী করেন নাই। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় পিতাপুত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই দিন পিতাপুত্রে যে বেশে ও যে ভাবে মুঙ্গের-দুর্গে পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার অবিকল চিত্র কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

যৎকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র মুঙ্গের-দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, তৎকালে মুঙ্গের-দুর্গের কারাগারস্থ বন্দি-গণের মৃত্যু-সংবাদ চতুর্দ্দিকে

প্রচারিত হইয়াছিল। এই হেতু মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই নবাবের আদেশে নিহত হইয়াছেন। তখন শম্ভুচন্দ্র পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ও ধনাগার অধিকার করেন, এবং মহাসমারোহে পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু পরে যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া পিতাকে একখানি পত্র লেখেন। শম্ভুচন্দ্রের গর্হিত আচরণ দেখিয়া মহারাজ নিজ মুন্সী দ্বারা তাহার যথোচিত উত্তর লিখাইয়া স্বাক্ষরের নিম্নদেশে স্বয়ং এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিয়া দিয়াছিলেন :—(ক)

"হস্তি-শুণ্ডে লকৃড়ি দিলে ছাড়ান মুস্কিল,
কুশার ভূমিতে বীজ কাড়ান মুস্কিল।
মনঃশিলা ভাঙ্গিলে যোড় লাগান মুস্কিল,
জাঁহাদিদা খাদিমেরে ভুলান মুস্কিল॥"]

(৪৪)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে রস-সাগর ও অনেকগুলি প্রাচীন সুপণ্ডিত লোক মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে

(ক) স্বর্গত দেওয়ান মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃত "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল। দেওয়ান মহাশয় লিখিয়াছেন যে, উক্ত চিত্রখানি এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। ইহা দেখিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হওয়ায় পরম-পূজনীয় কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, এই চিত্রখানি রাজবাটীতে এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।—গ্রন্থকার

মহারাজ, স্বীয় প্রপিতামহ মহারাজেন্দ্র বাহাদুর ৺কৃষ্ণচন্দ্রের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন "সমগ্র বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দের মত আর কেহ কখনও মহা-সমারোহে মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না। বিশেষতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ মুক্তহস্তে ভূমি, হীরক ও রৌপ্যাদি দান করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করিতে পারিবেন না। আমার প্রপিতামহীর মাতৃশ্রাদ্ধে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই অসন্তুষ্ট হন নাই, প্রত্যুত সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বাটী গিয়াছিলেন।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "না মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে কেহ কেহ নিরানন্দ হইয়াছিলেন। সেই শ্রাদ্ধে "কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি, কারো মহোল্লাস' হইয়াছিল।" তখন গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনিই পূরণ করুন। কিন্তু কথা এই যে, তিন চরণে আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূরণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিমোহিত করিয়া রাখিলেন :—

সমস্যা—"কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি, কারো মহোল্লাস।"

দেখিয়া দানের ঘটা সুমেরুর ত্রাস,
নাচিছে অরুণ-বাজী, পদ্মিনীর হাস,
'কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি, কারো মহোল্লাস।'

[ব্যাখ্যা। এই কবিতাটীর ভাব অতি সুন্দর। এইরূপ গূঢ়-ভাবাত্মক কবিতাকে সংস্কৃত-ভাষায় "অন্তরালাপ" কহে। "কারো স্বস্তি" অর্থাৎ কাহারও কাহারও সন্তোষ। "কারো নাস্তি" অর্থাৎ কাহারও কাহারও স্বস্তি (সন্তোষ) নাই, অর্থাৎ অসন্তোষ। "কারো মহোল্লাস" অর্থাৎ কাহারও কাহারও অত্যন্ত আনন্দ।

কৃতীর দানের মহান্ আড়ম্বর দেখিয়া সুমেরুর ত্রাস হইতেছে;

অরুণ-বাজী অর্থাৎ সূর্য্য-সারথি অরুণের অশ্ব আনন্দে নৃত্য করিতেছে; এবং পদ্মিনী আহ্লাদে হাস্য করিতেছে। দানের আড়ম্বর দেখিয়া ইহাদের এরূপ হইবার কারণ কি? কারণগুলি অতি গূঢ় ও ভাবগর্ভ। দানের ঘটায় সুমেরুর ভয় হইবার বিলক্ষণ কারণ আছে। সুমেরু সুবর্ণ-নির্ম্মিত পর্ব্বত। পাছে মহারাজ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রার্থি-গণকে দান করেন, এই হেতু সুমেরুর "স্বস্তি নাই," অর্থাৎ ত্রাস হইতেছে। সূর্য্য-সারথি অরুণের অশ্ব আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে কেন? ইহারও কারণ আছে। যদি মহারাজ সুবর্ণ-দানের জন্য সুমেরু-পর্ব্বত ধ্বংস করেন, তাহা হইলে সূর্য্য-দেবকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার পথ সহজ হইয়া যায়, অর্থাৎ দুর্গম সুমেরু-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় না, এজন্য অরুণ-বাজীর "স্বস্তি" অর্থাৎ মহান্ সন্তোষ। পদ্মিনীর হাস্য করিবার কারণ এই যে, সুমেরু-পর্ব্বত নষ্ট হইলে সূর্য্য আর অস্ত যাইবেন না, এজন্যই পদ্মিনীর "মহোল্লাস।"

(৪৫)

একদিন রস-সাগর ও আর কয়েকটী ভদ্রলোক মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বাটীতে আহার করিয়া স্ব স্ব বাটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে একজন মহারাজের বাটীতে আহার করিবার সম্বন্ধে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রস-সাগর আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন,—"কার্য্য-শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়!" তখন আর এক জন রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলায় তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কার্য্য-শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়!"

পুরুতের নিন্দা করে শ্রাদ্ধ শেষ হ'লে,
নাবিকের নিন্দা করে নদী-পারে গেলে।

সেনানীর নিন্দা করে বিজয়ী হইলে,
বাহকের নিন্দা করে বাটীতে পৌঁছিলে।
গণিকার নিন্দা করে যৌবন যাইলে,
বৈদ্য-জনে নিন্দা করে ব্যাধি দূর হ'লে।
শিক্ষকের নিন্দা করে পণ্ডিত হইলে,
জননীর নিন্দা করে বিবাহ করিলে।
ধনাঢ্যের নিন্দা করে ধন নাহি পেলে,
গৃহস্থের নিন্দা করে পেট্‌টী ভরিলে।
এ রস-সাগর তাই মনোদুঃখে কয়,—
'কার্য্য-শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়।'

(৪৬)

একদা নবদ্বীপ-নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় এই সমস্যাটী রস-সাগরকে পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন :—"কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর !" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর।"

ওমা কালি ! এই তব চরণ-কমল
মুক্তিপ্রদ তায় পুনঃ পরম শীতল।
তাই মাগো ! মনে মনে বুঝিয়া শঙ্কর
রেখে তব পা-দুখানি বক্ষের উপর
পাইয়া পরম সুখ বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গেছেন ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পাছে ঘোরতর,
'কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর !'

(৪৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগর মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"কাঁদিতে বসিয়া কেহ কাঁদিতে না পাবে!" রস-সাগর মহাশয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধ লক্ষ্য করিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কাঁদিতে বসিয়া কেহ কাঁদিতে না পাবে!"

গঙ্গাগোবিন্দের যবে মাতৃশ্রাদ্ধ হয়,
তখন কহেন সেই সিংহ মহাশয়,—
করিব মাতার শ্রাদ্ধ পরম যতনে,
পূরাব তাহার আশা, যার যাহা মনে।
"দীয়তাং ভুজ্যতাম্" সকলে বলিবে,
কোন বিষয়ের খেদ কারো না রহিবে।
আমার ইচ্ছায় আর কোন্ কার্য্য হবে,
সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যদি হয় তবে।
বিফল হইয়া কেহ নাহি চ'লে যাবে,
'কাঁদিতে বসিয়া কেহ কাঁদিতে না পাবে!'

(৪৮)

কথিত আছে যে, কলিকাতা-নিবাসী প্রসিদ্ধ সুরসিক, সুভাবুক ও সুবক্তা ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস কৃষ্ণনগরে এক সময় পাঁচালি গান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একটী চক্ষু ছিল না; এইজন্য লোকে তাঁহাকে "লোকে কাণা" বলিত। তিনি রস-সাগরের নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসেন। অনেক পরিহাস, কৌতুক ও রসালাপের পরে তিনি রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "কি করে তা

দেখি!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই গভীর-ভাব-সূচক সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া লক্ষ্মীকান্তকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কি করে তা দেখি!"

আশুতোষ! দেহি গঙ্গা, আশুতোষ হ'য়ে,
নারায়ণ ব'লে মরি তাঁর জলে র'য়ে।
আমি হে পাতকী অতি,—যমে দিয়া ফাঁকি
যম-দূতে বিষ্ণু-দূতে 'কি করে তা দেখি।'

(৪৯)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন এক পারিষদ রস-সাগরকে বলিলেন, "আপনি মহাকবি কালিদাসের ন্যায় সুরসিক ও সুভাবুক।" রস-সাগর স্বভাবতঃ অতি নিরীহ ও বিনীত ছিলেন। এই কথা শুনিয়াই তিনি কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন, আমি "কি ছার পতঙ্গ!" তখন সেই পারিষদ কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনার সমস্যা আপনাকেই পূরণ করিয়া দিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর মহাশয় এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কি ছার পতঙ্গ!"

স্বয়ং বলেন বাণী যাঁহার বদনে,
সেই কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীম-রণ-ভঙ্গ,
এ রস-সাগর ভবে 'কি ছার পতঙ্গ॥'

(৫০)

যখন রস-সাগর মহাশয় জীবনের শেষভাগে কৃষ্ণনগর-রাজবাটী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে জামাতৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এক প্রতিবেশী বন্ধু কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! কৃষ্ণ-

নগর রাজবাটীতে থাকিয়া আপনাকে নানাবিধ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হইয়াছে!” ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, “কি নাটক অভিনয় না ক’রেছি আমি!” তখন তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলায় তিনি ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—“কি নাটক অভিনয় না ক’রেছি আমি!”

ধন্য ওরে পোড়া পেট! শুধু তোর তরে
কি খেলা না খেলিয়াছি আসিয়া সংসারে!
কি না দীন-হীন ভাব ঘটেছে আমার!
না করিনু পদার্পণ চৌকাটে কাহার!
কত সাজ সাজিয়াছি ঢুকি’ সাজ-ঘরে,
শেষ না বর্ণিতে পারে তাহা শেষ ক’রে!
বেশ ক’রে ভেবে দেখ, ওরে মন! তুমি,
‘কি নাটক অভিনয় না ক’রেছি আমি!’ (১)

(৫১)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু সভায় বসিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, “আপনি নবাবী আমলের অনেক কথাই জানেন। আমলে অপরাধীকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইত, তাহা বর্ণনা করুন।” ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, “কি ভীষণ শাস্তি ছিল নবাবী আমলে!” রস-সাগর নবাবী আমলের শাস্তি-বিধান বর্ণনা করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

---

(১) রস-সাগর মহাশয় যখন এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় নিম্ন-লিখিত উদ্ভট-শ্লোকটী তাঁহার মনে আসিয়াছিল :—

“কিমকারি ন কার্পণ্যং কস্তালম্বি ন দেহলী।
অত্র দুঃখোদরস্যার্থে কিমনাটি ন নাটকম্।”

মৎপ্রণীত “উদ্ভট-সাগরঃ” (প্রথম-প্রবাহঃ) ৮৯ শ্লোকঃ।

সমস্যা—"কি ভীষণ শাস্তি ছিল নবাবী আমলে!"

নরহত্যা, রাহাদানী অথবা ডাকাতি,—
এই তিন অপরাধে শাস্তি ছিল অতি।
মাথা হ'তে পা অবধি, দ্বিখণ্ড করিয়া
দেওয়া হ'তো সাধারণ স্থানে ঝুলাইয়া।
কখনো বা ডাকাতের হাত পা কাটিয়া
ক্ষত-স্থানে উষ্ণ ঘৃত দিত নিক্ষেপিয়া।
যে করিত জাল, তার শাস্তি ভয়ঙ্কর,
বসাইয়া দিত তারে শূলের উপর।
কামাসক্ত হইয়াই বিবাহিত জন
পর-স্ত্রীর গৃহে যদি করিত গমন,
তা হ'লে অদৃষ্টে তার ঘটিত তখন
লোষ্ট্র কিংবা বাণ-ক্ষেপে জীবন-হরণ।
ক্ষুদ্র অপরাধ যার, কপালে তাহার
পোড়ান লোহার ছাঁকা দিত একবার।
বুক শুকাইয়া যায় সে সব শুনিলে,
'কি ভীষণ শাস্তি ছিল নবাবী আমলে!'

(৫২)

একদিন শ্রীশচন্দ্রের সভার সমস্যা উঠিল, "কি রকমে ছয় রিপু দিব বলি-দান!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কি রকমে ছয় রিপু দিব বলি-দান!"

(গুরুর প্রতি ভক্তের উক্তি)

প্রেম-পুষ্প, ভক্তি-জল, ধ্যান-বিল্বদল,
শরীর-নৈবেদ্য,—মোর পূজার সম্বল।

পূজা হেতু এই মাত্র মোর আয়োজন,
ইহা ভিন্ন আর কিবা আছে মোর ধন!
গুরুদেব! ব'লে দাও আমারে সন্ধান,
'কি রকমে ছয় রিপু দিব বলি-দান!'

(৫৩)

এক জন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব পণ্ডিত বহুদিন হইতেই কৃষ্ণনগর-রাজসভায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন বাঙ্গালীর সংস্রবে থাকিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় সুন্দর-রূপে কথা কহিতে পারিতেন। একদিন তিনি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "কিষণ্ কহো, কিষণ্ কহো, রাধে মৎ কহো রে!" রস-সাগর হিন্দী-ভাষাতেও মধ্যে মধ্যে সমস্যা পূরণ করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী হিন্দী-ভাষাতেই পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"কিষণ্ কহো, কিষণ্ কহো, রাধে মৎ কহো রে!"

ধরম্ সরম্ কুল-ক্রিয়া মুরলী সব লুট্ লিয়া,
জগ্‌মে কলঙ্ক দিয়া, সোহি নাম পাও রে।
সাওন সুন্দর কান, মার গেয়ে বিরহ-বাণ,
ছোড়ত রাধিকা প্রাণ, কণ্ঠাগত উওরে॥
বাঙ্কে কি রাজপাট, কুবজে কি লাগি ঠাট্,
মথুরামে তাঁক পাছ, আনন্দ সে রহো রে।
কোহলা তোর পড়ি পাঁও, ছোড়ি দে গোপ গাঁও,
'কিষণ্ কহো, কিষণ্ কহো, রাধে মত কহো রে!'

(৫৪)

মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পবিত্র কৃষ্ণনগর-রাজবংশ যেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে ইহা সেরূপ না

থাকিয়া ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে লাগিল। এজন্য রস-সাগর দুঃখ করিয়া একদিন গিরীশ-চন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পিতৃ-পৈতামহ পুরুষ-গণ যেরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আপনিও যত্ন-সহকারে তাহা রক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" ইহা শুনিয়া গিরীশ-চন্দ্র আক্ষেপ-সহকারে কহিলেন, "কীর্ত্তি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে?" ইহা শুনিয়াই রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কীর্ত্তি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে?"

কবিত্ব না থাকে যদি, কি ফল বিদ্যায়?
নীতি যদি নাহি থাকে, কি ফল রাজায়?
ধর্ম্মে কিবা ফল, যদি কৃপা নাহি রয়?
পুত্রে কিবা ফল, যদি না থাকে বিনয়?
পতি-ভক্তি না থাকিলে কি ফল ভার্য্যায়?
ভার্য্যা যদি না রহিল, কি ফল ধরায়?
দান যদি না রহিল, কিবা ফল ধনে?
'কীর্ত্তি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে?'

(৫৫)

একবার রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,—"কুখাদ্যও শোভা পায়, উষ্ণ যদি রয়।" রস-সাগর তাঁহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কুখাদ্যও শোভা পায়, উষ্ণ যদি রয়।"

দরিদ্রও শোভা পায় বিনয় থাকিলে,
কুরূপও শোভা পায় শান্ত শিষ্ট হ'লে।
কুবস্ত্রও শোভা পায় শুভ্র যদি হয়,
'কুখাদ্যও শোভা পায়, উষ্ণ যদি রয়।'

(৫৬)

একদিন রস-সাগর, খাতাঞ্চী রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতনের টাকা আনিতে গিয়াছিলেন। মজুমদার কহিলেন, "আপনাকে টাকা দিতে এখনই পারি। কিন্তু আমার একটী সমস্যা এখনই আপনাকে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কুড়ি লক্ষ টাকা।" তখন রস-সাগর মজুমদারের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা— "কুড়ি লক্ষ টাকা।"

ধন্য ধন্য ওহে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ!
বাঙ্গালায় তব সম কে করে বিরাজ?
কতই ব্রহ্মত্র ভূমি করিয়াছ দান,
কত শত পণ্ডিতের রাখিয়াছ মান।
কত শত আত্মীয়কে ক'রেছ পোষণ,
কত শত দরিদ্রকে ক'রেছ পালন।
অগ্নিহোত্র বাজপেয়,—দুই যজ্ঞ করি'
রাখিলে অক্ষয় নাম চিরদিন ধরি'।
যাহা কিছু করিয়াছ, করিয়াছ পাকা,
এই দুই যজ্ঞে ব্যয় 'কুড়ি লক্ষ টাকা।'

(৫৭)

একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবৈদ্য রাজ-সভায় বসিয়া কুবৈদ্যের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, "কুবৈদ্য যমের দাদা,—বুঝিলাম সার।" ইহা শুনিয়া গিরীশ-চন্দ্র হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিয়া ইহা পূরণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রস-সাগরও ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"কুবৈদ্য যমের দাদা,—বুঝিলাম সার।"

হে কুবৈদ্য! নমস্কার চরণে তোমার.
তোমার গুণের কথা কি কহিব আর!
যিনি যম-দেব, তুমি তাঁর বড় ভাই,
তোমার অশেষ গুণ ভাবিয়া না পাই।
রোগীর প্রাণটী শুধু যম-দেব হরে,
ধন প্রাণ,—দুটী তুমি হর কৃপা ক'রে।
না আছে তোমার হাতে কাহারো নিস্তার,
'কুবৈদ্য যমের দাদা,—বুঝিলাম সার।'

(৫৮)

একদা রাজসভায় প্রশ্ন হইল, "কুস্বপনের গোড়া।" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কুস্বপনের গোড়া।"

হরি-বোল রাধা-কৃষ্ণ মুখে এই বুলি,
গলে আর কাঁধে যত অধর্ম্মের ঝুলি।
কদাচার অধার্ম্মিক যত ব্যাটা ন্যাড়া,
কাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত 'কুস্বপনের গোড়া।'

(৫৯)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র, নবদ্বীপ-নিবাসী কয়েক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সভায় বসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তৎকালীন সভা-পণ্ডিত-গণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে ছিলেন। সে সময় রস-সাগরও সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তন্ময় হইয়া এই সব কথা শুনিতে ছিলেন। কথায় কথায় মনের আবেগে রস-সাগর বলিয়া ফেলিলেন,

"কৃষ্ণনগরের মত নগর কোথায়!" তখন একটী পণ্ডিত তাঁহাকে এই সমস্যাটী করিতে বলায় তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কৃষ্ণনগরের মত নগর কোথায়!"

নিবেদন করি, কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ!
কোথায় যাইয়া আজ করিছ বিরাজ!
না দিয়া ব্রহ্মত্র-ভূমি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে
জল-স্পর্শ না করিতে তোমার জীবনে!
অকাতরে ধন-দান ক'রেছ সকলে,
তোমার মতন দাতা কে ছিল তৎকালে!
বিদ্যা-ধন, কিবা ধন,—বুঝেছিলে তুমি,
নবদ্বীপ ক'রে ছিলে পণ্ডিতের ভূমি!
বসালে চাঁদের হাট নিজের সভায়,
সে কথা শুনিলে বুক শুকাইয়া যায়।
কোথা সেই জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন,
যাঁর মত শ্রুতিধর না ছিল কখন!
কোথায় শরণ সেই নৈয়ায়িক-পতি,
যাঁহার বদনে ছিল বাণীর বসতি!
কোথা সেই বাণেশ্বর বিদ্যা-অলঙ্কার,
কবিতার বাস-স্থান রসনা যাঁহার!
কোথা গেল সেই রাম-প্রসাদ তোমার,
শক্তির পরম প্রিয়, ভক্তির আধার!
কোথা সে ভারত-চন্দ্র রায়-গুণাকর,
রসের আকর যাঁর সে বিদ্যা-সুন্দর!

কোথা সেই মুক্তারাম বিপ্র বৈবাহিক,
যাঁর মত নাহি ছিল চাপা সুরসিক!
কোথা সেই হাস্যার্ণব বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ,
অচেতনে হাসাইয়া কবিলা চেতন!
কোথা সে গোপাল ভাঁড়, রস-ভাণ্ড যাঁর
সাগরের মত ছিল আগাধ অপার!
হরিরাম, কৃষ্ণানন্দ আর রুদ্ররাম,
শ্রীরাম-গোপাল, প্রাণনাথ, শিবরাম,
রামানন্দ আর রমা-বল্লভ শঙ্কর,
শ্রীমধুসূদন, সুপণ্ডিত রামেশ্বর,—
এ সব পণ্ডিত রাজ-সভায় থাকিত,
যাঁদের প্রতিভা-করে সভা সুশোভিত।
যে কৃষ্ণ-নগর ছিল বৈকুণ্ঠ-সমান,
শ্মশান বলিয়া তাহা আজ অনুমান!
এ রস-সাগর তাই বলে হায় হায়,—
'কৃষ্ণ-নগরের মত নগর কোথায়!'

(৬০)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত-গণের প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন "কেবা সিংহ, কেবা ব্যাঘ্র,—বুঝে উঠা ভার।" রস-সাগর, মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কেবা সিংহ, কেবা ব্যাঘ্র,—বুঝে উঠা ভার।"

সুবিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন,
পুণ্যবতী ত্রিবেণীর যিনিই ভূষণ।

নৈয়ায়িক, স্মার্ত্তবর আর শ্রুতিধর,
যশস্বী ছিলেন যিনি সর্ব্ব-গুণাকর।
সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যা-অলঙ্কার
তাঁর মত উপস্থিত কবি মিলা ভার।
যাঁহার বসতি ছিল গুপ্তিপাড়া-গ্রামে,
রাঢ় বঙ্গ খ্যাত ছিল যাঁহার সুনামে।
ইঁহাদের কেবা বড়, কেবা ছোট আর,
'কেবা সিংহ, কেবা ব্যাঘ্র,—বুঝে উঠা ভার।'

(৬১)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। নিজ পূর্ব্ব-পুরুষ-গণের ইতিহাস তাঁহার বিশেষ-রূপ বিদিত ছিল। একদিন তিনি রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনাকে অন্য একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ক্ষুদ্র হ'তে মহতেরো প্রাণরক্ষা হয়!" রস-সাগর নানা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি যুবরাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন :—

[প্রস্তাব। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সুন্দর-বনের অন্তর্গত যশোর-নগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তিনি স্বাধীন রাজা হইবেন, এই বাসনাই তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ-রূপ বলবতী ছিল। তিনি স্বীয় রাজ্য নিরাপদ্ রাখিবার জন্য নিজ পিতৃব্য বসন্ত-রায়ের প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া প্রতাপাদিত্য বসন্ত-রায়ের পুত্রটীকে বধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হন। মহারাণী নানা কৌশলে পুত্রটীর প্রাণরক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মাতার আদেশে পুত্রটী কচু-বনে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার জীবন-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়াই রস-সাগর এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন।]

সমস্যা—"ক্ষুদ্র হ'তে মহতেরো হয় উপকার।"

শুন হে প্রতাপাদিত্য কেবা বুঝে তব তত্ত্ব
সত্য মিথ্যা তথ্য হায় কেবা লয় তার!
অকথ্য কথাটা শুনে বড় ব্যথা পাই মনে
পিতৃব্য বসন্ত-রায়ে করিলে সংহার॥
শোণিতের পিপাসায় পাছে ছাতি ফেটে যায়
তাই তাঁর পুত্রকেও বধিতে বাসনা।
ভাসিয়া চক্ষের জলে মহারাণী ছলে বলে
পুত্রটীর রক্ষা হেতু করিলা কামনা॥
মাতার আদেশ ল'য়ে পুত্রটীও ভয়ে ভয়ে
নিজ প্রাণ বাঁচাইলা গিয়া কচু-বনে।
সে অবধি "কচু-রায়" নাম তাঁর এ ধরায়
জাহাঙ্গীর বাদসাহে তুষিলা যতনে॥
হে প্রতাপ! নিবেদন তোমার স্থন্দর-বন
বৃহৎ হ'লেও তাহে কি ফল তোমার?
ধন্য সেই কচু-বন কচুর জীবন-ধন
'ক্ষুদ্র হ'তে মহতেরো হয় উপকার।'

(৬২)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র, রস-সাগরকে কহিলেন, "এই পৃথিবীতে কোন্ জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত?" রস-সাগর কহিলেন, "খলের সর্ব্বাঙ্গে বিষ রহে সর্ব্বক্ষণ!" তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "আপনার সমস্যা

আপনাকেই পূরণ করিয়া দিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সমস্যা—"খলের সর্ব্বাঙ্গে, বিষ রহে সর্ব্বক্ষণ!"

ভক্ষকের দন্তে বিষ, মক্ষিকার শিরে,
বৃশ্চিকের পুচ্ছে বিষ,—হেরি এ সংসারে।
এ রস-সাগর কহে,—একি অলক্ষণ,—
'খলের সর্ব্বাঙ্গে বিষ রহে সর্ব্বক্ষণ!'

(৬৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সবিশেষ আর্থিক কষ্ট হওয়ায় রস-সাগর কয়েক মাস বেতন পান নাই। একদিন তিনি মহারাজের দেওয়ান রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতন আনিতে গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে ক্রোধভরে তিনি স্বয়ং মহারাজের সভায় গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "খেটে খেটে জান গেল,—মাহিনা না পাই!" মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনি পূর্ণ করিয়া না দিলে ছাড়িব না।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"খেটে খেটে জান গেল,—মাহিনা না পাই।"

শুন হে গিরীশ-চন্দ্র নিবেদন করি,—
তোমার আশ্রয়ে আছি বহুদিন ধরি'।
কেবল তোমারি আমি নাম-সুধা খাই,
কেবল তোমারি আমি যশোগান গাই।
কেবল তোমারি আমি মুখ পানে চাই,
কেবল তোমারি আমি প্রেম-পথে যাই।

মজুমদারের পিছে নিরন্তর ধাই,
কেবল তাহার মুখে শব্দ "নাই, নাই"
টাকা চাহিলেই তার মুখে উঠে হাই,
ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ টানে গুড়ুক্ সদাই।
কি করি, পেটের দুঃখে আক্ষেপ ইহাই—
'খেটে খেটে জান গেল,—মাহিনা না পাই!'

(৬৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের পিতা মহারাজ ঈশ্বর-চন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-ভাগে অঞ্জনা-নদী-তীরে এক সুরম্য হর্ম্ম্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে এক মনোহর উদ্যান প্রস্তুত করাইয়া এই স্থানের নাম "শ্রীবন" রাখিয়াছিলেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র মধ্যে মধ্যে রস-সাগর ও পারিষদ-গণকে লইয়া শ্রীবনে গিয়া বাস করিতেন। একবার চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে সর্ব্বগ্রাস হইবার কথা ছিল। মহারাজ সর্ব্বগ্রাস দেখিবার জন্য রস-সাগর ও পারিষদ-গণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত সুরম্য হর্ম্ম্যের উপরিভাগে উঠিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সর্ব্বগ্রাস হইল না,—কিয়দংশ-মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন মহারাজ কহিলেন, "খেতে খেতে খেলে না"। রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"খেতে খেতে খেলে না।"

খেদে কহে বিরহিণী মণিহারা যেন ফণী
অভাগীর পক্ষে হিত কেহ ত করিলে না।
অবলার ভাগ্য-ফলে কপালীর কোপানলে
মদনেরে এককালে দহিয়ে দহিলে না॥
সেতু-বন্ধে নানা গিরি উপাড়িয়া বাঁধে বারি
হনুমান্ বলবান্ মলয় ভাঙ্গিলে না।

হেদে ব্যাটা চণ্ডালিয়ে পূর্ণশশী মুখে পেয়ে
গ্রহণেতে গ্রাসিতে 'খেতে খেতে খেলে না॥'

(৬৫)

একদা কোন ভদ্রলোক রস-সাগরকে অপ্রতিভ করিবার জন্য মহারাজ গিরীশ চন্দ্রের সভায় বহুলোকের সমক্ষে বলিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আজ একটী কঠিন সমস্যা আপনাকে দিব। যদি আপনি ইহা এখনই পূরণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাকে মহাকবি বলিব।" ইহা বলিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গগন-মণ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়া।" রস-সাগর অবলীলা-ক্রমে তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকেই অপ্রতিভ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"গগন-মণ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়া।"

শক্তি-শেলে ম্রিয়মাণ, লক্ষ্মণের হত জ্ঞান,
রামাজ্ঞায় হনূমান্ গন্ধ-মাদনে যায়।
ঔষধ-সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি,
নন্দীগ্রাম পরিহরি ঊর্দ্ধপথে ধায়॥
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম-চরিত গায়,
হৃদয় ভাসিয়া যায়, নেত্র-জলে ধোয়া।
শত্রুঘ্ন রে দেখ দিবা, বিধির আশ্চর্য্য কিবা,
'গগন-মণ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়া'॥

[ব্যাখ্যা। শিবা=শৃগাল বা শৃগালী। "শিবা ঝাটামলোহঃধো। অভয়ামলকীগৌরীক্রোষ্ট্রীসক্তফলাস্থ চ"॥—বিশ্বঃ। "শিবা গৌরীফেরবয়োঃ"—অমরঃ। "পুংশৃগালেঽপি শিবা"—মুকুটঃ।

(৬৬)

একদা কোন ব্যক্তি রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "গগনে

ডাকিছে শিবা হুয়া হুয়া করি।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা এই-ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"গগনে ডাকিছে শিবা হুয়া হুয়া করি।"

শক্তি-শেলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ,
পর্ব্বত লইয়া গেল পবন-নন্দন।
গমনের বেগে গিরি কাঁপে থরহরি,
'গগনে ডাকিছে শিবা হুয়া হুয়া করি।'

(৬৭)

একদিন রস-সাগর ও তাঁহার এক প্রতিবেশী বন্ধু একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান করিতে করিতে তাঁহার বন্ধু কহিলেন, "রস-সাগর ভায়া! আমরা এরূপ দুর্ভাগ্য যে, শান্তিপুরে গঙ্গাগর্ভে বাস করিয়াও আমরা গঙ্গাস্নান করি না।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "গঙ্গাতীরে বাস করি' চায় কূপ-জল।" ইহা শুনিয়া রস-সাগরের বন্ধু কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন।" রস-সাগরও এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"গঙ্গাতীরে বাস করি' চায় কূপ-জল।"

দেব দেব বাসুদেবে করি' পরিহার
যেই জন পূজা করে অন্য দেবতার,
সে দুর্ম্মতি পিপাসায় হইয়া বিহ্বল
'গঙ্গাতীরে বাস করি' চায় কূপ-জল।'

(৬৮)

কোন সময়ে নবদ্বীপ-নিবাসী এক জন অসাধারণ পণ্ডিত, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজের একজন পারিষদ রস-সাগরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবার এই পণ্ডিত

মহাশয়ের একটী কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিতে না পারিলে সাগর শুকাইয়া যাইবে।" রস-সাগর কহিলেন, "প্রশ্ন করুন।" তখন পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "গজের উপরি গজ, তদুপরি অশ্ব।" দ্বিরুক্তি না করিয়া রস-সাগর তাহা সহাস্য-বদনে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"গজের উপরি গজ, তদুপরি অশ্ব।"

হু হু হু হু হুহুঙ্কার, পদাঘাতে দেহ কার,
হয় বুঝি ছারখার, রসাতল বিশ্ব।
হি হি হি হি অট্টহাসি, অষ্ট দিকে অষ্ট দাসী,
শিবের হৃদয়ে বসি, না করিলা দৃশ্য॥
কিং কিং কিং কিং কিমাভাসে, অনায়াসে দৈত্য নাশে,
শোণিত-সাগরে ভাসে শিবের সর্ব্বস্ব।
হা হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার,
'গজের উপরি গজ, তদুপরি অশ্ব।'

(৬৯)

নবদ্বীপ-নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় কৃষ্ণনগরে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন :—"গমনের আয়োজন শমনের ঘরে!" রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"গমনের আয়োজন শমনের ঘরে!"

শুন রে অবোধ মন! করি নিবেদন,—
দিন দিন এ দেহের হ'তেছে পতন।
করেতে সাধের ছড়ি কাঁপিতে লাগিল,
দন্ত গুলি একে একে খসিয়া পড়িল।

মস্তক-উপরে দেখা দিল পক্ক কেশ,
বুঝা গেল, হইতেছে জীবনের শেষ।
জরা এ'ল, দেখা গেল মৃত্যুর প্রাগল,
আর কেন ওরে মন! বাড়াও জঞ্জাল!
মুদিলে নয়ন দুটী খুলিবে না আর,
বারেক শুইলে হায় উঠে বসা ভার।
কলসীর জল টুকু গড়াতে গড়াতে
ক্রমশই ক্ষয় হয়,—না পায় বাড়িতে।
কিবা দারা, পুত্র, কন্যা, অন্য পরিবার,
কেবা তুমি, কেবা আমি,—ভাব একবার।
ব্রহ্মপদ নিরাপদ,—সংসার সাপদ,
আর কেন পদে পদে বাড়াও বিপদ্?
কেন বা বিলম্ব আর কর এ সময়,
এখনই ব্রহ্মপদে লও রে আশ্রয়।
প্রস্তুত হও রে মন! যাইবার তরে,
'গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।'

(৭০)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কোন কোন দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ-নগরের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইতেন। একদিন তিনি মল্লিক-পাড়ার বারোয়ারী-তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ৺দেবীর প্রতিমা খানি প্রস্তুত হইতেছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অর্দ্ধ-প্রস্তুত মূর্ত্তিগুলি ফাটিয়া যাইতেছে, এবং সিংহের শরীরস্থ খড় গুলি টানিয়া গাভীতে ভক্ষণ করিতেছে। মহারাজের মনে মনে ভাবটী জাগরূক ছিল। তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াই রস-সাগরকে সম্মুখে

দেখিতে পাইলেন, এবং প্রশ্ন করিলেন, "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

মহারাজ নিজধাম হইতে বাহির,
বারোয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির।
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির,
'গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।'

(৭১)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধরি' রেখেছেন হর!" রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধরি' রেখেছেন হর!"

১ম পূরণ।

সাংসারিক কষ্ট যদি হয় অতিশয়,
বাটীর কর্ত্তার ইচ্ছা,—ব্যয় অল্প হয়।
দুটী পেট্ এক হ'লে মন্দ নাহি হবে,
সাংসারিক কষ্ট হায় অনেক কমিবে।
এ বিষয় মনে মনে ভাবি' নিরন্তর
'গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধরি' রেখেছেন হর!'

মহারাজ এই পূরণ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আপনি রস-সাগর! আপনার নামের সার্থকতা রাখিয়া সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর মহারাজের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী পুনর্ব্বার এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

২য় পূরণ।

সকলি অসার, হায় এ পোড়া সংসারে,
নিতম্বিনী নারী হ'লে সার বলি তারে।
এ বিষয় মনে মনে ভাবি' নিরন্তর
'গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধরি' রেখেছেন হর!'

(৭২)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময় রাজীব-লোচন নামক এক জন ইজার-দার ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে ইজারদারী লইয়া ক্রমে ক্রমে নানা কৌশলে তিনি বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। একদিন রস-সাগর রাজবাটী হইতে দশ টাকার একখানি বরাতী চিঠি লইয়া রাজীব-লোচনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজীব-লোচন সুবিধা পাইয়া রস-সাগরকে দশ টাকার স্থলে ছয় টাকা বাদ দিয়া ও রসিদ লইয়া অবশিষ্ট চারি টাকা দিতে চাহিলেন। দশ টাকার স্থলে চারি টাকা লইয়া বাটীতে ফিরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। তখন রাজীব-লোচন মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, "ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি।" রস-সাগরও রাজীব-লোচনকে কটাক্ষ করিয়া এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি।"
কে তুমি তা ভুলে গেলে রাজীব-লোচন!
এ রস-সাগর দেখে ভগ্ন দশানন।
কাটা গেল সেনাপতি, দেখা দিল বিধি,
'ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি।'

[প্রস্তাব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনগর-রাজবংশ-ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মহল ইজারা দিয়াছিলেন। রাজ-সংসারে টাকার অত্যন্ত অভাব হওয়ায় রাজ-কর্ম্মচারি-গণ মহারাজের অনুমতি-ক্রমে পাওনাদার-দিগকে বরাতী চিঠি দিতেন। তাঁহারা এই চিঠি লইয়া গিয়া ইজারদার দিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। পাওনাদারের টাকার নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে ইজারদার বিলক্ষণ ডিস্‌কাউণ্ট বাদ দিয়া বরাতী টাকা দিতেন। রাজীব-লোচন গিরীশ-চন্দ্রের এক জন ইজারদার। ইনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ইজারদারী লইয়া ও পাওনাদার-দিগকে ডিস্‌কাউণ্ট বাদে টাকা দিয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রস-সাগর এক খানি দশ টাকার বরাতী চিঠি লইয়া রাজীব-লোচনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজীব-লোচন কহিলেন, "যদি এই দশ টাকার মধ্যে ছয় টাকা বাদ দিয়া বাকী চারি টাকা লইতে চাহেন, তবে আমি এখনই টাকা দিতে পারি, নচেৎ দিতে পারি না।" রস-সাগর এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কি করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজীব-লোচন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ঘোল খাবে হরিদাস, টাকা দিবে নিধি!" এই ঘটনার স্বরূপ-বর্ণনা করিয়াই রস-সাগর মনের দুঃখে কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রস-সাগর যখন এই কবিতাটীর ব্যাখ্যা রাজীব-লোচনকে শুনাইয়াছিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া রস-সাগরকে দশ টাকাই দিয়াছিলেন।"]

[ব্যাখ্যা। "ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দিবে নিধি."—মহারাজ রস-সাগরের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ অনুভব করিবেন, কিন্তু আমি স্বয়ং রস-সাগরকে টাকা দিব। "কে তুমি তা ভুলে গেলে রাজীবলোচন"— হে রাজীব-লোচন! তোমার অবস্থা পূর্ব্বে কি ছিল, এবং এখন কি হইয়াছে, তাহা একবার মনে করিয়া দেখা উচিত।

ভগ্ন দশানন—এক একটী টকোর উপরি-ভাগে এক একটী রাজা বা রাণীর মুখ অঙ্কিত থাকে; "আনন" শব্দের অর্থ টাকা: সুতরাং "দশানন" শব্দের অর্থ দশ টাকা। তাহাও "ভগ্ন" হইল। অর্থাৎ দশ টাকা আমার প্রাপ্য; তাহাও তুমি কমাইতে চাও। "কাটা গেল সেনাপতি"—"সেনাপতি" শব্দের অর্থ সেনানী অর্থাৎ ষড়ানন কার্ত্তিক। সুতরাং ষড়ানন অর্থাৎ ছয় টাকা বাদ গেল। "দেখা দিল বিধি"—বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা চতুরানন অর্থাৎ চারি টাকা। এখন ছয় টাকা বাদ দেওয়াতে বাকী চারি টাকা মাত্র রহিল।]

(৭৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, আপনাকে এখন একটী জটিল সমস্যা পূরণ করিতে দিব। ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যা দিলেন,—"চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয়।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয়।"

বিষম দুরন্ত শত্রু হ'লে পরাজিত,
কার মনে মহা হর্ষ না হয় আগত?
বিরহে যে দুঃখ হয় চন্দ্রের উদয়ে,
চকী তাহা জানে ভাল নিজের হৃদয়ে।
শুন হে গিরীশ-চন্দ্র! সুযশে তোমার
চন্দ্রোদয় তিরস্কৃত হোগ্ অনিবার।
বিরহ-বেদনে তাই ব্যথিত-হৃদয়
"চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয়।"

(৭৪)

একদিন শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু রস-সাগরকে কহিলেন, "মহাশয়!

আপনি ত 'রসের সাগর'। আপনাকে আমার একটী রসের সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন,—"চপলা না হ'লে তাঁর কিবা আর গতি!" রস-সাগরও এই রসাত্মক কবিতাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"চপলা না হ'লে তাঁর কিবা আর গতি!"

লক্ষ্মীরে চপলা বলি' দুর্নাম রটায়,
সাগরেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায়?
পুরাণ পুরুষ এক—বয়ঃক্রম যার
গণনা করিতে পারে, সাধ্য হেন কার?
এ হেন বুড়ার হস্তে লক্ষ্মীরে ধরিয়া
সাগর সঁপিয়া দিল, কিছু না ভাবিয়া!
হায় রে বুড়ার হাতে পড়িলে যুবতী
'চপলা না হ'লে তাঁর কিবা আছে গতি!'

(৭৫)

শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু একবার রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন,—"চ্বি-প্রত্যয় ব'লে তারে হয় অনুমান।" তিনি আরও আদেশ করিয়াদিলেন যে, একমাত্র চরণ দিয়াই ইহা আপনাকে পূরণ করিতে হইবে। রস-সাগর তদনুসারে ইহা এই-ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"চ্বি-প্রত্যয় ব'লে তারে হয় অনুমান।"

ধনবান্ নিঃস্ব হয়, নিঃস্ব ধনবান্,
'চ্বি-প্রত্যয় ব'লে তারে হয় অনুমান।'

(৭৬)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুরাম মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

নিজ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকেই উত্তরাধিকারী করিবার বাসনায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রঘুরামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রামগোপালও নবাবের নিকটে রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃব্যের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত নবাবের প্রধান প্রধান অমাত্য, কর্ম্মাধ্যক্ষ ও জগৎশেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি-গণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। রামগোপালের কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল না। তিনি এত ধূম-পান-পরায়ণ ছিলেন যে, ধূমপানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ও রামগোপাল উভয়েই নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার-সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে যাইতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শানুসারে মুরশিদাবাদে রাজপথের চকের উভয় পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট তামাক খাইতে লাগিল। রামগোপাল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তামাকের সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। নবাবের নিকটে অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হইবে না—ইহা ভাবিয়া তিনি বাহকগণকে পাল্‌কী নামাইতে আদেশ দিলেন; এবং স্বীয় ভৃত্যকে কহিলেন, "উহারা যে তামাক খাইতেছে, তাহার এক ছিলিম সাজিয়া দে।" ধূমপায়ি-গণ পূর্ব্বশিক্ষানুসারে ভৃত্যকে ছলে ও কৌশলে তামাক দিতে বিলম্ব করিল। এদিকে তাঁহার জন্য তামাক সাজা হইতে লাগিল; ওদিকে নবাব-বাটীতে নবাব সাহেবও যথাকালে সভায় আসিয়া দরবার করিতে বসিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বেই নবাব-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধূম-পান-ব্রত রামগোপাল যথাসময়ে সভায় যাইতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বিনীত-বচনে ও অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে নবাবকে আপনার প্রার্থনাসিদ্ধির কথা বিজ্ঞাপন করায় নবাব সভাসদ্-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রঘুরাম এরূপ বিজ্ঞ ও গুণবান্ পুত্রকে রাজ্য না দিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্য দিতে কেন ইচ্ছা করিয়াছিল? সভাসদ্-গণ কহিলেন, "জাহাপনা! বোধ হয়, পুত্রকে তরুণ-বয়স্ক দেখিয়াই রঘুনাথ তাঁহাকে রাজ্য দিতে স্বীকার করে নাই।" তখন নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামগোপাল কোথায়?" কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, "তিনি মুরশিদাবাদে চকের পথে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।" নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে আনিবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত আসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" ইহা শুনিবামাত্র নবাব তাঁহাকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকেই রঘুরামের উত্তরাধিকারী হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র পূর্ব্ব-পুরুষের এই সকল বৃত্তান্ত সভায় বসিয়া বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময় তিনি রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্য-বদনে প্রশ্ন করিলেন, "চারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ?" রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এই প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন।

সমস্যা—"চারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ।"

"তামাক" আমার নাম, ব্যাপ্ত চরাচর,
প্রবল কলির আমি প্রবল কিঙ্কর।
সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল-সাধনে
ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মা মনে মনে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জন,—
এই চারি-বর্ণ-ভেদ করেন তখন।
পরম প্রতাপশালী কলি মহাশয়
একথা শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ অতিশয়;

মোর প্রতি শেষে তাঁর হইল আদেশ,—
'চারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ।" (১)

(৭৭)

একদা সমস্যা উঠিল, "চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!"

বিশ্বের মঙ্গল, বৃষ্টি হ'লে যথাকালে,
নিঃস্বের মঙ্গল মহা, মন্দাগ্নি হইলে।
শিষ্যের মঙ্গল, যদি সাধু গুরু পায়,
শস্যের মঙ্গল, যদি পতঙ্গ না খায়।
সতীর মঙ্গল, যদি থাকে লজ্জা-ভয়,
বেশ্যার মঙ্গল, যদি লজ্জা নাহি রয়।
যোগীর মঙ্গল, যদি না পায় আহার,
ভোগীর মঙ্গল, যদি ক্ষুধা থাকে তার।
ত্যাগীর মঙ্গল, যদি ধন পরিহরে,
রোগীর মঙ্গল, যদি কুপথ্য না করে।
বিপ্রের মঙ্গল, যদি মনে তুষ্ট রয়,
রাজার মঙ্গল, যদি অসন্তুষ্ট হয়।

---

(১) এই সমস্যা-পূরণ-কবিতা, কবিচন্দ্র-কৃত নিম্ন-লিখিত উদ্ভট-কবিতার সম্পূর্ণ অনুরূপ:—

ভ্রাতঃ কথং হুমাথুর্গমনমিহ কুতো বারিধেঃ পূর্ব্বপারাৎ
কর্ত্তুং ত্বং দণ্ডধারী নহি তব বিদিতং শ্রীকলেরেব রাজ্যং।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং বিধাত্রা বিবিধবিরচিতং ধর্ম্মকর্ম্মপ্রভেদ-
মেকীকর্ত্তুং বলাত্তত্রিখিলজগতি রে শাসনাদাগতোঽস্মি॥

চিরসুখী হ'লে তার মঙ্গল জীবন,
'চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!'

(৭৮)

এক জন প্রশ্ন করিলেন, "চোক্ গেল রে বাবা।" রস-সাগর দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের উক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"চোক্ গেল রে বাবা।"

(বলিরাজকে লক্ষ্য করিয়া শুক্রাচার্য্যের উক্তি)

মূর্খ ভিন্ন সর্ব্বস্ব খোয়ায় কোন্ জন?
বার-বার বলিরাজে করেছি বারণ।
গুরু-বাক্য অবহেলে,—এম্নি ব্যাটা হাবা!
গাড়ুর মধ্যে থেকে আমার 'চোক্ গেল রে বাবা।'

(৭৯)

যখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের পিতৃব্য দিগ্বিজয়-চন্দ্র কাশীধামে বাস করিতেছিলেন, তখন রস-সাগরও ৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন-বাসনায় ৺কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। রস-সাগর যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তখন দিগ্বিজয়-চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "ছি ছি ছি অমৃত-পান করেছিলাম কেনে?" রস-সাগর কাশীধামের মহিম-বর্ণন-পূর্ব্বক এই ভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ছি ছি ছি অমৃত-পান করেছিলাম কেনে?"

জলে কিংবা স্থলে মৃত্যু, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কাণে।
ম'লে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে,
দেবতার আর্ত্ত-নাদ আত্ম-অভিমানে।

ক্ষিতি-মুক্ত-বারাণসী-মহিমা কে জানে,
অমর মরিতে চায় আসি' কাশী-স্থানে।
ম'লে হ'তাম দেবের দেব আনন্দ-কাননে,
'ছি ছি ছি অমৃত-পান করেছিলাম কেনে?'

[ব্যাখ্যা। অমৃত-পান করিয়াছেন বলিয়া দেবগণ অমর হইয়া রহিয়াছেন। ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিতে পারিলে তাঁহারা দেবাধিদেব মহাদেব হইয়া আনন্দ-কানন কাশীধামেই বিরাজ করিতে পারিতেন। দেবগণ অমর হইয়াছেন বলিয়া তাহা আর তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিতেছে না। এই হেতু দেবগণ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 'কেন না বুঝিয়া আমরা অমৃত-পান করিয়াছিলাম!...]

(৮০)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত নিজ-গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন যুবরাজ প্রশ্ন করিলেন, "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর অতি ভয়ঙ্কর।" রস-সাগর এই ভীষণ মন্বন্তরের স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"ছিয়াত্তরে মন্বন্তর অতি ভয়ঙ্কর।"

বাঙ্গালা এগার শত ছিয়াত্তর সাল,
হৃৎকম্প হয় শুনে মানুষের হাল।
নদ নদী যত কিছু সব শুকাইল,
খাল বিল পুষ্করিণী জল-শূন্য হ'ল।
শুকাল আমন ধান, নষ্ট রবি-খন্দ,
শুকাল আউশ ধান, চাষা নিরানন্দ।

বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ অধিবাসি-চয়
অন্নাভাবে নয় মাসে গেল যমালয়।
কৃষকের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইল,
নয় মাসে কোটি লোক মৃত্যু-মুখে গেল।
তিন মণ পাওয়া যেত যে চা'ল টাকায়,
তিন সের পাওয়া তার ভার হ'ল হায়।
আড়াই টাকায় হ'ত যে ঘৃতের মণ,
সাড়ে সাত টাকা দর তাহার এখন।
কৃষকেরা গো-মহিষ বেচিতে লাগিল,
হল, মই, বিদা আদি যাহা কিছু ছিল।
কেহ কেহ কন্যা পুত্র লাগিল বেচিতে,
কেহ কেহ নর-মাংস লাগিল খাইতে।
চারি সের চা'ল ল'য়ে পত্নী ছাড়ে পতি,
পেটের জ্বালায় হায় এরূপ দুর্গতি।
গভর্ণর কার্টিয়ার ধর্ম্ম-অবতার!
দেখে যাও রেজা খাঁর কিবা অত্যাচার।
দেশের সমস্ত চা'ল কিনিয়া বাজারে
বেচিছে ভীষণ দরে একচেটে ক'রে!
অন্নাভাবে হাহাকার উঠে ঘোরতর,
'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর অতি ভয়ঙ্কর!'

(৮১)

মহাতাপ-চাঁদ জগৎশেঠের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ প্রণয় ছিল। সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার নিমিত্ত যখন জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছিল, তাহার পর হইতেই

এই প্রণয় বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র একদিন রাজ-সভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত এই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন, "জগৎ-শেঠের কাছে কুবের কোথায়?" রস-সাগর মহারাজের এই সমস্যাটী এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"জগৎ-শেঠের কাছে কুবের কোথায়!"

কি নবাব, কিবা রাজা, কিবা মহারাজ,
কি আর্ম্মাণি, কি ফরাসী, অথবা ইংরাজ,—
যখন টাকার যাঁর হ'ত প্রয়োজন,
ঘুরিয়া উঠিত মাথা যাঁহারি যখন,
জগৎ-শেঠের কাছে তিনিই যাইয়া
শ্রীমহামহিম-পাঠ দিতেন লিখিয়া।
মীর হাবিরের সঙ্গে যবে বর্গী-গণ
সোণার মুর্শিদাবাদ করে আক্রমণ,
জগৎশেঠের গদি তখন লুঠিল,
চারি কোটী টাকা জোরে কাড়িয়া আনিল।
হীরা মণি মুক্তা সোণা রূপা কত আর,
কতই বন্ধকী মাল, কত অলঙ্কার,—
এ সব লুটিয়া যবে বর্গীগণ গেল,
জগৎশেঠের মনে দুঃখ নাহি হ'ল।
কহিলেন তেজস্বিনী শেঠ-রাণী বুড়ি,—
"চারি কোটী টাকা মোর চারি কড়া কড়ি।"
এ রস-সাগর তাই বলে হায় হায়,—
"জগৎ-শেঠের কাছে কুবের কোথায়!"

(৮২)

কথিত আছে যে, কলিকাতা হইতে এক সুশিক্ষিত ভদ্রলোক রস-সাগরকে এক উৎকট সমস্যা পূরণ করিতে দিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করিব, এই আশায় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে রস-সাগর কৃষ্ণনগরের বাটীতে আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। মহারাজ যথাকালে তাঁহাকে সভায় ডাকাইয়া আনিলে উক্ত ভদ্রলোক তাঁহাকে এই উৎকট সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন। সমস্যাটী এই :—"জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী।" রস-সাগর কাল-বিলম্ব না করিয়া এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী।"

ধান্যরূপা লক্ষ্মী,—তিনি জগৎ-জননী,
ধরাতলে গোলা-রূপা তাঁহার জননী।
তৃণ-হীন সচ্ছিদ্র গোলার চাল দ্বারা
বর্ষাকালে তার মধ্যে পড়ে বারি-ধারা।
আপ নারায়ণ সহ সংসর্গের পরে
গর্ভবতী হয় মাতা গোলার উপরে।
যথাকালে অঙ্কুরাদি তনয় অমনি,
'জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী।'

(৮৩)

একদিন কৃষ্ণনগরের বারোয়ারী-তলায় হরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। রস-সাগর তাহা শুনিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে এক জন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "জয় জয় জয় তার জয় জয় জয়!" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ এইভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন :—

সমস্যা—"জয় জয় জয় তার জয় জয় জয়!"

"সুধা-সম "হরি" এই দুইটী অক্ষর
যাহার জিহ্বার অগ্রে রহে নিরন্তর,
যম-ভয় সেই জন করে পরাজয়,
'জয় জয় জয় তার জয় জয় জয়!'

(৮৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় রস-সাগর কয়েক মাসের বেতন পান নাই! রস-সাগর প্রায় প্রত্যহই মহারাজের খাতাঞ্জী রামমোহন মজুমদারের নিকটে টাকার তাগাদা করিতে যান। নিরুপায় রামমোহন অগত্যা রস-সাগরকে "দিব, দিচ্চি" বলিয়া ও মিথ্যা আশ্বাস-বাক্য দিয়া সান্ত্বনা করিয়া রাখেন। একদিন তাগাদা করিতে গিয়া টাকা না পাওয়াতে রস-সাগর ক্রোধভরে স্বয়ং মহারাজের নিকটে গিয়া দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, "জলধর গর্জ্জে শুধু, নাহি বর্ষে জল!" ইহা শুনিয়া রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"জলধর গর্জ্জে শুধু, নাহি বর্ষে জল!"

(মেঘের প্রতি চাতকের উক্তি)

ওহে দেব জলধর! কর অবধান,
তোমাতেই প'ড়ে আছে চাতকের প্রাণ।
চাতকের একমাত্র তুমিই সহায়,
তোমা বিনা চাতকের না দেখি উপায়।
জীবের জীবন তুমি, তোমার জীবন
পান করিয়াই প্রাণ রাখে জীব-গণ।

আমি হে চাতক-পক্ষী ভূমিতলে পড়ি'
পিপাসায় ফাটে প্রাণ,—যাই গড়াগড়ি।
কত দিন রব আর তোমার আশায়
ছাতি ফাটিতেছে মোর জল-পিপাসায়।
তোমার মধুর ধ্বনি শুনিয়াই কাণে
পেট ভ'রে খাব জল,—আশা করি মনে।
মুখ খানি সার তব, কার্য্যে কিছু নাই,
আর তোমার মত দেখিতে না পাই।
অমর অখ্যাতি তুমি রাখিলে অমর!
জলদের নাম তুমি দিলে জলধর!
জলনিধি হ'তে ধূম করিয়া গ্রহণ
আকাশের উর্দ্ধদিকে কর বিচরণ।
পর-ধনে ধনী তুমি, তাই কি হে আজ
ইন্দ্র চন্দ্র আদি সনে করিছ বিরাজ!
ধার-করা জল তব ঢাল প্রাণ ভ'রে,
নচেৎ চাতক-পক্ষী প্রাণে আজ মরে।
চাতক-ঘাতক নাম তোমার হইবে,
বিশ্বাস-নাশক নাম তোমার রটিবে।
না কর করুণা যদি আশ্রিতের প্রতি,
ঈশ্বর তোমায় দিবে অশেষ দুর্গতি।
অতি শূন্যগর্ভ তুমি, লঘু অতিশয়,
উপরে লঘুর স্থিতি সকল সময়।
যখন পবন-দেব গগনে উঠিবে,
তোমায় উধাও করি' কোথা ল'য়ে যাবে।

জল যদি নাহি দাও, যাব আমি ম'রে.
দেখ দেব! বজ্রপাত নাহি দিও শিরে!
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল,—
'জলধর গর্জ্জে শুধু, নাহি বর্ষে জল!'

(৮৫)

কোন সময়ে রাজবাটীর কোন নেসাখোর কর্ম্মচারী রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "জাঙ্গাল ব'য়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি!' রস-সাগর প্রকারান্তরে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এইভাবে সমস্যা পূর্ণ করিলেন :—

সমস্যা—"জাঙ্গাল ব'য়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি।"

সখের প্রাণ, সদা খান গাঁজা কিংবা পাতি,
যে নেশাতে কিনতে চান্ নবাবের হাতী।
এক টানেতে অন্ধকার, দিনে জ্বালান্ বাতি,
'জাঙ্গাল ব'য়ে যান্ কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি!'

(৮৬)

একদা প্রশ্ন হইয়াছিল যে, "ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়্সী।" স-সাগর এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়্সী।"

ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলা শশী
জনক জননী কাশী-নিবাসী।
মায়ে না বিউল, বিউল মাসী,
'ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়্সী।'

[ব্যাখ্যা : কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইলেই দেবী ভগবতী তাঁহাকে শর-বনে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রের মহিষী কৃত্তিকা দেবী ভগবতীর ভগিনী। এই হেতু তিনি সদ্যোজাত শিশুটীকে নিজ পুত্র

বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ধ্যান-যোগে এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ছিলেন।]

(৮৭)

কৃষ্ণনগর-নিবাসী আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী কোন কবিরাজের সহিত রস-সাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিছুদিন পরে উভয়ের সাক্ষাৎ-কার হইলে রস-সাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ব্যবসায় কেমন চলিতেছে?" তখন কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "আমার ব্যবসায় বেশ চলিতেছে,—তবে 'টাকা কড়ি দিবার সময়'—ইহা বলিয়াই কবিরাজ মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। তখন রস-সাগর সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"টাকা কড়ি দিবার সময়।"

বৈদ্য বাবা হন্, রোগে চেপে ধরে যবে,
কিন্তু সেরে যায় যদি, মামা হন্ তবে।
তার পরে দাদা হন্, পথ্য যবে লয়,
শেষে শালা 'টাকা কড়ি দিবার সময়।' (১)

(৮৮)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র স্বীয় সভায় বসিয়া সকলেরই সম্মুখে বলিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! এখন আপনাকে একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব। কিন্তু তাহা যেন আমার ঠিক মনের মত হয়। যতক্ষণ ইহা আমার ঠিক মনের মত না হইবে, ততক্ষণ আপনাকে ইহা নূতন-

---

(১) নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতায় এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায় :—

আতুরে হি পিতা বৈদ্যঃ কিঞ্চিৎ সুস্থে তু মাতুলঃ।
পথ্যকালে ভবেদ্ ভ্রাতা দানে চ শালকো ভবেৎ॥

ভাবে পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। রস-সাগর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার অন্নদাতা; সুতরাং আপনার আদেশ আমার সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা শিরোধার্য্য।" মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "টুক্ টুক্ টুক্।" রস-সাগর সমস্যাটী ক্রমাগত পূরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন:—

সমস্যা—"টুক্ টুক্ টুক্"

১ম পূরণ।

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী,
পদভরে টল্-মল্, রসাতল ক্ষিতি॥
অধীর হইয়া হর পাতিলেন বুক্,
হর-হৃদি পাদ-পদ্ম 'টুক্ টুক্ টুক্।'

মহারাজ রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তি বুঝিবার জন্য বলিলেন, "ইহা ত আমার ঠিক মনের মত হইল না।" তখন রস-সাগর আর একটী কবিতা তৎক্ষণাৎ রচনা করিলেন:—

২য় পূরণ।

কৈলাসে করেন বাস সদা ভগবতী,
পৃথিবীতে আগমন,—তিন দিন স্থিতি।
যুদ্ধ কালে সুর-অরি পেতে দিলা বুক,
অসুরের স্কন্ধে পদ 'টুক্ টুক্ টুক্'।

রাজা তথাপি বলিলেন, "ইহা আমার ঠিক মনের মত হইল না।" রস-সাগর ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি পুনর্ব্বার একটী কবিতা তৎক্ষণাৎ রচনা করিলেন:—

৩য় পূরণ।

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণ-পদে
রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন তার অন্য নাই হৃদে।

নয়ন মুদিয়া দেখে,—সকলি কৌতুক,
হৃৎ-পদ্মে পাদ-পদ্ম 'টুক্ টুক্ টুক্'॥

মহারাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, "এখনও ইহা ঠিক মনের মত হইল না।" তখন রস-সাগর মহারাজের প্রকৃত মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর একটী রসময়ী কবিতা রচনা করিলেন :—

৪র্থ পূরণ।

পথি-মধ্যে দাঁড়াইয়া পরম-সুন্দরী,
ভুবন-মোহন রূপ,—যেন বিদ্যাধরী।
কমল জিনিয়া অঙ্গ, শশী জিনি' মুখ,
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা 'টুক্ টুক্ টুক্'॥ (১)

(৮৯)

একদিন একজন পাওনাদার রাজবাটীতে আসিয়া খাতাঞ্জীর নিকটে প্রাপ্য টাকার হিসাব করিতে আসিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ের রস শুকাইয়া যাওয়াতে তিনিও ঠিক সেই সময় খাতাঞ্জী বাবুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন সেই পাওনাদার রস-সাগর মহাশয়কে বলিলেন, "আপনিই কৃপা করিয়া আমার এই হিসাবটী পরিষ্কার করিয়া দিন। মুহুরী বাবুদের হিসাব-নিকাশে আমার তত বিশ্বাস নাই। তাঁহাদের ঠিক, ঠিক নহে।" পাওনাদারের এক জন সঙ্গীও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই সময় বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

(১) এ পূরণটী অত্যন্ত আদি-রসাত্মক বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না।—গ্রন্থকার

সমস্যা—"ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্"

অচল বিধির লিপি ন ন্যূন অধিক,
ত্রৈলোক্যে শিবেরো বাক্য ন গুরুর অধিক।
গুরু-ভক্তি-হীন জনে ধিক্ ধিক্ ধিক্,
এ তিন অন্যথা নহে 'ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।'

(৯০)

কোন সময়ে ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত একটী বাবু রস-সাগরকে একটী ইংরাজী-সমস্যা পূর্ণ করিতে দিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রস-সাগর তত দূর ইংরাজী জানিতেন না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "যদি আপনি ইংরাজী-সমস্যাটীর অর্থ বাঙ্গালা-ভাষায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিব।" ইহা শুনিয়া বাবুটী প্রশ্ন করিলেন, "ডিস্‌মিস্ ভাল নয়, ভাল রিজাইন।" ইহা বলিয়াই বাবুটী তাঁহাকে বাঙ্গালা-ভাষায় ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। রস-সাগর ইহা শ্রবণ করিয়াই এমন একটী গভীর-ভাব-সূচক কবিতা রচনা করিলেন যে, বাবুটী তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

সমস্যা—"ডিস্‌মিস্ ভাল নয়, ভাল রিজাইন।"

প্রাণাধিক পুত্র রাম, দশরথ পিতা,
মণি-কাঞ্চনের যোগ করেন বিধাতা।
হেন পুত্রে দশরথ বনে পাঠাইল,
পঞ্চ প্রাণ মধ্যে থাকি' সন্দেহ করিল।
কোন্ দিন জবাব্ দিবে দশরথ রাজা,
জবাবের মত নাই অন্য কিছু সাজা।

ইস্তফা দিইল সবে ভাবি সমীচীন,
'ডিস্‌মিস্ ভাল নয়, ভাল রিজাইন্।' (১)

[ব্যাখ্যা। 'প্রাণাধিক' রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া দশরথ প্রাণ-ত্যাগ করিলেন কেন, তাহাই কৌশল-ক্রমে এই কবিতায় নিরূপিত হইয়াছে। রামচন্দ্র, দশরথের 'প্রাণাধিক' পুত্র। যখন দশরথ স্বীয় পঞ্চপ্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র রামচন্দ্রকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তিনি যে পঞ্চ প্রাণকে সহজেই একদিন পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! এতদিন পঞ্চ প্রাণ দশরথের আশ্রয়ে কর্ম্ম করিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিলে তাহাদের অপমান হয়। এজন্য তাহারাই দশরথের মত অবিবেচক প্রভুর নিকটে কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বয়ং কর্ম্মে জবাব দিয়া চলিয়া গেল। ইহাই কবিতাটীর ফলিতার্থ।]

(৯১)

রস-সাগর, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের খাতাঞ্চী রাম-লোচনের নিকটে, বেতনের টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও তাহা না পাওয়ায় মহারাজের নিকটে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর!" ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনি এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলে আপনার বেতনের সমস্যা আমি এখনই পূরণ করিয়া দিব।" তখন রস-সাগর আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণের কথা খুলিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

---

(১) নিম্ন-লিখিত উদ্ভট-কবিতা হইতে এই ভাবটী উদ্ধৃত হইয়াছে :—

প্রাণাধিকে বনং যাতে সূর্য্যবংশ্যে গৃহমাগতে।
ত্যক্তো রাজা সুতত্যাগাদবিশ্বস্তৈরিবাসুভিঃ॥

সমস্যা—"ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর!"

শুন হে গিরীশ-চন্দ্র! কর অবধান,
দু'টানায় প'ড়ে মোর ফাটিছে পরাণ।
'রাজবাটী আসি' যবে চাই হে বেতন,
লোচন বাঁকায় রাম-লোচন তখন।
ভয়ে জুড়সড় হ'য়ে না পাই নিস্তার,
তোমার সম্মুখে আসি' করি হাহাকার।
গৃহেও নিস্তার নাই,—আমার দক্ষিণা
দক্ষিণাস্ত ক'রে দেয়,—না রাখে করুণা।
রিক্ত-হস্তে গৃহিণীর গৃহে প্রবেশিলে
গৃহীর কি কষ্ট,—জানে সবাই ভূতলে।
দক্ষিণার অভাবেই আমার দক্ষিণা
হতেছে মলিনা, পুনঃ অতিশয় ক্ষীণা।
এ রস-সাগর তাই করিয়াছে স্থির,—
'ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর!'

(৯২)

একদিন সন্ধ্যাকালে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত কলিকাতা-নগরীর সম্বন্ধে নানা খোস্ গল্প করিতেছিলেন। মহারাজ কলিকাতার অনেক প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু রস-সাগর ইহার অতিশয় নিন্দা করিতেছেন। তখন মহারাজ কহিলেন; রস-সাগর! আপনি যথার্থই বলিতেছেন,—"কলিকাতায় যতো বাবুদের 'টেঁকশেলে চাদোয়া'"। শুনিবামাত্র রস-সাগর এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ঢেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া"

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে গলি গলি,
দেড় টাকার এক ধুতি পরে খায় এক খিলি।
হাতে ছড়ী, মাথায় টেড়ী, গোঁপে ফুলেল তেল,
রুমালে আতর-গন্ধ, বুকের উপর বেল।
মুদির ভয়ে প্যাঁচা হ'য়ে কোটরে সারা দিন,
বুড়ো মড়া, নাই সাড়া, নিশিতে নবীন।
লেখা পড়ায় অষ্টরম্ভা, মুখে খুব দড়,
পণ্ডিতের কাছে কিন্তু ভয়ে জড় সড়।
শ্রীমতীর পদসেবা পরামার্থ মানে,
ইহা ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া কিছু নাহি জানে।
সুতানুটী, কলিকাতা, আর গোবিন্দপুর,
দিবানিশি উৎসবে আছে ভোরপুর।
কলিকাতায় বাবুভায়ার খাওয়া চাই হাওয়া,
ক্রিয়াকাণ্ড লণ্ডভণ্ড, যতেক বেহায়া।
ফুলের তোড়া, নষ্টের গোড়া, আড়-নয়নে চাওয়া,
আসল ঘরে মুষল নাই, 'ঢেঁকৃশেলে চাঁদোয়া'।

(৯৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "তথা বিদ্যমান।" এই প্রশ্ন করিয়াই তিনি বলিলেন, "আমাদের বংশীয় কোন লোকের সম্বন্ধে কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া আপনাকে এই সমস্যা পূর্ণ করিতে হইবে।" দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া রস-সাগর গঙ্গাগোবিন্দ ও শিবচন্দ্রের উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা এই সমস্যা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"তথা বিদ্যমান।"

ধন্য সে কায়স্থ-বংশ তুমি যার অবতংস
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি দেওয়ান গোবিন্দ!
তব মাতৃ-শ্রাদ্ধে আজ চন্দ্র সূর্য্য দেবরাজ
পবন-বরুণ-আদি করেন আনন্দ॥
এ মহা দান-সাগর দেখি' নর পায় ডর
হেন শ্রাদ্ধ দেখে নাই কেহই নয়নে।
কেবা তব সম বিজ্ঞ ঠিক যেন দক্ষ-যজ্ঞ
হইয়াছে দেখি আজ তোমার ভবনে॥
ওহে শিবচন্দ্র! তুমি গুণের আবাস-ভূমি
শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের তুমি সুযোগ্য সন্তান।
আমার এ মাতৃ-শ্রাদ্ধ দক্ষ-যজ্ঞ হ'তে হদ্দ
না ছিলা স্বয়ং শিব 'তথা বিদ্যমান॥'

প্রস্তাব। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে স্বীয় রাজ্যের রাজ-সনন্দ-প্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে গভর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রধান কর্ম্ম-সচিব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়েরই এ বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এজন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে সুপ্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে সিংহ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাইয়া তিনি শিবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিবচন্দ্র কহিলেন, "দেওয়ান বাহাদুর! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ ঠিক যেন দক্ষযজ্ঞ হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সিংহ মহাশয়

বিনীত-ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দক্ষযজ্ঞ অপেক্ষায় অধিক; কারণ সে যজ্ঞে স্বয়ং শিব আগমন করেন নাই!]

(৯৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একজন পরম-প্রিয় মোসাহেব রস-সাগরের প্রতি সর্ব্বদাই ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিত। একদিন এই তিন জনেই রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ স্বয়ং খলের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন রস-সাগর কহিলেন, "তবু খল কিছুতেই না হয় সরল।" ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"তবু খল কিছুতেই না হয় সরল!"

রস-সাগরের রঙ্ যদি হয় শাদা,
অমৃতের মত যদি মিষ্ট লাগে কাদা;
অশুচি মুচির লুচি যদি হয় শুচি,
শুক্‌নো গাছে জন্মে যদি পাতা কচি কচি;
আলো যদি ভাল লাগে প্যাঁচার নয়নে,
না করে চুরির চিন্তা চোর যদি মনে;
মাসী যদি মাতা হয়, মাতা হয় মাসী,
খাসি যদি পাঁটা হয়, পাঁটা হয় খাসি;
কাণ যদি চক্ষু হয়, চক্ষু হয় কাণ,
ঘ্রাণ যদি জিহ্বা হয়, জিহ্বা হয় ঘ্রাণ;
মুক্ত-হস্ত হয় যদি পরম কৃপণ,
ব্যাঙ্ যদি বশে আনে পদ্মিনীর মন;

দিনে যদি রাত্রি হয়, রাত্রি হয় দিন,
বৃদ্ধ-লোক যদি হয় বয়সে নবীন ;
গণ্ডূষ করিলে যদি সাগর শুকায়,
সাগরের জল যদি গোষ্পদে কুলায় ;
কালো যদি শাদা হয়, শাদা হয় কালো,
আলো যদি অন্ধকার, অন্ধকার আলো ;
আম্‌লা যদি মাম্‌লা-কালে নাহি লয় ঘুস্‌,
চাউল ফেলিয়া যদি লোকে চায় তুঁস্‌ ;
কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা হয় যদি,
শান্তভাবে ব'য়ে যায় যদি পদ্মানদী ;
অশ্বসম দ্রুতবেগে যদি যায় গাধা,
অসতীর চিত্তে যদি কেহ দেয় বাধা ;
মায়ের কাণের সোণা স্যাক্‌রা যদি ছাড়ে,
আহাম্মুখের বুদ্ধি কভু যদি বাড়ে ;
ভেক যদি সর্প খায়, করী খায় হরি,
অরি যদি মিত্র হয়, মিত্র হয় অরি ;
ভুলিয়াও মোসাহেব যদি সত্য কয়,
খোসামুদে কভু যদি ভদ্রলোক হয় ;
বায়ু-বেগে ট'লে পড়ে যদি হিমাচল,
'তবু খল কিছুতেই না হয় সরল !'

(৯৫)

একবার প্রসিদ্ধ গায়ক সাতুরায় রাজ-সভায় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন,—"তলব হ'য়েছে শ্যাম-চাঁদের দরবারে।" রস-সাগর তৎ-

ক্ষণাৎ এই সমস্যাটী গভীর-ভাব সহ পূরণ করিয়া, সাতুরায় ও সভাস্থ অন্যান্য সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন :—

সমস্যা—"তলব হ'য়েছে শ্যাম-চাঁদের দরবারে।"

করী, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর
পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর।
দূতী গিয়া এ কথা জানায় শ্রীরাধারে,
'তলব হ'য়েছে শ্যাম-চাঁদের দরবারে।'

[ব্যাখ্যা। কয়েকটী ফরিয়াদী একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিল, "আপনার শ্রীমতী রাধিকা আমাদের সকলেরই এক একটী বস্তু অপহরণ করিয়া তাহা উপভোগ করিতেছেন। অতএব আপনি এখন কৃপা করিয়া বিচার করুন।" এই সকল ফরিয়াদীর মধ্যে করী, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর ও পিক সর্ব্ব-প্রধান। ইহাদের অভিযোগের কারণ এই :—রাধিকা করীর (হস্তীর) কুম্ভ, হরির (সিংহের) কটিদেশ, হরিণীর (হরিণ-পত্নীর) নয়ন, মরালের (রাজহংসের) গমন, সুধাকরের (চন্দ্রের) সুধা ও পিকের (কোকিলের) ধ্বনি চুরি করিয়াছেন। ইহার ফলিতার্থ এই :—রাধিকার স্তন হস্তীর কুম্ভের মত, কটিদেশ সিংহের কটি-দেশের মত, নয়ন হরিণীর মত, গমন রাজহংসের মত, বাক্য চন্দ্রের সুধার মত এবং কণ্ঠস্বর কোকিলের মত।]

(৯৬)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একজন ভৃত্য ছিল। সে প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদাই আলস্য ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিত। একদিন মহারাজ বলিলেন, "তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর!" রস-সাগর মহারাজের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর!"

ডাকিলে পোড়ার মুখে কথা নাহি সরে,
বেমালুম্ চুরি করে চক্ষের উপরে।
কোথাও যাইতে হ'লে খোঁড়া হ'য়ে যায়
মিথ্যা কথা রহিয়াছে জিবের ডগায়।
ঘুম দেখে কুম্ভকর্ণ হয়েন অবাক্,
খোরাক্ সহজ নয়,—হাতীর খোরাক।
শূকরের মত ঠিক আহার তাহার,
কত যে তাহার গুণ,—কি কহিব আর!
কত পুণ্য করিয়াছি জন্ম-জন্মান্তর,
'তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর!'

(৯৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র, রস-সাগর ও স্বীয় কয়েকটী বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী বৃদ্ধাকে যষ্টি-হস্তে যাইতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাই, বুড়ি নড়ি ধ'রে গুড়ি মেরে যায়।" রস-সাগরের রস শুষ্ক হইবার নহে। তিনি যুবরাজের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তাই বুড়ি নড়ি ধ'রে গুড়ি মেরে যায়।"

রূপসী নারীর যদি রহিল যৌবন,
তার চেয়ে নাহি তার গৌরবের ধন।
যৌবন অমূল্য নিধি হারাইু এখন,
কোথা গেলে পাব আমি তার অন্বেষণ!

ইহা ভাবি' যত্ন তার খুঁজিতে তাহায়,
'তাই বুড়ি নড়ি ধ'রে গুড়ি মেরে যায়।'

(৯৮)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনি আদি-রসে আমার এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিন,—'তারে শাপ দিই মোরা ব্যাকুল হইয়া!'" মদনের প্রতি বিরহিণীর উক্তি দিয়া রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তারে শাপ দিই মোরা ব্যাকুল হইয়া!"

রে মদন! শোন্ তুই করি' প্রণিধান,—
করুক পঞ্চত্ব লাভ তোর পঞ্চবাণ।
নিষ্ঠুর ধনুক খানা ভেঙে হোক্ শেষ,
সর্পমুখে রথ খানা করুক প্রবেশ।
হর-নেত্রানলে তুই পুড়ে হ'লি ছাই,
অঙ্গ যেন নাহি হয়,—এই মোরা চাই।
বধ ক'রেছিস্ তুই বিরহিণী-জনে,
তোরে শাপ দিতে ইচ্ছা নাহি হয় মনে।
যে ব্রহ্মা স্বজিল তোরে দীর্ঘায়ুঃ করিয়া,
'তারে শাপ দিই মোরা ব্যাকুল হইয়া।'

(৯৯)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে লইয়া প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিপার্শ্বে একটী তালবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাল-তরু নিজ তাপ নাশিতে না পারে।" রস-সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তাল-তরু নিজ তাপ নাশিতে না পারে।"

বরং স্যাওড়া গাছ ধন্য এ সংসারে,
ক্ষুদ্র হইলেও সবে উপকার করে।
আছে একমাত্র ধন ছায়াটী তাহার,
তাও দিয়া হরে তাপ তাপিত জনার।
অতি উচ্চ হইলেও থাকিয়া সংসারে
'তাল-তরু নিজ তাপ নাশিতে না পারে!'

সন ১২৩০ সালে বাঙ্গালা-প্রদেশে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে অদ্যাপি লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই বন্যার সময়ে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বয়ঃক্রম ৩৭ বৎসর এবং রস-সাগরের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর। বন্যার কয়েক বৎসর পরে মহারাজ সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অন্যান্য সভাসদ্-বর্গের সহিত বন্যা-সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। রস-সাগর মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়।" ইহা শুনিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনাকেই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" মহারাজের আদেশে রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়!"

বার-শ তিরিশ সাল খ্যাত বাঙ্গালায়,
এ সালের বন্যা শুনি' প্রাণ ফেটে যায়।
দেখিতে দেখিতে জল হইল উন্নত,
দেখা গেল চারি দিক্ সাগরের মত।
কিবা মেটে বাড়ী, আর কিবা পাকা বাড়ী,
যাইতে লাগিল জলে পড়ি' গড়াগড়ি।

বাড়িতে লাগিল জল নীচু দিকে যত,
উপরে মুষল-ধারে বৃষ্টি হ'লো তত।
গাছ পালা চাল চুলো যাহা যার ছিল,
প্রবল জলের স্রোতে ভাসিয়া চলিল।
পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু আর,—
কেহই না রাখে হায় কারো সমাচার!
প্রাণ-ভয়ে ছেলে ফেলে পোয়াতি পলায়,
বোধ হ'লো বর্গী এলো যেন বাঙ্গালায়।
এক ঘর থেকে যেতে হ'লে অন্য ঘরে,
মান্দারে যাইতে হয়, কিংবা নৌকা ক'রে।
পথ ঘাট বন্ধ হ'লো দোকান পসারি,
হাহারব শুনি শুধু মুখে সকলেরি।
কিবা বড় লোক, কিবা ছোট লোক আর,
সবাকার এক দশা,—মুখে হাহাকার!
আট দশ দিন কারো অন্ন নাই পেটে,
যে যা পায় তাই খায়,—যা জোটে নিকটে।
ক্ষুধার জ্বালায় ঘাস চিবাইয়া খায়,
মরিতে লাগিল লোক পেটের পীড়ায়।
পাখী সাপ ব'সে আছে একই শাখায়,
'তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়!'

(১০১)

একদিন রাজ-সভায় কোন লোক সমস্যা দিলেন, "তোমেই সর্ব্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ!" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—তুমিই সর্ব্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ!”

এই ত্রিভুবনে হরি! তুমিই বিধাতা,
তুমিই আমার পিতা, তুমি মোর মাতা।
তুমি মোর পুত্র মিত্র আত্মীয় সোদর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি নিরন্তর।
তুমি মোর বিদ্যা বুদ্ধি, তুমি মোর ধন,
‘তুমিই সর্ব্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ।’

(১০২)

একদিন কোন পণ্ডিত রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—“তুমি কার, কে তোমার, মর কার তরে!” রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—“তুমি কার, কে তোমার, মর কার তরে!”

নিবেদন করি আমি, ওরে মূঢ় নর!
যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি নশ্বর।
কোথা রবে গাড়ী যুড়ী, কোথা ঘর বাড়ী
কিছুদিন পরে সব যাবে গড়াগড়ি।
শুইয়া সোণার খাটে কর কত ঠাট্,
ঘাটে গে’লে হায় কোথা রবে সেই খাট!
যে মুখে খাইতে সুখে সন্দেশ মিঠাই
দারা পুত্র কন্যা সেই মুখে দিবে ছাই।
কোথা গেলে টাকা পাব,—ভাবিয়া বিরলে
দিবানিশি ঘুরিতেছ এই ভূমণ্ডলে।
জুয়াচুরি বাটপাড়ি করিয়া নিয়ত
ঘুরে মর নাক-ফোঁড়া বলদের মত।

অপরে ঠকাতে গিয়া নিজেই ঠকিলে,
ভাবিলে না একবার বসিয়া বিরলে।
ওরে জীব! পূজ শিব,—বিলম্ব না সয়,
এখনি আসিয়া কাল করিবে প্রলয়।
এ রস-সাগর কয় পড়িয়া ফাঁপড়ে,—
'তুমি কার কে তোমার, মর কার তরে!'

(১০৩)

একদা রাজ-সভায় রামায়ণের সম্বন্ধে নানা গল্প হইতেছিল। তখন একজন বলিয়া উঠিলেন, "তৈল থাকিতেও দীপ গেল নিবাইয়ে।" মহারাজ ইঙ্গিত করিবামাত্র রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"তৈল থাকিতেও দীপ গেল নিবাইয়ে।"
কৈকেয়ী-বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে
মনস্তাপে ব্রহ্ম-শাপে জর্জ্জরিত হয়ে
দশরথ অযুত বৎসর আয়ুঃ পেয়ে
'তৈল থাকিতেও দীপ গেল নিবাইয়ে।'

(১০৪)

একদিন সমস্যা উঠিয়া ছিল,—"তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর!"
ধনহীন কর মোরে, কিংবা ধনবান্,
প্রদান করহ মান, কিংবা অপমান;
বৈকুণ্ঠে বসতি কিংবা নরকে বসতি,
যা ইচ্ছা করাও মোরে, নাহি তায় ক্ষতি!

ভক্তি যেন থাকে, হরি! তোমার চরণে,
এই ভিক্ষা চাহিবার সাধ আছে মনে।
তোমার চরণে ভক্তি একমাত্র সার,
'তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর!'

(১০৫)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "থোতা মুখ ভোতা হ'য়ে গেল। রস-সাগরও ইহা তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"থোতা মুখ ভোতা হ'য়ে গেল।"

কাটোয়ায় গড়িয়ায় সমর বাধিল,
কাশিম হারিল তাহে, ইংরাজ জিতিল।
উদয়-নালায় পুনঃ এক যুদ্ধ হয়,
ইহাতেও কাশিমের হ'ল পরাজয়।
ইংরাজের বাহুবল বুদ্ধিবল যত,
মীর-কাশিমের বল নাহি ছিল তত।
নবাবের সেনাপতি গর্গিণে কৌশলে
ভ্যান্সিটার্ট আনিলেন ইংরাজের দলে।
মহামতি ইংরাজের সমর-কৌশল
কিছুতে বুঝিতে নারে এই ভূমণ্ডল।
কাশিমের বিদ্যাবুদ্ধি সব ফুরাইল,
নবাবের "থোতা মুখ ভোতা হ'য়ে গেল।'

[প্রস্তাব। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ জুলাই ও ২ আগষ্ট যথাক্রমে কাটোয়া ও গড়িয়া নামক স্থানে এবং কিছু দিন পরে উদয়-নালায় মীর-কাশিমের সহিত ইংরাজদিগের তিনটি যুদ্ধ হয়। এই তিনটী যুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করেন। স্বীয় পরাজয়-সংবাদ শুনিয়া

মীর-কশিম অক্টোবর মাসে মুঙ্গেরে প্রস্থান্ করেন। ইংরাজ-সৈণ-গণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। মীর-কাশিম গর্গিণ-নামক এক্ জন রণ-কুশল সেনানীকে স্বীয় সেনাপতি করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভ্যান্সিটার্ট্ সাহেব তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া গর্গিণকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। এই হেতুই মীর-কাশিমের পরাজয় ঘটে।" (১)

(১০৬)

কৃষ্ণনগর-রাজবাটীর প্রসিদ্ধ দেওয়ান সুরসিক স্বর্গত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় একদিন রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দেন :—"দক্ষিণা করিল দান গুরুগৃহে গিয়া!" রস-সাগর, দেওয়ান মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"দক্ষিণা করিল দান গুরুগৃহে গিয়া!"

মদন-অনল যদি জ্বলে একবার,
হৃদয়-কুটীর খানি করে ছারখার!
ভাল মন্দ জ্ঞান আর না রহে তখন,
তোমার অনন্ত লীলা, শুন রে মদন!
কত রম্য নারী স্বর্গে করেন বিরাজ,
সেই সবে পরিহরি' কিন্তু দেবরাজ
গুরুপত্নী অহল্যায় প্রাণ সঁপে দিয়া
'দক্ষিণা করিল দান গুরুগৃহে গিয়া!"

(১০৭)

একদিন রস-সাগরের কোন বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, "দণ্ড-ভয়ে দণ্ডধর

(1) History of Bengal by J. Marshman. P. 19

দণ্ডবৎ করে।” রস-সাগর এইভাবে তখনই তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—“দণ্ড-ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।”

মৃত্যু-কালে পড়িয়া পাতকী খাবি খায়,
সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্মরায়।
আকার-ইঙ্গিতে ভাষে,—হেন লয় চিত্তে,
শি-কার, বি-কার কিংবা ব্র-কারের দ্বিত্বে
যদি ব্যক্তি করে উক্তি, কার শক্তি ধরে,
‘দণ্ড-ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।’

[ব্যাখ্যা। শি-কার অর্থাৎ শিব, বি-কার অর্থাৎ বিষ্ণু এবং ব্র-কার অর্থাৎ ব্রহ্মা,—এই তিনটী নামের দ্বিত্ব করিলে অর্থাৎ প্রত্যেক নামটী দুইবার উচ্চারণ করিলে দণ্ডধর (যম) দণ্ডভয়ে (শাস্তি পাইবার ভয়ে) দণ্ডবৎ (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম) করিয়া থাকে।

(১০৮)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বিষম আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হওয়ায় রস-সাগর কয়েক মাসের বেতন প্রাপ্ত হন নাই। এই হেতু তিনি একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের নিকটে দুঃখ জানাইয়া পরিশেষে পরিহাস-চ্ছলে কহিলেন, “মহারাজ! আমার সংসারে যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয় যে, কোন্ দিন বা ব্রাহ্মণী এই অধম ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।” ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, “দরিদ্র পতিকে পত্নী কে’লে চ’লে যায়।” রস-সাগরও ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"দরিদ্র পতিকে পত্নী ফে'লে চ'লে যায়।"

ভস্মরাশি অঙ্গে মাখে দেব দিগম্বর,
শ্মশানে ভূতের সঙ্গে ঘুরে নিরন্তর।
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গী দু'টী, পিছে পিছে আনে,
একমাত্র গরু,—সেটা লাঙ্গল না টানে।
ফোঁস্ ফোঁস্ করে সর্প অঙ্গে অনুক্ষণ,
সিদ্ধি খে'য়ে বুদ্ধি টুকু মোটা বিলক্ষণ।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পেটের জ্বালায়,
বয়সের কথা তার বলা নাহি যায়।
কেবা পিতা, কেবা মাতা, জন্ম কোন্ কালে,
বলিতে না পারে কেহ এই ভূমণ্ডলে।
থাকিলে পতির ধন পত্নী পায় সুখ,
নচেৎ তাহার প্রতি বিষম বিমুখ।
তাই গঙ্গা মনোঃদুখে থাকি' নিরন্তর
শিবেরে ছাড়িয়া শেষে ভজে রত্নাকর।
সংসারে অর্থই এক পরমার্থ হায়,
'দরিদ্র পতিরে পত্নী ফে'লে চ'লে যায়।'

(১০৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের কোন বন্ধু রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"দালান চুরির কথা কে শুনেছে কাণে।" রস-সাগর একটী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সমস্যাটী এই-রূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"দালান চুরির কথা কে শুনেছে কাণে!"

মহারাজ চেৎসিংহ কাশীধামে ছিল,
হেষ্টিংসের সনে তাঁর বিবাদ বাঁধিল।
কান্ত বাবু মধ্যে থাকি' মজা লুটে নিল,
কত মহামূল্য ধন বাটীতে আনিল।
লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা আজি বিদ্যমান,
প্রস্তর-নির্ম্মিত এক সুন্দর দালান।
হ'য়েছে পুকুর চুরি,—তাও লোকে মানে,
'দালান চুরির কথা কে শুনেছে কাণে!'

(১১০)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ও পরিহাস-রসিক ছিলেন। কোন বন্ধুর শয়ন-কক্ষে রাত্রিকালে গাঁটা দিবার জন্য তিনি এক স্বীয় প্রিয় বিশ্বাসী বয়স্যকে পাঠাইয়া দেন। তিনি মহারাজের আদেশ পালন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে মহারাজের নিকটে সকল কথাই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। যখন অপরাহ্ণে সেই বন্ধুটী মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন মহারাজ তাঁহার সম্মুখে রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "দিতে হয় দিবার নয়, দিই কি না দি।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছয়টী কবিতা রচনা করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি।"

১ম পূরণ।

রামকে আনিতে এল বিশ্বামিত্র মুনি,
শুনি রাজা দশরথ লোটায় ধরণী।

না দিলে শাপয়ে মুনি,—এখন করি কি?
'দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি।'

২য় পূরণ।

শ্রীরাম হবেন রাজা, সীতা হবেন রাণী,
বনে যাইবেন রাম, স্বপনে না জানি।
রাম সীতা বনে দিয়া প্রাণে কিসে রই,
'দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি॥"

৩য় পূরণ।

ভীম বলে কীচকেরে শাস্তি দিতে পারি,
অজ্ঞাত হইবে জ্ঞাত, এই ভয় করি।
না দিলে ছাড়িবে প্রাণ পঞ্চালের ঝি,
'দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি।"

৪র্থ পূরণ।

যখন হেমন্ত কন্যা করেছিল দান,
ডাক দিয়া আনিলেন যত এয়োগণ।
জয়া ও বিজয়া আর চন্দ্রমুখী হীরে,—
সকলেই আসিলেন এয়ো হইবারে।
চরণে আল্‌তা দিতে নাপিতের ঝি,
'দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি।"

৫ম পূরণ।

কৃষ্ণচন্দ্রে নিতে এল সে অক্রূর মুনি,
ভাবিতে লাগিলা নন্দ সেই কথা শুনি।

না দিলে রুষিবে কংস, ইথে করি কি,
"দিতে হয় দিবার নয়, দিই কি না দি!" (১)

(১১১)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের এক বৈবাহিক সভায় বসিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন,—"দিনে রেতে কামান্ধ না দেখিবারে পায়।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"দিনে রেতে কামান্ধ না দেখিবারে পায়!"

প্যাঁচা না দেখিতে পায় দিবসের কালে,
কাক না দেখিতে পায় রাত্রিকাল হ'লে।
এ এক অপূর্ব্ব কাণ্ড বুঝে উঠা দায়,
"দিনে রেতে কামান্ধ না দেখিবারে পায়!

(১১২)

পঞ্চকোটের রাজবাটীতে এক সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা কোন কার্য্যের উপলক্ষে তাঁহাকে কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে আসিতে হইয়াছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রস-সাগর-নামক এক উপস্থিত কবি আছেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে ভাবিলেন যে, রস-সাগর মহাশয় এক চরণ বলিয়া দিলেই অবশিষ্ট অংশ মনের মত করিয়া পূর্ণ করেন; কিন্তু আমি তাহা না করিয়া একটী প্রহেলিকা রচনা করিয়া লইয়া যাই; ইহার উত্তর তাঁহাকেই দিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি নিম্ন-লিখিত প্রহেলিকা স্বয়ং রচনা করিয়া লইয়া গেলেন :—

(১) ৬ষ্ঠ পূরণ অত্যন্ত আদিরসাত্মক বলিয়া উদ্ধৃত হইল না।—গ্রন্থকার

সমস্যা—"দ্বিভুজা রমণী, তার দশ-ভুজ পতি,
পঞ্চ-মুখ পতি, কিন্তু নন্ পশুপতি।
অপুত্রক পতি-পিতা,—অপূর্ব্ব কাহিনী।"

রস-সাগরকে এই তিন চরণে রচিত প্রহেলিকা দিবা মাত্র তিনি নিম্ন-লিখিত চতুর্থ চরণে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন :—

এ রস-সাগরে ভাসে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥

[ব্যাখ্যা। দ্বিভুজা রমণী=দ্রৌপদী। দশ-ভুজ পতি=দশ-হস্ত-বিশিষ্ট যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপতি। পঞ্চ-মুখ পতি, কিন্তু নন্ পশুপতি=পঞ্চানন অর্থাৎ শিব নহেন, কিন্তু পঞ্চপতির পঞ্চমুখ। অপুত্রক পতি-পিতা=পাণ্ডু অপুত্রক। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব পাণ্ডুর ঔরস-পুত্র না হইলেও পাণ্ডু তাঁহাদের পিতা।]

(১১৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের দুইটী গৃহিণী ছিলেন। একই সংসারে দুইটী গৃহিণী এক সঙ্গে থাকিলে পুরুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য মহারাজ রস-সাগরকে আদেশ করেন, এবং এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দেন,—"দুইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।" রস-সাগর মহাশয়ও স্বীয় রসের ভাণ্ডার খুলিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"দুইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।"
থাকিলে বিড়াল এক গর্ত্তের বাহিরে,
থাকে যদি সর্প এক গর্ত্তের ভিতরে,
তাহাদের মধ্যে এক ইন্দুর থাকিলে
যেরূপ দুর্গতি তার হয় সেই কালে,

সেরূপ দুর্গতি সেই পুরুষের হয়,
'দুইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।' (১)

(১১৪)

কলিকাতার অন্তর্গত সিমলা-নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রসিদ্ধ 'কবিওয়ালা' ছিলেন। তাঁহার একটী চক্ষু ছিল না বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'ল'কে কাণা' বলিয়া ডাকিত। তিনি প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই কৃষ্ণনগরে বারোয়ারী-তলায় কবি-গান করিতে যাইতেন এবং বাটীতে আসিবার সময় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া আসিতেন। মহারাজের সভায় রস-সাগরের সহিত দেখা হইলেই বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার সহিত বাগ্-যুদ্ধ করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত কহিলেন, "মহারাজ! এইবারে আরও ভাল ভাল গায়ক ও বাঁধনদার আনিয়া আমার কবির দল পরিপুষ্ট করিব। রস-সাগর নিকটে বসিয়া এই সব কথা শুনিতে ছিলেন। তিনি কহি-লেন, "দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর!" তখন গিরীশ-চন্দ্র, রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলায় তিনি ইহা লক্ষ্মীকান্তের সম্মুখেই পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর!"

(লক্ষ্মীকান্ত কবি-ওয়ালার প্রতি রস-সাগরের উক্তি)

মল-মূত্র-ত্যাগে প্রাতঃকাল নষ্ট হয়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নষ্ট মধ্যাহ্ন-সময়।

---

(১) নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের ভাব লইয়াই, বোধ হয়, রস-সাগর মহাশয় এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন :—

"বিলাদ্ বহির্বিলস্তান্তঃ স্থিতমার্জ্জারসর্পয়োঃ।
আখুমধ্য ইবাপ্নোতি দ্বিভার্য্যো দুর্ব্বলো নরঃ॥"

মৎপ্রণীত উদ্ভট-সাগরঃ" (তৃতীয়ঃ প্রবাহঃ) ২৮৮ শ্লোকঃ।

মিথ্যা গল্প নৃত্য গীত ভ্রমণ করিতে
সন্ধ্যাকাল কেটে যায় দেখিতে দেখিতে।
নিদ্রা গিয়া কিংবা আর বিহার করিয়া
রাত্রিকাল নষ্ট হয়, দেখ রে ভাবিয়া!
কবির লড়ায়ে তোর্ বড়ই উল্লাস,
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, শোন্ রে বিশ্বাস!
শ্বাস কাস কণ্ঠরোধ করিবে যখন
তার প্রতীকার তুই কর্ রে এখন।
দলাদলি গালাগালি আছে তোর জানা,
উপদেশ দিই তোরে, শোন্ ল'কে কাণা!
শ্যামা-মার পদে মন করিয়া অর্পণ
মনের ময়লা যত কর প্রক্ষালন।
বিফলে সময় গেল, কি হইবে তোর,
'দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর!'

(১১৫)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই প্রবাদ-বিরুদ্ধ সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"দেখিলে কলুর মুখ কার্য্য-সিদ্ধি হয়!" তখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"দেখিলে কলুর মুখ কার্য্য-সিদ্ধি হয়!"

ইংরাজের কুঠী ছিল কাশীম-বাজারে,
যাইতেন তথা কান্ত প্রতিদিন ভোরে
বাটীর নিকটে ছিল কলু এক জন,
করিতেন তার মুখ দেখিয়া গমন।

যে দিন তাহার মুখ দেখে যাইতেন,
সেই দিন বিলক্ষণ ঘরে আনিতেন।
কলুর ঘানির শব্দ শুনিয়াও কাণে
কান্তের ব্যাঘাত কভু না হ'ত স্বপনে।
এ রস-সাগর এই কলিকালে কয়,
'দেখিলে কলুর মুখ কার্য্য-সিদ্ধি হয়!' (১)

(১১৬)

কোন লোক কোন সময়ে রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "দেশের হবে কি?" তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই রস-সাগর মহাশয় এই কবিতাটী রচনা করিয়া ছিলেনঃ—

(১) মদীয় পরম বন্ধু, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় তাঁহার প্রণীত "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী"-নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ লইয়া নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবটী লিখিত হইল:—

[প্রস্তাব। কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের একটী রেশমের কুঠী ছিল। কান্ত বাবু স্থানে সামান্ত বেতনে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অধীনতায় মুহুরীর কার্য্য করিতেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে তিনি কর্ম্মস্থলে যাইতেন। তাঁহার বাটীর নিকটে একটী কলুর দোকান ছিল। যে দিন তিনি কলুর মুখ দেখিয়া যাইতেন, সেই দিনই তিনি বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। প্রচুর ধনাঢ্য হইয়াও কান্ত-বাবু তাঁহাকে নিজ বাটীর নিকটে রাখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশপূজ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ও প্রাতঃস্মরণীয়া দানশৌণ্ডা রাণী ভবানীর নিকট হইতে 'লাট বাহারবন্দ' পরগণার জমীদারী গ্রহণ এবং উক্ত ফাঁসির পরে স্তার ইলায়িজা ইম্পে সাহেবকে অভিনন্দন-পত্র-দানের সময়ে তাহাতে স্বাক্ষর করা,—এই কয়েকটী কার্য্যে কান্ত-বাবু বিশেষ-রূপে লিপ্ত থাকিলেও কান্ত-বাবুর দয়া, ধর্ম্ম ও সদ্বিবেচনা যথেষ্ট ছিল; এই হেতুই ভগবান্ তাঁহাকে এত উচ্চপদোন্নত ও অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন।]

সমস্যা—"দেশের হবে কি?"

শূদ্র হ'য়ে বেদ পড়ে, বামুন হ'ল ভেকো,
ছত্রিশ বর্ণ এক হ'লো,—তার সাক্ষী হুঁকো।
শ্বশুর হয়ে পুত্র-বধূ, বাপে হয়ে ঝি,
ইহা দেখে পাখী বলে 'দেশের হবে কি?'

(১১৭)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "ধন্য ধন্য ধন্য সেই রাধিকা সুন্দরী!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ধন্য ধন্য ধন্য সেই রাধিকা সুন্দরী!"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ধন্য বিশাল ধরণী,
মথুরা তাহার মধ্যে ধন্য বলি' গণি।
মথুরা হইতে ধন্য রম্য বৃন্দাবন,
তার মধ্যে ধন্য সেই ব্রজবাসী জন।
তার মধ্যে ধন্য যত গোপিকা যুবতী,
তার মধ্যে ধন্য সেই রাধিকা শ্রীমতী,
রূপে গুণে নাহি দেখি তাঁর মত নারী,
'ধন্য ধন্য ধন্য সেই রাধিকা সুন্দরী!'

(১১৮*)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র পরম সাধক ছিলেন। দেব-দেবীর পূজা লইয়াই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় একদিন রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "ধন্য মা কিরীটেশ্বরি! মহিমা তোমার!" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, কোন ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া আপনাকে ইহা পূরণ করিতে

হইবে। রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ধন্য মা কিরীটেশ্বরি! মহিমা তোমার!"

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি হে নন্দ-কুমার!
কত শক্তি ছিল তব,—বুঝে উঠা ভার।
মীর-জাফরের তুমি নয়নের মণি,
মণি-বেগমের তুমি আদরের খনি।
তোমারি উপর ছিল তাঁদের বিশ্বাস,
তোমারি আদেশে তাঁরা ফেলিত নিশ্বাস!
নবাব সাহেব তাঁর অন্তিম দশায়
কাতর হইলা যবে ঘোর পিপাসায়,
তখন রাখিয়া দিয়া তোমারি সম্মান
দেবীর চরণামৃত করিলেন পান।
ধন্য ধন্য শক্তি তব হে নন্দ-কুমার!
'ধন্য মা কিরীটেশ্বরি! মহিমা তোমার!'

(১১৯)

গ্রীষ্মকালে একদিন সন্ধ্যার পরে রস-সাগর যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের গৃহে বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "ধন্য হে 'জলদ' তুমি! ধিক্ 'জলনিধি'!" রস-সাগর শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ধন্য হে 'জলদ' তুমি, ধিক্ 'জলনিধি'!"

দরিদ্রও যদি হয় নির্ম্মল-হৃদয়,
পর-উপকার তবু করিবে নিশ্চয়।

সমল-হৃদয় কিন্তু যদি হয় ধনী,
পর-উপকারে মন না দেয় কখনি।
'জলদ' লইয়া জল 'জলনিধি' হ'তে
বিধিমতে ঢালে জল এই পৃথিবীতে।
'জলনিধি' নামে দিই ধিক্ শতবার,
পৃথিবীতে নাহি পড়ে বিন্দুমাত্র তার।
এ রস-সাগর তাই কহে যথাবিধি,—
'ধন্য হে 'জলদ' তুমি! ধিক্ 'জলনিধি'!'

(১২০)

একদা প্রশ্ন হইল, "ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই।" রস-সাগর দণ্ডিপর্ব্বের ঘটনা-অবলম্বন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই।"

স্থর-পুরী শূন্য করি কৃষ্ণ-আজ্ঞা শিরে ধরি,
ব্রহ্মা-আদি যত দেবগণ।
দণ্ডী নৃপ দণ্ডে দণ্ডী, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,
অবনীতে উপনীত হন॥
উর্ব্বশীর শাপ খণ্ড, দণ্ডী নৃপতির দণ্ড,
অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্য এত হ'ল, 'ধরাতল স্বর্গ-স্থল,
কিছুমাত্র ভেদ তার নাই॥'

[প্রস্তাব। উর্ব্বশী শাপগ্রস্তা হইয়া অশ্বিনীর রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে অষ্ট বজ্র একত্র হইলেই তাঁহার শাপ-বিমোচন হইবে। রাজা দণ্ডী অশ্বিনীকে

প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন, রাজা দণ্ডী এরূপ এক অপূর্ব্ব অশ্বিনী পাইয়াছেন যে, সে রাত্রিকালে মনোহারিণী রমণীর মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া রাজা দণ্ডীর সেবা করিয়া থাকে, এবং দিবাভাগে অশ্বপত্নী হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বিনীকে প্রার্থনা করিয়া রাজা দণ্ডীর নিকটে দূত প্রেরণ করেন। দণ্ডী তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। দণ্ডিরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে স্বীয় অশ্বিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনেক রাজার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে আশ্রয়-দান করিতে স্বীকার করিলেন না। পরিশেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া পঞ্চ-পাণ্ডবের শরণাগত হইলেন। ভীম ভিন্ন অন্য চারি ভ্রাতা মহাসঙ্কটে পড়িলেন। ভীম স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "বিপন্ন ব্যক্তি শরণাপন্ন হইলে তাহাকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।" ইহা বলিয়া ভীম তাঁহাকে আশ্রয়-দান করিলেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে দেবতা-গণ রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে যমের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ইত্যাদি একত্র হইবামাত্র উর্ব্বশীর শাপ-বিমোচন হইয়া গেল।]

(১২১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। দিবানিশ পূজা লইয়াই তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন প্রাতঃকালে পূজা সম্পন্ন করিয়া রাজসভায় আসিয়া দেখিলেন, রস-সাগর মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ধর্ম্ম সম সার বস্তু কি আছে কোথায়!" রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ধর্ম্ম সম সার বস্তু কি আছে কোথায়?"

কিবা ইহলোক, কিবা পরলোকে ধার
ধর্ম্ম সম সার বস্তু খুঁজে মিলা ভার।
ধর্ম্মই প্রকৃত সূর্য্য ঘোর অন্ধকারে,
ধর্ম্মই বিপদ্ হ'তে রক্ষা করে নরে।
এ তুচ্ছ সংসারে ধর্ম্ম অমূল্য রতন,
ধর্ম্ম তার বন্ধু, যার নাই বন্ধু জন।
ধর্ম্মই সহায় সেই অন্তিম দশায়,
'ধর্ম্ম সম সার বস্তু কি আছে কোথায়?'

(১২২)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "ধান ভান্তে মহীপালের গীত।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ধান ভান্তে মহীপালের গীত।"

অম্বিকা কালনায় ভাই চিত্ত চমকিত,
'মরা মানুষ জিয়ে এসে করে রাজনীত।
পরাণে সহে না আর এত বিপরীত,
খেতে শুতে 'ধান ভান্তে মহীপালের গীত।' (১)

(১২৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় প্রশ্ন হইল, "ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ রবে।" রস-সাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

(১) বর্দ্ধমান-রাজ জাল প্রতাপচাঁদের বিষয় লইয়াই এই কবিতাটী রচিত হইয়াছে।

সমস্যা—"ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ রবে।"

কৃষ্ণলীলা শুনি' যার মন নাহি মজে,
রাধা প্রেম শুনি' যার হৃদয় না ভিজে;
শুনি' ব্রজ-গোপিকার রসময়ী কেলি
না হয় যাদের মন কভু কুতূহলী,
মৃদঙ্গ কীর্ত্তন-কালে জানাইছে সবে;—
'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ রবে।' (১)

(১২৪)

এক সময়ে কোন লোক সমস্যা দিয়াছিলেন, "ধিন্ তা ধিনা, পাকা নোনা।" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া ছিলেন:—

সমস্যা—"ধিন্ তা ধিনা, পাকা নোনা।"

চৈত্রে শিবের আরাধনা,
জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেঁকির মোনা।
ছোলা কলা গুড় পানা,
'ধিন্ তা ধিনা, পাকা নোনা।'

(১২৫)

প্রসিদ্ধ গায়ক নিধু-বাবুর (রামনিধি গুপ্তের) মত দীর্ঘজীবী পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে অতি বিরল। তিনি ১১৪৮ বঙ্গাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া

(১) নিম্ন-লিখিত শ্লোকে এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কহেন জীব গোস্বামী, কেহ কেহ কহেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এই শ্লোকটীর রচয়িতা:—

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাবচননিশমনে সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি সততং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

মৎপ্রণীত "উদ্ভট-সাগরঃ" (তৃতীয়প্রবাহঃ) ৩৫ শ্লোকঃ।

১২৩৫ বঙ্গাব্দে ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সহিত নিধু-বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রাজবাটীতে যখনই সমারোহ হইত, তখনই নিধু-বাবুর নিমন্ত্রণ হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশ-চন্দ্র,—এই চারি পুরুষ ধরিয়া তিনি কৃষ্ণনগরের রাজসভা অলঙ্কৃত রাখিয়াছিলেন। এই চারি মহারাজকেই তিনি গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে তিনি একবার রাজবাটীতে গিয়া গান করিয়াছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া রস-সাগর এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ছুটিয়া গিয়া সভাস্থলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, 'আকাশের বিধু, আর ভূতলের নিধু।" তখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মহারাজ! নিধুর সহিত বিধুর তুলনা হইতেই পারে না!" ইহা বলিয়াই রস-সাগর কহিলেন, 'ধূধূ ক'রে মরে বিধু নিধুর নিকটে!" তখন মহারাজের আদেশে রস-সাগর সভাস্থলে নিধু-বাবুর সম্মুখে বসিয়াই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—ধূধূ ক'রে মরে বিধু নিধুর নিকটে!"

সকলেই বলে, বিধু অতি মনোরম,
আমি কিন্তু বলি, ইহা মানুষের ভ্রম,—
বিধুর মালিন্য আসে দিবস আসিলে,
নিধুর মালিন্য হায় নাই কোন কালে!
বিধুর কিরণ-গ্রাস করে মেঘচয়,
নিধুর কিরণ রয় সকল সময়!
বিধুর কলঙ্কী নাম জানে সর্ব্ব জন,
নিধুর শরীরে নাই কলঙ্ক কথন!

বিধুর মানসে সদা থাকে রাহু-ভয়,
নিধু। কখনো সেই ভয় নাহি রয়!
বিধুর দর্শন নাই অমাবস্যা হ'লে,
নিধুর দর্শন কিন্তু মিলে সব কালে!
বিধু চন্দ্র, নিধু চন্দ্র,—দুই চন্দ্র বটে,
'ধুধু ক'রে মরে বিধু নিধুর নিকটে!'

(১২৬)

মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যখন নন্দকুমার লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইবার নিমিত্ত মহা-সমারোহে একটী কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং রাণী ভবাণীর ভাণ্ডারী দয়ারামকে স্বীয় ভাণ্ডার-গৃহের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে মনের আবেগে তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "নন্দ-কুমারের ফাঁসি শুনে বুক ফাটে!" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগর এই সমস্যাটি এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"নন্দ-কুমারের ফাঁসি শুনে বুক ফাটে!"

বাঙ্গালা এগার শত বিরাশির সালে
একুশে শ্রাবণ শনিবার প্রাতঃকালে
যে কাণ্ড হইয়াছিল আলিপুর-ধামে
বাঙ্গালীর হৃৎকম্প হয় তার নামে।
কুলী-বাজারের কাছে যে ময়দান ছিল,
তাহার উপরে বধ-মঞ্চ বাঁধা হ'ল।

*　　*　　*　　* (১)

লোকারণ্য হ'ল মাঠ দেখিতে দেখিতে,
সমবেত সব লোক লাগিল কাঁদিতে।

কিবা ধনী জন, কিবা ধনহীন জন,
হাহাকার রব তুলি' ফাটায় গগন।
মহারাজ বলিলেন সেরিফে তখন,—
"মোর শব বয় যেন এ তিন ব্রাহ্মণ।
মৃতদেহ নাহি স্পর্শে যেন আর কেহ,
ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি,—পুণ্য এই দেহ।"
নিজ পাল্কী খানি তিনি বর্জ্জন করিয়া
বধ-মঞ্চ-স্থানে যান চরণে চলিয়া।
কোথায় ফ্রান্সিস্, ক্লেভারিং মন্‌সন্!
কোথা মোর গুরুদাস,—হৃদয়ের ধন!
সম্মানী, আনন্দময়ী, কোথা কিনুমণি,
কোথায় রহিলি মাগো! আদরের খনি!
এই সব কথা মনে ভাবিতে ভাবিতে
সেরিফেরে ডাকিলেন নিকটে আসিতে।

*　　*　　*　　*

ফ্রান্সিস্, ক্লেভারিং আর মন্‌সন্,
আমার পরম বন্ধু,—জানে সর্ব্ব জন।

---

(১) ২৮ বৎসর পূর্ব্বে নাপিত-পল্লীর পুঁথি হইতে উড্-পেন্‌সিল দিয়া যে নকল করিয়া লইয়া ছিলাম, তাহার মধ্যে কয়েক স্থান এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা আর পড়িতে পারা যায় নাই। এই অস্পষ্ট স্থান গুলিতে * তারা-চিহ্ন দেওয়া গেল।—গ্রন্থকার

ব'ল তাঁরা যেন মোর পুত্র গুরুদাসে
নিজ পুত্র বলিয়াই সদা ভালবাসে।
সেরিফ গেলেন তাঁর মুখ আবরিতে,
নিষেধ করেন রাজা এ কাজ করিতে।
বধ-মঞ্চে উঠিলেন শ্রীনন্দ-কুমার,
কি হ'ল, কি হ'ল—সবে করে হাহাকার।
জল্লাদ আদেশ পেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে
গেল নন্দ-কুমারের গলে ফাঁসি দিতে।
পরম প্রশান্ত-চিত্ত শ্রীনন্দ-কুমার,
বিকারের চিহ্ন নাই বদনে তাঁহার!
রাজা, মহারাজ, আর ওমরাহ-গণ
পড়িয়া রহিত যাঁর দ্বারে অনুক্ষণ;
যাঁহার দর্শন-লাভ করিবার তরে
পথে ঘাটে দাঁড়াইত লোক থরে থরে;
যাঁহার কথায় মীর-জাফর নবাব
সাহসী না হইতেন করিতে জবাব,
সে নন্দ-কুমার আজ পড়িয়া ফাঁপরে
গল-দেশ সঁপে দিলা জল্লাদের করে।
জল্লাদ রুমালে বাঁধে হাত দুটী তাঁর,
পা দুটী রহিল খোলা,—ইহাই নিস্তার।
দেখিতে দেখিতে নন্দ-কুমারের প্রাণ
পঞ্চভূতে মিশাইল করিয়া প্রস্থান।
শ্রীনন্দ-কুমার আজ যাইলা চলিয়া,
সমগ্র বঙ্গের ভূমি উঠিল কাঁপিয়া।

এই পাপ দৃশ্য চক্ষে মানুষ দেখিয়া
ক্ষালন করিল পাপ গঙ্গায় পড়িয়া।
গঙ্গার অপর পারে বালী গ্রাম রয়,
অনেক ব্রাহ্মণ তথা লয়েন আশ্রয়।
সে অবধি আর তাঁরা কলিকাতা-পারে
কিছুতে না আসিলেন জনমের তরে।
ধন্য হে হেষ্টিংস তুমি, ধন্য ইম্পে আর,
নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণে আজ করিলে সংহার।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদ-ধূলি যাঁর শিরে,
হেন পরিণাম তাঁর এতদিন পরে।
ব্রাহ্মণের শিরোমণি যে নন্দ-কুমার,
পরিণামে এ দুর্গতি হইল তাঁহার।
অদ্যাপি কাঁদিছে কত লোক মাঠে ঘাটে,
"নন্দ-কুমারের ফাঁসি শুনে বুক ফাটে।" (১)

(১২৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "এখনই আপনাকে একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব। কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন,—"নন্দের দুলাল তুমি, আদুরে গোপাল!" রস-সাগর যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া ছিলেন :—

---

(১) ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট তারিখে অর্থাৎ ১১৮২ বঙ্গাব্দে ৩১ শে শ্রাবণ শনিবার প্রাতঃকালে নন্দকুমারের ফাঁসি।

সমস্যা—"নন্দের দুলাল তুমি, আদুরে গোপাল!"

(মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যঙ্গোক্তি)

লইয়া গরুর পাল সুখে অনিবার
কত রঙ্গ কর তুমি হে নন্দ-কুমার!
যতই করহ রঙ্গ লইয়া তাহায়,
দিগ্‌-গজের কিবা ক্ষতি বল আছে তায়!
লতা পাতা দিয়া তুমি রচিলে ভূষণ,
স্বর্ণের কি ক্ষতি তায় বল হে এখন!
গোপীর চরণ-তলে যদি লও স্থান,
স্বর্গ-রমণীর তায় কিবা অপমান!
শ্রীকুঞ্জঘাটার কুঞ্জে বিহার করিয়া
বাঙ্গালা দেশের টিকি রেখেছ ধরিয়া!
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাই তুমি বাঙ্গালায়,
কার সাধ্য কোন কথা কহে বা তোমায়!
নাহি বুঝ কালাকাল, শুধু ধর চা'ল,
'নন্দের দুলাল তুমি, আদুরে গোপাল!'

[প্রস্তাব। ত্রিবেণী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিধর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১১৩ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান জমীদার, রাজা, মহারাজ, নবাব ও ইংরাজ-বাহাদুর-গণের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজের বিশেষ অনুরোধ-সত্ত্বেও জগন্নাথ তাঁহার বাটীতে আহার না করিয়াই ক্রোধভরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া-

ছিলেন। ইহাতে মহারাজ বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। জগন্নাথ অনেক দিন মহারাজের গৃহে পদার্পণ না করাতে মহারাজ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আসিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করেন। তেজস্বী ও অভিমানী জগন্নাথ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বিদ্রূপ-সহকারে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া এক খানি পত্রে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রস-সাগরের এই কবিতাটি সেই শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র।] (১)

(১২৮)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের কোন বয়স্য একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "না ভাল সুন্দর-বন, ভাল কচু-বন।" তদুত্তরে রস-সাগর এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"না ভাল সুন্দর-বন, ভাল কচু-বন।"

করি এই নিবেদন বিশাল সুন্দর-বন!
ধ'রে আছ কত হিংস্র জন্তু অগণন।
ধন্য ক্ষুদ্র কচু-বন কচুর জীবন-ধন
'না ভাল সুন্দর-বন, ভাল কচু-বন।'

(১২৯)

একদিন রস-সাগরের এক বন্ধু তাঁহাকে এই সমস্যাটী পূর্ণ

(১) এই সংস্কৃত শ্লোকটি মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সাগরঃ"-গ্রন্থের "তৃতীয়-প্রবাহে" ৪৬ পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছে :—

স্বেচ্ছাচাররসে মুদা বহুগবান্ দিগ্‌দন্তিনাং কা ক্ষতিঃ
পত্রৈর্মস্তকভূষণানি কুরুষে বর্হৈস্তু কিং লাঘবম্।
গোপীপাদতলে সদা পতসি চেৎ কিং নিন্দ্যতে সর্বধুঃ
কিং ক্রমো বত কুম্ভঘট্টনৃপতে শ্রীনন্দবালাহধুনা॥

(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য)

করিতে দিয়াছিলেন, "নারী নাহি তৃপ্ত রয় বহু নর ল'য়ে।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"নারী নাহি তৃপ্ত রয় বহু নর ল'য়ে।"

অনলের তৃপ্তি নাই বহু কাষ্ঠ খেয়ে,
মহোদধি তৃপ্ত নয় বহু নদী পেয়ে;
যম তৃপ্ত নয় বহু প্রাণী পেটে দিয়ে,
'নারী নাহি তৃপ্ত রয় বহু নর ল'য়ে।' (১)

(১৩০)

একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, "নাহি যায় বলা।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"নাহি যায় বলা।"

যদি আঁব পাওয়া যায় সিমুলের তলা,
বিনা জলে নিবে যদি নিজ ঘর জ্বলা,
পরের ঘাড়ে যদি যায় বিদেশেতে চলা,
তাহে যত সুখ রয় 'নাহি যায় বলা।'

(১৩১)

একদা নবদ্বীপ-নিবাসী একটী পণ্ডিত রাজ-সভায় গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"নাহি লয় কড়ি।" রস-সাগর পণ্ডিত মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

---

(১) এই কবিতার ভাব নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত শ্লোক হইতেই গৃহীত :—
"নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥"

সমস্যা—"নাহি লয় কড়ি।"

(যখন রামচন্দ্র ও লক্ষণকে লইয়া মিথিলা-গমন-কালে
বিশ্বামিত্র নদীপারে যাইতে ছিলেন, তখন পারের
মূল্য দিবার নিমিত্ত রামচন্দ্র অর্থাভাবে ইতস্ততঃ
করায় তাঁহার প্রতি মাঝির বিনয়োক্তি।)

এ ভব-সাগর সদা পার কর তুমি,
এই ক্ষুদ্র নদী হায় পার করি আমি।
দু-জনাই এক ব্যবসা ক'রে ক'ম্মে খাই,
তবে কেন দাম লব, কহ মোরে ভাই!
কখনই কামাইয়া নাপিতের দাড়ি
অপর নাপিত হায় 'নাহি লয় কড়ি!' (১)

(১৩২)

একদিন নিধু-বাবু মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় গান করিয়া শ্রোতৃগণকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রস-সাগরও সে সময় সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিধু-বাবুর গান শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিধুর মধুর টপ্পা শুনিলে বিধুর!" তখন নিধু-বাবু কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনি সুপণ্ডিত ও সুকবি ব্রাহ্মণ; এখন আপনার নিকটে এই অধম বৈদ্যের নিবেদন এই যে, আপনিই আপনার সমস্যাটী এখনই পূর্ণ করুন।" তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

---

(১) মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সাগরঃ"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত উদ্ভট-শ্লোকে এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায় :—

"নাপিতায়াপিতো নাথ তারকায়াপি তারকঃ।
কর্ম্মমূল্যং ন গৃহ্নীয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

সমস্যা—"নিধুর মধুর টপ্পা শুনিলে বিধুর।"

রামনিধি গুপ্ত তুমি, নিধু-বাবু নাম,
কত গুণ ধর দেহে, ওহে গুণধাম!
যদি আমি হইতাম সহস্র-লোচন,
প্রাণ ভ'রে হেরিতাম তোমার বদন!
কর্ণময় হ'ত যদি সর্ব্বাঙ্গ আমার,
আশা মিটে যেত গান শুনিয়া তোমার!
বধূর অধর-রস কি আর মধুর?
'নিধুর মধুর টপ্পা শুনিলে বিধুর!'

(১৩৩)

একদা কৃষ্ণনগরে বারোয়ারী-তলায় যাত্রা হইতেছিল। রস-সাগর প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত, ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক জন তখন বলিয়া উঠিলেন, "নিশা অবসান।" তখন রস-সাগর এইভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"নিশা অবসান।"

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশী-বয়ান!
সুখ-তারা-আগমনে শশী ম্রিয়মাণ।
লোকে দেখিলেই হবে মোর অপমান,
গাত্রোত্থান কর নাথ! 'নিশা অবসান।'

(১৩৪)

জীবনের শেষ দশায় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। তিনি একদিন দুঃখ করিয়া রস-সাগরকে বলিলেন:—"নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে!" রস-সাগর এই সমস্যাটী শুনিবামাত্র তখনই ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে।"

এই দেহ খানি তব পরম সুন্দর,
ব্যাধির মন্দির কিন্তু জে'নো ওহে নর!
যে ব্যাধি অসাধ্য, তাহা কার সাধ্য সারে,
বিধাতার কাছে বৈদ্য কি করিতে পারে?
এ দেহ-পিঞ্জর! তাহে নহে নব-দ্বার,
প্রাণ-পক্ষী তার মধ্যে করিছে বিহার!
কখন্ সুবিধা পেয়ে কোন্ দ্বার দিয়া
পলাইয়া যাবে, তাহা না পাবে ভাবিয়া।
ওরে মন! কবে যম লবে লুটে পুটে,
'নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে!'

(১৩৫)

এক দিন কয়েকটী শিক্ষিত ভদ্রলোক রস-সাগরকে দেখিবার জন্য কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরের রাজ-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কয়েকটী ভদ্রলোকের সহিত সভায় বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। রস-সাগরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা-নিবাসী একটী লোক মহারাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার সভা-পণ্ডিত রস-সাগর মহাশয়কে দেখিব এবং একটী সমস্যা পূরণ করাইয়া লইব।" মহারাজ বলিলেন, "আপনার সমস্যা বলুন।" তখন উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন, "নিকুঞ্জ চুম্বন করে রমণীর মুখ।" রস-সাগরের শক্তিও ধন্য! বলিবামাত্র তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"নিকুঞ্জ চুম্বন করে রমণীর মুখ।"

একাকিনী রজকিনী,—সদা মনে দুখ,
দিবানিশি খেটে মরে, নাহি পায় সুখ।

কাজ নহ,—ভাঁজ মাত্র,—প্রহারিয়ে বুক,
'নিষ্কন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ?'

[ব্যাখ্যা। রজক-রমণীর স্বামী নাই; সে একাকিনী মনের কষ্টে জামা ভাঁজ করিতেছে। জামা ভাঁজ করিতে হইলে দুই হাতে জামার দুইটী হাতা লইয়া মুখ দিয়াই উল্‌টাইয়া ফেলিতে হয়, ইহা বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। রস-সাগর মহাশয় যে কত বিষয়ে লক্ষ রাখিতেন, তাহাই বিস্ময়কর!

(১৩৬)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কথায় কথায় রস-সাগরকে কহিলেন, "ভারত-চন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যা-সুন্দরে এমন এক একটী ভাব-পূর্ণ কথা আছে যে, বাস্তবিকই তাহার তুলনা নাই।" ইহা বলিয়াই তিনি রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার!" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার!

সুধীর পণ্ডিত লোক অনেক সময়
কৃতবিদ্য কবিকেও করে পরাজয়।
হায় রে সেজন কিন্তু মূর্খের সভায়
আসিয়াই তার কাছে হা'র মেনে যায়।
হীরক পাষাণ-মণি কেটে করে ক্ষয়,—
এই কথা পৃথিবীতে সকলেই কয়।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার!'

(১৩৭)

একদিন শ্রীশচন্দ্রের সভায় সমস্যা উঠিল, "পণ্ডিতের নিন্দা করে মূর্খ অনুক্ষণ!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পণ্ডিতের নিন্দা করে মূর্খ অনুক্ষণ!"

কুলীনের নিন্দা করে কুলহীন জন,
ভাগ্যবানে ভাগ্যহীন নিন্দে অনুক্ষণ।
দাতৃ-জনে নিন্দা করে যে জন কৃপণ,
সরলের নিন্দা করে কুটিল যে জন।
ধনাঢ্যের নিন্দা করে, ধন নাই যার,
রূপবানে রূপহীন নিন্দে অনিবার।
সতী রমণীর নিন্দা করিবে অসতী,
ধার্ম্মিকের নিন্দা করে অধার্ম্মিক অতি।
নগর-বাসীর নিন্দা করে গ্রাম্য জন,
'পণ্ডিতের নিন্দা করে মূর্খ অনুক্ষণ!'

(১৩৮)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু লইয়া সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-শোভায়!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

(ক)

সমস্যা—"পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-সভায়।"

হংস শোভা পায় পদ্ম-বনের ভিতরে,
সিংহ অতি শোভা পায় পর্ব্বত-গহ্বরে।

রণ-স্থলে গিয়া অশ্ব মহাশোভা পায়,
'পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-সভায়।

যখন রস-সাগর এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন, তখন সভাস্থ আর এক জন প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।" রস-সাগরের রসের ভাণ্ড অগাধ ও অপার। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পুনর্ব্বার পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

(খ)

সমস্যা—"পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।"
সিংহের না শোভা হয় শৃগালের দলে,
হংস নাহি শোভে কাক-দলেতে মিশিলে।
গর্দ্দভের দলে অশ্ব শোভা নাহি পায়,
'পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।

(১৩৯)

একবার একজন সমস্যা দিলেন, "পতির বাসনা মনে স্ত্রীর গর্ভে যায়।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"পতির বাসনা মনে স্ত্রীর গর্ভে যায়।"
পুত্রের বাসনা মনে পিতা হয় অতি,
শাশুড়ী বাসনা করে জামাই হোক্ পতি।
বধূর বাসনা মনে শ্বশুর লাগুক্ গায়,
পতির বাসনা মনে স্ত্রীর গর্ভে যায়।

(১৪০)

একবার রস-সাগরের ভাগ্যে একটী উৎকট সমস্যা পড়িয়াছিল, —"পদ্মিনী উদিত নিশি কুমুদিনী দিনে।" রস-সাগর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"পদ্মিনী উদিত নিশি, কুমুদিনী দিনে।"

১ম পূরণ।

জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা হ'লো মনে,
চক্রান্ত করিলা চক্রী চক্র-আচ্ছাদনে।
অকালেতে কাল নিশা উভয়ে না জানে,
'পদ্মিনী উদিত নিশি, কুমুদিনী দিনে।

[ব্যাখ্যা। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে বধ করিব, নচেৎ অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। জয়দ্রথ-বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। কমলিনীর রাত্রিকালে ও কুমুদিনীর দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু এই কবিতায় তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।]

২য় পূরণ।

সার্থক শিবের সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে,
একি রূপ অপরূপ তারক ভুবনে।
ছয়-ঋতু, চন্দ্র, সূর্য্য একই উদ্যানে,
'পদ্মিনী উদিত নিশি, কুমুদিনী দিনে।'

(১৪১)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারণে পদ্মিনী সন্ধ্যাকালে মুদ্রিত হইয়া যায়?" এই প্রশ্ন করিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তিনি তখন এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।"

চলিয়া গেলেন সূর্য্যদেব অস্তাচল,
জ্বলিতে লাগিল যত জোনাকির দল।
চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে মরিল,
পেচক সকল রব করিতে লাগিল।
হাসিতে লাগিল সুখে যত কুমুদিনী,
ভাসিল চক্ষের জলে যত বিরহিণী।
বালিকা বধূর মনে আতঙ্ক জন্মিল,
সূর্য্যের অভাবে হায়, এ সব ঘটিল!
পোড়া বিধাতার লীলা বুঝে উঠা ভার,
কিছুতে না সহ্য হয় এ সব ব্যাপার:
হেন অপরূপ কাণ্ড হেরিয়া ভূতলে
'পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।'

(১৪২)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "আপনাকে একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব; কিন্তু তাহা এক চরণ দিয়াই আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি এই সমস্যাটী দিলেন:—"পদ্মিনীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হুল!" রস-সাগরের রস অসীম! তিনিও এইভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"পদ্মিনীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হুল!"

কাঠ কাটে খুব অলি,—নাহি তায় ভুল,
'পদ্মিনীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হুল!'

(১৪৩)

একবার মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় সমস্যা উঠিল:— "চন্দ্র

পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!" রস-সাগর অবিলম্বেই ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পদ্মে পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!"

রণরঙ্গে মত্ত 'কালী' দানব-সমরে,
পদভরে ধরাতল টল্‌মল্ করে।
সর্ব্বনাশ হ'লো আজ,—ভাবিয়া শঙ্কর
শব-রূপে নিপতিত পৃথিবী উপর।
ব্যাকুলা হইয়া কালী হরহৃদি উঠে,
হৃৎপদ্মে পাদপদ্ম অপরূপ ফুটে।
এ রস-সাগর কহে হইয়া তন্ময়,
'পদ্মে পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!'

(১৪৪)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন কারলেন, "কোন্ অঙ্গ দিয়া নারী পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়?" রস-সাগর উত্তর দিলেন, "সর্ব্বাঙ্গ"। তখন মহারাজ কহিলেন, "পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!" রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!"

দেবগণ করে যবে সমুদ্র-মন্থন,
তা হ'তে কতই বস্তু উঠিল তখন,—
বিধাতা সে সব গুলি গ্রহণ করিয়া
যতনে নারীর মুখে দিলেন রাখিয়া
গণ্ডস্থলে রাখিলেন শুভ্র শশধরে,
অমৃত রাখিয়া দেন রম্য ওষ্ঠাধরে।

রম্য পারিজাত-পুষ্প নিশ্বাস-পবনে,
'পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!'

(১৪৫)

একদিন বেতনের দরুণ রাজবাটী হইতে একখানি বরাতী চিঠি লইয়া রস-সাগর একজন ইজারদারের নিকটে কিছু টাকা লইতে গিয়াছিলেন। ইজারদার বলিলেন, "রস-সাগর ঠাকুর! আমার একটী সমস্যা যদি পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বরাতী চিঠির সব টাকাই আপনাকে দিব। একটী টাকাও কাটিয়া লইব না।" রস-সাগর কহিলেন, "আপনার সমস্যা কি?" ইজারদার কহিলেন, "পর্ব্বত-শিখরে মীন উচ্চ-পুচ্ছে নাচে।" রস-সাগর সেই খানে দাঁড়াইয়াই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা।—"পর্ব্বত শিখরে মীন উচ্চপুচ্ছে নাচে।"

ইন্দ্র-হাতে বজ্রাঘাতে কার সাধ্য বাঁচে,
অগাধ সমুদ্র-মধ্যে মৈনাক ডুবেছে।
মহতের ক্ষুদ্র দশা দৈবাধ হয়েছে,
'পর্ব্বত-শিখরে মীন উচ্চ-পুচ্ছে নাচে।'

(১৪৬)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন,— "পাছে তার পুত্র কন্যা ধন হ'রে লয়।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, আপনাকে কেবল এক চরণ দিয়াই ইহা পূরণ করিতে হইবে। তদনুসারে রস-সাগর একমাত্র চরণেই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"পাছে তার পুত্র কন্যা ধন হ'রে লয়।"

নারী-সঙ্গে কৃপণের ইচ্ছা নাহি রয়,
'পাছে তার পুত্র কন্যা ধন হ'রে লয়।'

(১৪৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে মানিনীর মানভঙ্গ সম্বন্ধে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"পান-খয়েরের মত তোমায় আমায়।" রস-সাগর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"পান-খয়েরের মত তোমায় আমায়।"

(মানিনীর প্রতি নায়কের উক্তি)

এস এস এস প্রিয়ে! ব'স এইখানে,
"ভাল আছি,"—বল মুখে, তাই শুনি কাণে।
মানিনী কামিনী তুমি,—ছাড় তব মান,
মান ছাড়ি' প্রণয়ের বাড়াও সম্মান।
রাগারাগি ভাগাভাগি কেন কর আর,
মানের মাথায় বাজ পড়ুক্ এবার।
দিয়াছ অশেষ দুঃখ, নাই কিছু বাকী,
তুমি ভাল থাকিলেই আমি ভাল থাকি।
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে বসি আমি যদি,
বোধ হয়, ঠিক আমি কর্ম্মনাশা নদী।
আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী,
আমি হর, তুমি গৌরী—পরমা সুন্দরী।
আমি সূর্য্য, আর তুমি সেই কমলিনী,
আমি চন্দ্র, আর তুমি সেই কুমুদিনী।
হাসি হাসি মুখখানি তুল একবার,
জুড়াইয়া যাক্ পোড়া হৃদয় আমার।
যামিনী চলিয়া যায়,—নাহি আর শেষ,
আলিঙ্গন দাও মোরে,—ঘুচে যাক্ ক্লেশ।

আজ হ'তে মহাসুখে থাকিব ধরায়,
'পান খয়েরের মত তোমায় আমায়!'

(১৪৮)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া অনেকের সমক্ষে বলিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আমি একটি সমস্যা আপনাকে পূর্ণ করিতে দিব। যদি আপনি ইহা আমায় মনের মত করিয়া পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পুরস্কার দিব।" এই কথা বলিয়া মহারাজ প্রশ্ন করিলেন "পায় পায় পায়।"

সমস্যা—"পায় পায় পায়।"

কেঁদে কহে বিন্ধ্যাবলী, বলিরাজ! শুন বলি,
ছলিবারে বনমালী, হ'লেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, জয় বলি জয়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধর হে মাথায়।
তুমি আমি দু'জনের ঘুচিবে কর্ম্মের ফের,
মিশাইব বামনের, 'পায় পায় পায়॥'

(১৪৯)

একদা মহারাজ রস-সাগরকে কহিয়া ছিলেন, "পায় পায় পায় না।" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পায় পায় পায় না।"

চিনিতে নারিনু আমি, আসিল জগৎ-স্বামী
মাগিল ত্রিপাদ-ভূমি, আর কিছু চায় না।

খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না॥
দিয়া সকল সম্পদ্, এ দেখি ঘোর বিপদ্,
বাকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে! বিন্ধ্যাবলি! দেখ'সিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে 'পায় পায় পায় না॥'

(১৫০)

কথিত আছে যে, একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে একটী জটিল সমস্যা পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সমস্যাটি এই:—"পিতামহের মাতামহ রথের সারথি।" রস-সাগর কাল-বিলম্ব না করিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দিয়া যুবরাজকে পরম সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সমস্যা—"পিতামহের মাতামহ রথের সারথি।"

তুমি, আমি, মামা, আর কৃপ, অশ্বত্থামা,
কর্ণ, দুঃশাসন নহে অর্জ্জুন-উপমা।
কৌরব-গৌরব-ধন পিতামহ-রথী,
'পিতামহের মাতামহ রথের সারথি।'

[ব্যাখ্যা। দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে, আপনি, আমি, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুঃশাসন, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই অর্জ্জুনের মত বীর ও যোদ্ধা নহেন। কৌরব-গণের এই একমাত্র গৌরব যে, পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহাদিগের রথী, কিন্তু সেই রথী ভীষ্মদেবের মাতামহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি। বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার পিতা, এবং গঙ্গা ভীষ্মের মাতা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মের মাতামহ।]

(১৫১)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র বয়স্য-গণের সম্মুখে রস-সাগর দ্বারা সমস্যা পূরণ করাইয়া মহান্ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি একদিন উৎকট প্রশ্ন করিলেন, "পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।" রস-সাগর স্বীয় দৈব-শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।"

১ম পূরণ।

অদিতি-নন্দন সেই দেব পুরন্দর,
শিবাজ্ঞায় পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর।
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন্ বৃকোদর,
'পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।'

ইহা শুনিয়া যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনি রসের সাগর। সুতরাং আপনার রস কিছুতেই শুষ্ক হইবার নহে। অন্য প্রকারে আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর পুনর্ব্বার কহিলেন :—

২য় পূরণ।

তর্পণের কালে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন্,
তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন।
ইহা শুনি ধর্ম্মপুত্র ভাবেন সত্বর,—
'পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।'

(১৫২)

প্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগরে গান করিতে যাইতেন। গান করা শেষ হইলে বক্‌সিস্ লইবার জন্য তিনি মহারাজের সহিত সভায় দেখা করিতে গমন করিতেন। এক-

বার তিনি সভায় রস-সাগরকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একটী জটিল সমস্যা পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। সমস্যাটী এই :—"পিতার বৈমাত্র যে সে আমারো বৈমাত্র।" রস-সাগর দৈবী শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া সভাস্থ সকল লোককেই স্তম্ভিত ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"পিতার বৈমাত্র যে সে আমারো বৈমাত্র।"

তর্পণের কালে কুন্তী প্রকাশিল মাত্র,
উচ্চ-রবে কাঁদে তবে মাদ্রীর দুই পুত্র।
ষড়্‌যন্ত্রে বধিলাম এমন সুপুত্র,
'পিতার বৈমাত্র যে সে আমারো বৈমাত্র।'

[ব্যাখ্যা। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই গুপ্ত কথা কেহই জানিতেন না। কর্ণ-বধের পরে স্বয়ং কুন্তীই এই কথা পঞ্চ-পাণ্ডবের নিকটে প্রকাশ করেন। কর্ণ এই সম্পর্কে মাদ্রী-পুত্র নকুল ও সহদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেন। অন্য সম্পর্কে সূর্য্য-পুত্র অশ্বিনী-কুমার কর্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং কর্ণ এক পক্ষে নকুল ও সহদেবের বৈমাত্রেয়, অন্য পক্ষে তাঁহাদের পিতারও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।]

(১৫৩)

একদিন রস-সাগর মুদির দোকানে জিনিস-পত্র ক্রয় করিতে গিয়াছেন। সেখানে একটী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"পুণ্যবলে যশোলাভ হয় ভূমণ্ডলে।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিলেন।

সমস্যা—"পুণ্যবলে যশোলাভ হয় ভূমণ্ডলে।"

কুন্তী ও দ্রৌপদী হায় এই দুই জন
প্রত্যেকে ভজিলা পঞ্চ পতির চরণ।
তবু তাঁরা মহাসতী,—সকলেই বলে,
'পুণ্য-বলে যশোলাভ হয় ভূমণ্ডলে।'

(১৫৪)

নবদ্বীপ-নিবাসী কোন এক পৌরাণিক পণ্ডিত কৃষ্ণনগর-রাজ-সভায় গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন,—"পুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা ভক্তিভাবে পূর্ণ করিয়া সভাস্থ সকল লোককেই স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

সমস্যা—"পুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার।"

(মানব-গণের প্রতি রাম-নাম-ভক্ত হনূমানের উপদেশ)

'রা' অক্ষর উচ্চারিলে মুখটী যাইবে খুলে
হৃদয়ে সঞ্চিত পাপ পলাবে সত্বর।
পাছে তাহা পুনরায় হৃদয়ে আসিতে চায়
এই ভয় হয় যদি রে অবোধ নর!
তৎপর হইয়া তবে 'ম' অক্ষর উচ্চারিবে
অমনি মুদিয়া যাবে মুখটী তোমার॥
হেন নাম লও মুখে সদাই থাকিবে সুখে,
'পুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার।'

(১৫৫)

একবার রাজ-সভায় সমস্যা উঠিয়াছিল, "পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক্ গায়।" রস-সাগর তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক্ গায়!"

দ্রৌপদী সুন্দরী ব্যস্ত রন্ধনের ঘরে,
অগ্নি-তাপে প্রাণ তাঁর ছট্‌ফট্ করে।
আলু-থালু কেশে ক্লেশ বাহিরেতে গিয়ে
বাতাস লাগাতে গায় রহেন বসিয়ে।
রস-সাগরের রস উথলিয়া যায়,—
'পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক্ গায়!'

(১৫৬)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "পৃথিবীর মত ভার মস্তকে সহিব!" রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"পৃথিবীর মত ভার মস্তকে সহিব!"

(বালিকার প্রার্থনা)

সীতা-সম হব সতী রাম-সম পাব পতি
দ্রৌপদীর মত সবে রাঁধুনী হইব।
দূর্ব্বা-সম লজ্জাশীলা গঙ্গা-সম সুশীতলা
'পৃথিবীর মত ভার মস্তকে সহিব!'

(১৫৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে আপনার সংসার চলিতেছে?" রস-সাগর উত্তর করিলেন, "মানুষ কবি হইলে তাহার অন্ন হয় না, ইহাই পোড়া বিধাতার বিধি।" তখন মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "পোড়া বিধাতার লেখা।" রস-সাগরও প্রাণের কথা খুলিয়া সমস্যাটী পূরণ করিয়া মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"পোড়া বিধাতার লেখা।"

শুন হে গিরীশ-চন্দ্র! করি নিবেদন,—
যখন গিরীশ তুমি, তুমি ত্রিনয়ন!
যে নেত্রে উত্তাপ্ত তব, সেই নেত্র দিয়া
একবার মোর দিকে দেখ তাকাইয়া।
দর দর করি' ঘর্ম্ম-বিন্দু দিগ দেখ,
ঘুচে যাগ্ যত 'পোড়া বিধাতার লেখা।'

(১৫৮)

একদিন প্রাতঃকালে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র মহাশয় রস-সাগরকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিপার্শ্বে একটী পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটিতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রচণ্ড সূর্য্যের কর কিন্তু বুকে রাখে।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"প্রচণ্ড সূর্য্যের কর কিন্তু বুকে রাখে।"

যে যারে না ভাল বাসে গুণটীও তার
তার চক্ষে দোষ বলি' হইবে বিচার।
কিন্তু যারে ভাল বাসে হায় সেই জন,
দোষটাও গুণ তার বলিবে তখন।
পদ্মিনী চাঁদের সুধা চক্ষে বিষ দেখে,
'প্রচণ্ড সূর্য্যের কর কিন্তু বুকে রাখে।'

[ব্যাখ্যা। এই কবিতার শেষ চরণে যে "কর" শব্দটী আছে, তাহা শ্লিষ্ট। ইহার অর্থ,—এক পক্ষে "হস্ত", এবং অন্য পক্ষে "কিরণ।"]

(১৫৯)

একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন উঠিল, "প্রাণ-পাখী ফাঁকি দিয়া যাবে পলাইয়া।" রস-সাগর এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"প্রাণ-পাখী ফাঁকী দিয়া যাবে পলাইয়া!"

এ দেহ-পিঞ্জর,—তায় আছে নব দ্বার,
প্রাণ-পাখী তার মধ্যে করিছে বিহার।
এদিক্ ওদিক্ করি' ঘুরিছে সদাই,
পাছে পাখী যায় চ'লে,—এই ভয় পাই।
জানি না পিঞ্জর হ'তে কোন্ দ্বার দিয়া
'প্রাণপাখী ফাঁকী দিয়া যাবে পলাইয়া!'

(১৬০)

কোন সময়ে রাজ-সভায় প্রশ্ন হইয়াছিল, 'প্রাণেশ্বরে রে মন্মথ!" রস-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"প্রাণেশ্বরে রে মন্মথ!"

অশোক-কাননে সীতা শোকে সমাকুল,
ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কূল।
ফেল রে রামের পাশে শূন্যে আনি রথ,
প্রাণ জুড়াক্ দেখে 'প্রাণেশ্বরে রে মন্মথ!'

(১৬১)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বৈবাহিক মহারাজকেই লক্ষ্য করিয়া রস-সাগরকে সমস্যা দিলেন, "প্রেম সনে নাহি হয় প্রাণের তুলনা!" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"প্রেম সনে নাহি হয় প্রাণের তুলনা!"

বিধাতার মত মূর্খ নাহি ত্রিভুবনে,
প্রেমের ওজন ক'রে দিল প্রাণ সনে!

ওজনে হইয়া লঘু কণ্ঠে প্রাণ গেল,
প্রেম গুরু বলিয়াই হৃদয়ে রহিল!
পোড়া বিধাতার নাই বুদ্ধি বিবেচনা,—
'প্রেম সনে নাহি হয় প্রাণের তুলনা!'

(১৬২)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন বৈবাহিক একদিন তাঁহার সহিত নানাবিধ পরিহাস করিতে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া পার্শ্বস্থিত রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"প্রেমের বন্ধন কভু ছিন্ন নাহি হয়।" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তিনি তখন এই সমস্যাটী এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"প্রেমের বন্ধন কভু ছিন্ন নাহি হয়!"
কোথায় বা সূর্য্য-দেব, কোথা কমলিনী;
কোথায় বা চন্দ্র-দেব, কোথা কুমুদিনী;
কোথায় চকোর, আর কোথা জলধর;
কোথায় চাতক, আর কোথা শশধর।
বহু দূর হইলেও তাহা কিছু নয়,
'প্রেমের বন্ধন কভু ছিন্ন নাহি হয়!'

(১৬৩)

ফতেচাঁদ জগৎ-শেঠ অতি মহাশয় লোক ছিলেন। জমীদার, রাজা, মহারাজ ও ইংরাজ বাহাদুরকেও টাকা কর্জ্জ দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন। এজন্ত তাঁহার নিকটে সকলেই মস্তক নত করিয়া থাকিতেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং জমীদার, রাজা ও মহারাজ-গণের দেয়

কর স্বয়ং দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিতেন বলিয়া বাঙ্গালার নবাবগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কিন্তু সর্ফরাজ খাঁ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়া দিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র এই সকল বিষয় লইয়া রস-সাগরের সহিত আলাপ করিতে করিতে মনের কষ্টে বলিয়া ফেলিলেন, "ফতেচাঁদ জগৎশেঠ ফাঁপরে পড়িল।" রস-সাগর এই সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"ফতেচাঁদ জগৎশেঠ ফাঁপরে পড়িল!"

সর্ফরাজ খাঁ নবাব বাঙ্গালার পতি,
সুন্দরী নারীর প্রতি ছিল তাঁর প্রীতি।
নসরৎ খাঁ সাহেব মোসাহেব তাঁর,
সুন্দরী সংগ্রহ করা ভার ছিল যাঁর।
রূপসী রমণী যদি জাঁহাপনা চান,
এখনি জগৎ-শেঠে ডাকিয়া পাঠান।
জগৎশেঠের এক আছয়ে নাতিনী, (১)
রূপসী যাহার মত কভু নাহি শুনি।
সবে মাত্র বয়ঃসন্ধি হইয়াছে তার,
না বালিকা, না যুবতী,—মাঝামাঝি সার।
নাতিনীরে উপহার দিবার কারণ
ডাকিলা জগৎ-শেঠে নবাব তখন।
ইহা শুনি' ফতেচাঁদ প্রমাদ গণিল,
আকাশ তাঁহার শিরে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(১) মদীয় পরম-বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল্ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"তে লিখিত হইয়াছে যে, ইনি ফতেচাঁদ জগৎশেঠের নাত-বৌ ছিলেন।—গ্রন্থকার

একদিহ সৈন্যগণ পাঠাইয়া তাঁরে
নবাব আনিলা ধরি' আপনার ঘরে।
কেবল তাহার রূপ দর্শন করিয়া
সন্ধ্যাকালে গৃহে তাঁর দিলা পাঠাইয়া।
শেঠ-রাণী কেঁদে বলে কি হ'ল হ'ল.
'ফতেচাঁদ জগৎশেঠ ফাঁপরে পড়িল !'

(১৬৪)

একদা রাজ-সভায় কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "বজ্রাঘাতে মরে।" তিনি বলিয়া দিলেন, ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহার উত্তর দিলেন:—

সমস্যা—"বজ্রাঘাতে মরে।"

মীর-জাফরের পুত্র দুরন্ত মীরণ,
নিষ্ঠুর তাহার মত না কেহ কখন!
অকারণে রক্তপাত করিত কেবল,
রক্তপাত না করিয়া নাহি খেতো জল।
বধিবারে তিন শত শত্রুর জীবন,
নাম লিখে রেখে দিল খাতায় মীরণ।
ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি করে আপনার
কত শত মুণ্ডপাত করিল বেক্কার।
ঘেসেটী বেগম সেই সিরাজের মাসী,
আমিনা সিরাজ-মাতা পরম রূপসী।
বন্দিভাবে দুই জনে ছিলেন ঢাকায়;
মীরণ বখর-খাঁকে পাঠালে তথায়।

বখর কৌশল করি' আমি দুই জনে
পদ্মা-গর্ভে ডুবাইল পরম গোপনে।
মৃত্যুকালে দুই জনে কোরাণ ছুঁইয়া
পদ্মা-গর্ভে ডুবিলেন এই শাপ দিয়া,—
"আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যা আমরা দু-জন,
আমাদের অন্নে পুষ্ট তুই রে মীরণ!
আমরা ত চলিলাম জনমের তরে,
বজ্রাঘাতে মৃত্যু তোর হইবে অচিরে।"
শাহালম সনে যুদ্ধ যবে পাটনায়,
মীরণ তাম্বুতে গিয়া নিশি নিদ্রা যায়।
অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল
মীরণ পাইয়া ভয় জাগিয়া উঠিল।
মীরণের হত্যাকাণ্ড সহিতে না পারি,
ইন্দ্র নিক্ষেপিলা বজ্র তার শিরোপরি।
অকারণে মনস্তাপ যে দেয় সংসারে,
সেই জন সুনিশ্চয় 'বজ্রাঘাতে মরে।'

[প্রস্তাব। সিরাজ-উদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতি ও মৃত্যু হইলে মীর-জাফর সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। কিন্তু বার্দ্ধক্য-বশতঃ কিছু দিন পরেই তিনি স্বীয় রাজ্য-ভার, জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের উপরি অর্পণ করেন। মীরণ নিরতিশয় দুরাত্মা ও দুর্বৃত্ত ছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার নিষ্ঠুরতায় নিপীড়িত হইয়া রাজ্যের লোক সকল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি যে সকল নরহত্যা করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় বিবরণ রস-সাগর মহাশয়ের কবিতাতেই, প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে

২রা জুলাই তারিখে তিনি বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভগিনী-পতি মীর-কাশিম তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।]

(১৬৫)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক জন পরম আত্মীয় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "বড় দুঃখে সুখ।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এই-ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বড় দুঃখে সুখ।"

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে
নিশায় নিষাদ আনি রেখে দিল ঘরে।
চকা কয় চকী প্রিয়ে! এ বড় কৌতুক,
বিধি হতে ব্যাধ ভাল 'বড় দুঃখে সুখ।'

[ব্যাখ্যা। একদিন এক ব্যাধ একটী চক্রবাক ও চক্রবাকীকে ধরিয়া রাত্রিকালে একটি পিঞ্জরের মধ্যে উভয়কেই একসঙ্গে পূরিয়া রাখিয়া দিল। রাত্রিকালে স্ত্রী-পুরুষের মিলন এবং দিবাভাগে তাহাদিগের বিচ্ছেদ হওয়া বিধাতার নিয়ম; কিন্তু চক্রবাক ও চক্রবাকীর পক্ষে ইহা ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ দিবাভাগে তাহাদের মিলন এবং রাত্রিকালে তাহাদের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে! এই হেতু চক্রবাক চক্রবাকীকে বলিতেছে যে, বিধাতার অপেক্ষা ব্যাধ ভাল।]

(১৬৬)

একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, "বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।" রস-সাগরের অপরিমেয় রস শুষ্ক হইবার নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তিরসে এই প্রশ্নটীর উত্তর এইভাবে দিলেন :—

সমস্যা—"বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।" (১)

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভক্ষণ করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
'বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥'

(১৬৭)

একদা রাজ-সভায় রস-সাগরকে প্রশ্ন করা হইল, "বদর বদর।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিলেন:—

সমস্যা—"বদর বদর।"

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর,
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর।
শাল দোশালা ঘুচে গেলে চাদরে আদর,
পাথারে পড়িলে তরি 'বদর বদর।'

[ব্যাখ্যা। প্রকোষ্ঠ—ঘরের পার্শ্ব-গৃহ। কদর—যত্ন বা আদর।

(১) এই সমস্যাটী কোন্ কবি পূরণ করিয়া ছিলেন, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে, সিমলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ কবি হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী) ইহা পূরণ করিয়া ছিলেন। আমারও এই ধারণা ছিল; তৎপরে মহারাজ বাহাদুর স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে একদিন কথা কহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়া ছিলেন, "হরু ঠাকুরই এই সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন, আমার এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণনগর-রাজবাটীর দেওয়ান স্বর্গত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়া ছিলাম যে, ইহা রস-সাগরের সমস্যা-পূরণ। এখন প্রকৃত পক্ষে ইহা কাহার পূরণ, তাহা সুধী পাঠক মহাশয়-গণেরই বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়।—গ্রন্থকার।

পাথারে—গভীর জলে। বদর—যে মুসলমান দেবতা জলে আরোহি-গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।)

(১৬৮)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতে দিলেন। রস-সাগর নানাবিধ ফল এক একটী উদরস্থ করিয়া আঙ্গুরগুলি সর্ব্বশেষে খাইবেন বলিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রস-সাগর হইয়া রসের সাগর আঙ্গুরের প্রতি এরূপ বিরূপ কেন?" তখন তিনি আঙ্গুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বধূর অধর নয় এত সুমধুর!" ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্দ্র তাঁহারই সমস্যাটী তাঁহাকে পূর্ণ করিতে দিলেন। তিনিও এইভাবে ইহা পূর্ণ করিলেন:—

সমস্যা—"বধূর অধর নয় এত সুমধুর!"

জামা'য়ের যে আদর শ্বশুর-বাটীতে,
আঙ্গুরের সে আদর কাঠের কৌটাতে!
কৌটার ভিতরে তারে গদীর উপরে
থরে থরে শোয়াইয়া রাখে সমাদরে!
কি কব তাহার রূপ,—বলা নাহি যায়,
কালিদাস হা'র মানে বর্ণিতে তাহায়!
কোথা লাগে মুক্তামালা আঙ্গুরের কাছে,
ইচ্ছা করি গলে ধরি,—গ'লে যায় পাছে।
তুল-তুলে দেহ খানি কিবা সুকোমল,
টল্-টল্ ঢল্-ঢল্ করে অবিরল।

তাহার গুণের কথা কি কহিব আর,
গণ্ডা গণ্ডা যোণ্ডা খাও,—তার বাছে ছার!
দাম শুনে গরীবের কালঘাম ছোটে,
হাম হাম পূরে দেয় ভাগ্যবান্ পেটে।
ধন্য, হে কাবুল! ধন্য তোমার আঙ্গুর!
'বধূর অধর নয় এত সুমধুর!' (১)

(১৬৯)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।"

যামিনী কামিনী বন্ধ্যা সুমেরুর ছায়,
উপজিল তমঃ-পুত্র অন্ধকার প্রায়!
ক্রমে ক্রমে উগরায়, ক্রমে ক্ষয় পায়,
"বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।'

(১৭০)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র অন্তঃপুরে মহারাণীর সহিত কোন কারণ-বশতঃ কলহ করিয়া তাঁহাকে নানা অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে মহারাণী কহেন, "তুমি স্বামী, ভগবান্ তোমাকে বলিতে দিয়াছেন, বল বল বল।" মহারাজ ক্রোধভরে বাহিরে আসিয়া সভায় গিয়া দেখিলেন, রস-সাগর সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। তখন রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "বল বল বল।"

---

(১) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও এইভাবে একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

রস-সাগর, মহারাজের, তৎকালীন মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বল বল বল।"

দম্পতি-কলহে স্বামী হ'য়ে ক্রোধ-মন
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন।
পতি-বাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল,
বলিতে দিয়াছে বিধি 'বল বল বল।'

(১৭১)

একদিন রাজ সভায় সমস্যা উঠিল, "বলবান্ বলি তারে মনে তেজ যার!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—বলবান্ বলি তারে মনে তেজ যার!"

এক-চাকা রথখানি সূর্য্যের সম্বল,
সারথি অরুণ যিনি, তিনিও বিকল।
একে তাঁর অশ্ব-গণ বিষম সংখ্যায়,
অশ্বের লাগাম পুনঃ মুখে বদ্ধ তায়।
লইয়াও সূর্য্য হেন দুর্ব্বল সম্বল,
আক্রমণ ক'রে দেন আকাশ-মণ্ডল!
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,
'বলবান্ বলি তারে মনে তেজ যার!'

(১৭২)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু লইয়া স্বীয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই তৎকালে বসন্ত-কালের নিরতিশয় প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! বসন্ত-কালের নিন্দা

করিয়া আপনাকে একটী কবিতা রচনা করিতে হইবে।” ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, “বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!” রস-সাগর তখনই ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—“বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!

(বসন্ত-কালের প্রতি কুল-গাছের উক্তি)

দুরন্ত বসন্ত! তব অন্ত পাওয়া ভার,
কেবা দিল ‘মধু-মাস’ নামটী তোমার!
বিরহী পুরুষ, কিবা বিরহিণী নারী
তোমার জ্বালায় জ্বলে চিরদিন ধরি’!
থাকুক্ পরের কথা,—কহি নিজ কথা,
শুনিলে তোমার নাম পাই বড় ব্যথা!
তুমি আসিলেই হায় যত তরু-গণ
সুন্দর পল্লব পত্র ধরে অগণন!
আমি ক্ষুদ্র কুল-গাছ! কি বলিব হায়,
ডাল পালা কাটে লোক, মাথাটী মুড়ায়!
এ রস-সাগর তাই কহিতেছে সার,—
‘বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!’

(১৭৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মনে কোনরূপ কষ্ট হইলেই তিনি তাঁহাকে দিয়া সমস্যা পূরণ করাইয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি রস-সাগরকে বলিলেন, “বহু গুণ আছে, তাই আদর তোমার!” রস-

সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াও চন্দন-বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিনীত-ভাবে এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"বহু গুণ আছে, তাই আদর তোমার!"

শুন হে চন্দন! তুমি কর অবধান,—
পর্ব্বতের সানু-দেশে তব জন্ম-স্থান।
কিছুই ত নও তুমি কাষ্ঠ ভিন্ন আর,
'বহু গুণ আছে, তাই আদর তোমার।'

(১৭৪)

একদিন রাজসভায় সমস্যা উঠিল, "বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর!

বাঙ্গালার জল বায়ু অতি চমৎকার,—
একবার সেবিলেই চক্ষু অন্ধকার।
ম্যালেরিয়া ছারখার করিল এ দেশ (১)
ধনে প্রাণে ক'রে দিল মানুষের শেষ।
গলা ছিনে, পেট মোটা, পীলে'ভরা তায়,
চক্ষু দুটী ঢুকিয়াছে কোটরেতে হায়।
এক মুটা অন্ন হেতু দুয়ারে দুয়ারে
চাকরীর উমেদারী করিবারে ঘুরে।

(১) রস-সাগর মহাশয়ের জীবিত-কাল ১১৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৫১ বঙ্গাব্দ। তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগরে "ম্যালেরিয়া জ্বর" ছিল কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। পরম-পূজ্যপাদ কবি-কুল-তিলক নবদ্বীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, রস-সাগর মহাশয়ের সময়ে কৃষ্ণনগরে "ম্যালেরিয়া জ্বর" আবির্ভূত হয় নাই।—গ্রন্থকার

মাসে মাসে আসে যাহা, না তাহে কুলায়,
কুড়ি দিন কাটে কষ্টে,—পরে নিরুপায়।
স্বদেশী ফ্যাসান্ ছাড়ি' বিদেশী ফ্যাসান্
ভাল বলিয়াই তার মনে অভিমান।
দিশি চা'ল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চা'ল
লইয়া বাঙ্গালী বাবু ঘটালে জঞ্জাল।
বিলাতের ভাল টুকু করি' পরিহার
মন্দ টুকু লইয়াই মত্ত অনিবার।
পৈতৃক মাছের ঝোল ভাল না লাগিল,
কুক্কুটের বংশাবলী ধ্বংস করে দিল।
বাবুয়ানা ষোল আনা, দেনায় অস্থির,
ষোল আনা মিথ্যা বলি' সাজে যুধিষ্ঠির।
ধন্য ওহে কলিকাতা! এই বুঝি আমি,—
যত কিছু ফ্যাসানের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর!'

(১৭৫)

একদা রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, "বাছা বাছা বাছা।" রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"বাছা বাছা বাছা।"

কপ্‌নি প'রে অদ্বৈত দেখাইলেন পাছা,
অবধৌত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা।
গৌরাঙ্গ মুড়াইলেন চাঁচর চুলের গোছা,
তোরা তিন জনেই বৈরাগী হলি 'বাছা বাছা বাছা।'

(১৭৬)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে রাজ-বাটীতে সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী না থাকায় রাজ-সংসারের নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। মহারাজের বংশধর-গণ তৎকালে হরধাম, আনন্দধাম, শিব-নিবাস প্রভৃতি স্থানে গিয়া বসতি করিতেছিলেন। তৎকালে হরধামে রাজা গঙ্গেশ-চন্দ্র অবস্থিতি করিতেন। তিনি সম্পর্কে মহারাজের খুড়া ছিলেন এবং বাজপেয়-যজ্ঞ না করিয়াও "বাজপেয়ী"-উপাধি-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ নামের সহিত "বাজপেয়ী" শব্দটী যোগ করিয়া লিখিতেন। এজন্য মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র তাঁহাকে "বাজপেয়ী খুড়া" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি রাজ-বাটীতে কর্ম্ম করিতে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজবাটীর কর্ম্ম-কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি রাজ-বাটীতে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ-বাটীর অবশিষ্ট মহামূল্য দ্রব্য-সামগ্রী গুলি আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করেন। তিনি প্রকৃত-পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "বাজপেয়ী খুড়া"। তখন রস-সাগর, উক্ত গুণধর খুড়া মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন। (১)

সমস্যা—"বাজপেয়ী খুড়া।"

নবদ্বীপের অধিপতি নৃপতির চূড়া,
কত ইন্দ্র চন্দ্র এই দরজায় খেয়ে গেছেন হুড়া।

---

(১) "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

সকল নিলে লুটে পুটে রাখ্‌লে না এক গুঁড়া,
না বিইয়ে কানাই এর মা 'বাঁধপেয়ী খুড়া।'

(১৭৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র, স্বীয় বৈবাহিক ও রস-সাগরকে লইয়া নানা প্রকার পরিহাস ও কৌতুক করিতে ছিলেন। কথায় কথায় বৈবাহিক মহাশয় কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনাকে একটী সমস্যা দিব। তাহা আপনাকে এখনই পূরণ করিতে হইবে। ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বারাণসী পরিহরি' ব্যাসকাশী-বাস।" রস-সাগর, বৈবাহিক মহাশয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিম্ন-লিখিত কবিতায় এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বারাণসী পরিহরি' ব্যাসকাশী-বাস!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

বৃন্দাবন পরিহরি' হরি! মথুরায়
কুব্জারে বসালে বামে,—লজ্জা নাহি তায়!
কুবুজার শ্রীচরণে সঁপিয়াছ মন,
কি গুণে করিলে গুণ, হে রাধা-রমণ!
কুবুজার বাঁকা অঙ্গ, তুমি বাঁকা শ্যাম,
বাঁকায় বাঁকায় মিলে, ওহে গুণধাম!
কিশোরীর কি শরীর ভাবিয়া দেখ না;
তার সঙ্গে কুবুজার হয় কি তুলনা!
দাঁড়কাক পুষিয়াছ ছাড়ি' শুক-সারী,
হৃদয়-পিঞ্জরে তারে রাখিয়াছ ধরি'।

যাহারে দেখিলে হয় নারীতে কুরুচি,
তোমার প্রেমের গুণে সেও হ'ল শুচি!
কুবুজা নয়ন-তারা হইল তোমার,
অঘটন ঘটাইলে,—সুন্দর বিচার!
হেন অপরূপ প্রেম শিখিলে কোথায়,
মেথরাণী রাণী হ'ল আজ মথুরায়!
প্যারীকে ত্যজিয়া শেষে কুব্জায় প্রয়াস,
'বারাণসী পরিহরি' ব্যাসকাশী-বাস!'

(১৭৮)

একবার কৃষ্ণনগরের রাজ-সভায় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের এক জন নিকট আত্মীয় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বাহবা বাহবা বাহবা জী"। রস-সাগর তাহা এইভাবে তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"বাহবা বাহবা বাহবা জী।"

১ম পূরণ।

রাধা কলঙ্কিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি,
জানি বৈদ্যরাজ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, পূরিলা শ্রীহরি,
ভাসুর ঝি তায় ভাসুর বি॥
তব কৃপা হরি, এ কুম্ভ ঝাঝরি,
পূরিয়া সে বারি আনিয়াছি।
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া,
'বাহবা বাহবা বাহবা জী।'

কথিত আছে যে, উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে রস-সাগর মহাশয় মাতা-পিতৃ-কার্য্য করিবার জন্য একবার ৺গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। ৺বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে পিণ্ড-দান-কালে অত্যন্ত জনতা হইয়া থাকে। রস-সাগর মহাশয় সেই বিষম জনতা অতিক্রম করিয়া ৺পিণ্ড-দান-স্থানে উপস্থিত হওয়ায় এক জন গয়ালী ক্রোধ-ভরে কহিলেন, "বাহবা বাহবা বাহবা জী"। রস-সাগর তাঁহাকে হিন্দুস্থানী দেখিয়া হিন্দী ভাষাতেই এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে গয়ালী মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত কবিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"বাহবা বাহবা বাহবা জী।"

২য় পূরণ।

এক চরণ তব গয়াসুর-মুণ্ডে
পিণ্ড দেনে উধারণ জী।
দুস্‌রা চরণ কা ধূলি মে
অহল্যা পাষাণ মানব জী॥
তিস্‌রা চরণ ঘাম্‌ছে
জগত্তারণ উধারণ গঙ্গা জী।
তেরা পাঁওমে গোড়োয়া লাগে
'বাহবা বাহবা বাহবা জী।'

(১৭৯)

শান্তিপুর-নিবাসী কোন এক গোস্বামী মহাশয় একদা রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দেন;—"বাহিরে সরল কিন্তু ভিতরে গরল।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বাহিরে সরল, কিন্তু ভিতরে গরল!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার উক্তি)

শুন প্রাণের কানাই শুন প্রাণের কানাই
শ্যামচাঁদে কহিছেন রসময়ী রাই।
বসায়ে বাঁকার হাট বসায়ে বাঁকার হাট
কত রঙ্গ কর হরি! একি তব ঠাট্!
ললাটে অলকা-চয় ললাটে অলকা-চয়
বাঁকাভাবে আঁকা তব ওহে রসময়!
চরণে নূপুর রাজে চরণে নূপুর রাজে
বাঁকা ক'রে ধ'রে আছ চরণ-সরোজে!
শিখি-পুচ্ছ কি সুন্দর শিখি-পুচ্ছ কি সুন্দর
তাও হরি! বাঁকা করি' ধর নিরন্তর!
বাঁকা আঁখি, বাঁকা ঠাম্ বাঁকা আঁখি, বাঁকা ঠাম্
সকলি তোমার বাঁকা, ওহে গুণ-ধাম!
বাঁকা প্রাণ, বাঁকা মন বাঁকা প্রাণ, বাঁকা মন
অবলার প্রতি তব বাঁকা আচরণ!
শুধু বাঁশীটী সরল শুধু বাঁশীটী সরল
'বাহিরে সরল কিন্তু ভিতরে গরল!'

(১৮০)

একদিন এক পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরের রাজ-সভায় গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন, "বিদ্বানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান।" রস-সাগর এইরূপে ইহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"বিদ্বানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান।"

প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকল,
মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কেবল।
ব্রাহ্মণ-গণের শ্রেষ্ঠ যে জন বিদ্বান্,
'বিদ্বানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান।'

(১৮১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের পিতা ও মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র মহারাজ ঈশ্বর-চন্দ্র তাদৃশ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন না থাকায় শিবচন্দ্র দুঃখ করিয়া মধ্যে মধ্যে কহিতেন, "বিদ্যা না রহিল যদি কি ফল জীবনে!" রস-সাগর গিরীশ-চন্দ্রের মুখে এই কথাটী শুনিয়া ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে কি ফল জীবনে?"

বিদ্যায় কি ফল, যদি কবিত্ব না রয়,
দান যদি নাহি রয়, ধনে কিবা হয়?
দয়া যদি নাহি থাকে, কিবা ধর্ম্মে মতি?
নৃপে কিবা ফল, যদি নাহি তার নীতি?
পুত্রে কিবা ফল, যদি না থাকে বিনয়?
পতি ভক্তি না থাকিলে পত্নীতে কি হয়?
গঙ্গাতীরে না মরিলে কি ফল মরণে?
'বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে কি ফল জীবনে?

(১৮২)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি দেখিতে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; কিন্তু ইহার

কথায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গেল যে, ইনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তখন মহারাজ রস-সাগরকে কহিলেন, "বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য মহা-বিড়ম্বন!" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য,—মহা-বিড়ম্বন!"

হরি-হীন শেষ-নাগ, গঙ্গাহীন দেশ,
তৈল-হীন কেশপাশ, ঊর্ণা-হীন মেষ।
ভূমি-হীন ভূমি-পতি, গন্ধ-হীন ফুল,
নারী-হীন অট্টালিকা, পুত্র-হীন কুল।
বারি-হীন সরোবর, ধর্ম্ম-হীন জন,
'বিদ্যা-হীন ভট্টাচার্য্য,—মহা-বিড়ম্বন!'

(১৮৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ-গণের সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "বিশ-লাখি দায়।" তখন রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"বিশ-লাখি দায়।"

বিশ-লাখি দায় বড় সুবিষম দায়,—
তার চেয়ে দায় নাহি ছিল বাঙ্গালায়।
কৃষ্ণচন্দ্র, রঘুরাম ও রামজীবন,
বিশ-লাখি দায়ে পড়ি' হন জ্বালাতন।
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে দিলা পরোয়ানা,—
"আরো দিবে বার লক্ষ টাকা নজরাণা।"

একে একে তিন জনে নবাব-সংসারে
রাখিলেন আলিবর্দ্দী বন্দী করি ঘরে।
ক্রমে নিজ গুণে কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়
হইলেন নবাবের প্রিয় অতিশয়।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবাবের কাছে
বিদ্যাবুদ্ধি দেখাতেন যাহা কিছু আছে।
উর্দ্দুতে তর্জ্জমা করি' ভারত পুরাণে
শাস্ত্রালাপ করিতেন নবাবের সনে।
আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব বাঙ্গালার পতি,
কলিকাতা যাইবার করিলেন মতি।
ভক্ষ্য ভারি' বজ্‌রা করি' লয়ে আসবাব
সঙ্গিগণে সঙ্গে করি চলেন নবাব।
কৃষ্ণচন্দ্রে লইলেন আপনার সনে,
আপ্যায়িত হইলেন রাজা মনে মনে।
রাজা দেখালেন আসি' পলাশীর কাছে,
জল নাই, প্রজা নাই, বন হ'য়ে আছে।
দেখালেন নবদ্বীপ ভরা বাঁশবনে,
কুটীর কয়েক খানি মাত্র সেই খানে।
ক্রমে হইলেন কলিকাতা-উপস্থিত,
ইহার দুর্দ্দশা দেখি' নবাব স্তম্ভিত।
উত্তরে গঙ্গার ধারে মাত্র কয় জন,
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে শুধু বাদা-বন।
নবাবের সঙ্গিগণ কন্ পরস্পর
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু এখানে বিস্তর।

আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে কহেন তথা,
রাজ্যের অবস্থা তব করিনু দর্শন।
কারাগারে বন্দী আছ, দুঃখ কিবা তায়,
মাফ্ করিলাম তব 'বিশ-লাখি দায়।'

[প্রস্তাব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবন এবং পিতামহের অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা রামকৃষ্ণ এই তিন জন নির্দ্ধারিত রাজস্ব নবাব-সরকারে জমা না দেওয়াতে তাঁহাদের ২০ লক্ষ টাকা দেনা হয়। ইহার মধ্যে তদীয় পিতামহ রামজীবন ও পিতা রঘুরাম ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দেনা থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই এই ১০ লক্ষ টাকার দায়ী হন। এতদ্ব্যতীত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নজরাণা বলিয়া তাঁহার নিকটে ১২ লক্ষ টাকার দাবী করেন। এই নজরাণার টাকা দিতে না পারায় আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে নিজ-গৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। মহারাজের জমীদারী মহারাষ্ট্রীয়-গণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওয়াতে প্রজাগণের এত দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, তাহারা মহারাজকে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্পূর্ণ-রূপে অসমর্থ হইয়াছিল। মহারাজ কারাগারে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া দেনা পরিশোধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্তোষ-জনক পরামর্শ প্রদান করিতে পারিলেন না। রঘুনন্দন সর্ব্বাধিকারী জাতিতে কায়স্থ। তিনি মহারাজের এক জন সামান্য কর্ম্মচারী হইয়াও তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! যদি কিছুদিনের জন্য আপনার অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি মহারাজকে এই বিপদ্

হইতে উদ্ধার করিতে পারি।” ইহা বলিয়া তিনি যে উপায়ে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। বিচক্ষণ মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেওয়ানী-পদ প্রদান ও স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার পুত্র, জামাতা ও ভাগিনেয়-গণ জমীদারীর অনেকাংশ ইজারা রাখিয়া স্বেচ্ছামত কর প্রদান করিতেন। দেওয়ানেরা তাঁহাদের উপরি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহাদের নিকটে অনেক টাকা খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। রঘুনন্দন কৌশল-ক্রমে তাঁহাদের উপরি মহারাজ-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া নবাব-সরকারে জমা দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। রঘু-নন্দনেরই যত্নে ও বুদ্ধি-কৌশলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আলিবর্দ্দী খাঁর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনই কিয়দ্দিন পরে আলীবর্দ্দীর দেওয়ান মাণিকচাঁদের বিষম বিরাগ-ভাজন হন, এবং তাঁহারই আদেশে কামানের গোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নজরাণার টাকা দিয়া, নবাবের কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পিতামহ ও পিতার দেয় রাজস্ব ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা মাত্র পরিশোধ করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রই দায়ী ছিলেন। এই টাকা দিতে না পারায় তিনি আরও একবার আলিবর্দ্দীর কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নবাব মহারাজের গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন।

তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। বিশেষতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তিনি শাস্ত্রালাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ গুলি উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। এই কয়েক লক্ষ টাকা মাফ্ পাইবার জন্য মহারাজ নবাবের নিকটে অনেক অনুনয়-পূর্ব্বক আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু-মাত্র ফলোদয় হয় নাই।

এই সময়ে নবাব জলপথে কলিকাতার দিকে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মহারাজও তাঁহার অনুগামী হইবার প্রার্থনা করিলেন। নবাব আহ্লাদ-সহকারে তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সঙ্গিগণ ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া নবাব মহা-সমারোহে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন। সুবিখ্যাত পলাশী-ক্ষেত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্গত। নবাবের পোতাবলী পলাশীর নিকটে আসিলে মহারাজ কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমার পলাশী-পরগণার অবস্থা একবার কৃপা করিয়া দেখুন। কোন স্থান জলশূন্য, কোনও স্থান বনাকীর্ণ, কোনও স্থান অনুর্ব্বর। ইহা হইতে রাজস্বের পরিমাণে অর্থ-সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।" ক্রমে ক্রমে নবাবের পোতাবলী নবদ্বীপের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাজ কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমার জমীদারীর মধ্যে নবদ্বীপ সর্ব্ব-প্রধান। ইহার ভিতরে একখানিও পাকা বাড়ী নাই। কয়েক খানি মাত্র তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। আমি কিরূপ ভাগ্যবান্, এই গ্রামই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নবাব ইহা শুনিয়া কোন কথাই কহিলেন না। অবশেষে নবাবের পোতাবলী কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে কলিকাতা এক খানি

সামান্য গ্রাম-মাত্র ছিল। ইহার কেবল উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে কয়েকটী লোকের বসতি ছিল, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ সম্পূর্ণ-রূপে বাদা-বনে সমাচ্ছন্ন ছিল। স্বীয় জমীদারী কলিকাতার পূর্ব্ব ভাগের অবস্থা কিরূপ, তাহা নবাবকে একবার দেখাইবার জন্য মহারাজ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অরণ্য! এই সময়ে মহারাজের শিক্ষানুসারে নবাবের সঙ্গিগণ কহিতে লাগি-লেন, এ স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিষম ভয় আছে। ইহা শুনিয়া নবাব ফিরিয়া আসিবার আদেশ দিতেছেন, এমন সময় মহারাজ পুনর্ব্বার কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিলেন, তবে কৃপা করিয়া আরও একটু চলুন।" তখন সহৃদয় আলিবর্দ্দী কহিলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। অদ্য তোমাকে পৈতৃক দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম।" মহারাজও নবাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নদীয়া জেলায় উক্ত টাকার দায়, রাজাদের "বিশ-লাখি দায়" বলিয়া প্রসিদ্ধ।] (১)

(১৮৪)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগর মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আহার করাইতে ছিলেন। রস-সাগর অত্যন্ত আম্র-ভক্ত ছিলেন। তিনি একে একে আকণ্ঠ আম্র-ভক্ষণ করিয়া যুবরাজকে

(১) "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" গ্রন্থ হইতে সারাংশ লইয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

কহিলেন, "বিষয়-তৃষ্ণার মত বড়" কিছু নাই!" তখন যুবরাজ তাঁহাকে স্বীয় সমস্যাটী পূরণ করিতে আদেশ করায় তিনি ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বিষয়-তৃষ্ণার মত বড় কিছু নাই!"

পর্ব্বত অত্যন্ত বড়,—কেনা তাহা জানে,
তা হ'তে সমুদ্র বড়,—হেন লয় মনে।
সমুদ্র হ'তেও বড় অনন্ত গগন,
তা হ'তেও বড় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
পূর্ণ-ব্রহ্ম হইতেও বড় বস্তু আছে,
তাহার বিষয়-তৃষ্ণা নামটী র'য়েছে।
এ রস-সাগর তাই কহিতেছে ভাই,—
'বিষয়-তৃষ্ণার মত বড় কিছু নাই!'

(১৮৫)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,—"বিষ্ণুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়!" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বিষ্ণুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়!"

ওমা গঙ্গে! রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গ সকল
বিস্তারিয়া বিষ্ণু-পদে থাক অবিরল।
পরম আদরে থাকি' শিবের মাথায়
কি অপূর্ব্ব শোভা মাগো! ধ'রে থাক তায়।
তাই বলি ওমা গঙ্গে! তোমায় যখন
এই দেহ খানি মোর করিব অর্পণ,

দেখ মা! শিবত্ব মোরে দেওয়া যেন হয়,
'বিষ্ণুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়!' (১)

[ব্যাখ্যা। অন্তিম কালে পতিত-পাবনী গঙ্গা-দেবীর গর্ভে দেহ-ত্যাগ করিতে পারিলে মনুষ্য শিবত্ব বা বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রীয় কথা। এই দ্বিবিধ পদার্থই নশ্বর মানবের চির-প্রার্থনীয় ধন। কিন্তু গঙ্গা-ভক্ত সাধক কবি এই কবিতায় বিষ্ণুত্ব প্রার্থনা না করিয়া শিবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। শিবত্ব লাভ করিলে তিনি গঙ্গা-দেবীকে পরম-সুখে মস্তকে ধারণ করিতে পারিবেন, কিন্তু বিষ্ণুত্ব লাভ করিলে অবশ্যই তাঁহাকে বিষম-কষ্টে চরণে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। এই হেতুই কবি এই কবিতায় গঙ্গা-দেবীর নিকটে বিষ্ণুত্ব কামনা না করিয়া শিবত্ব কামনা করিতেছেন।]

(১৮৬)

একদিন রস-সাগর মহাশয় সভায় বসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রকে স্বীয় সাংসারিক দুরবস্থার কথা জানাইতেছিলেন। মহারাজ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আপনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক।

(১) মৎপ্রণীত "স্তব-সমুদ্রঃ (প্রথম-প্রবাহঃ)" নামক গ্রন্থে অনেক গুলি সংস্কৃত স্তব বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদ সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দরাফ খাঁ নামক এক জন ভক্ত মুসলমান কবির একটী গঙ্গা-স্তব আছে। এই স্তবের দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্ত খাঁ-সাহেব যে ভাব সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, রস-সাগর মহাশয়েরও কবিতায় সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁ-সাহেবের রচিত শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

"অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি শশিশেখরমৌলিমালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণসময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা॥"

অতএব জগদম্বার দরবারে দুঃখের আরজি দিয়া আসিলে অবশ্যই তিনি আপনার প্রতি সুবিচার করিবেন।" এই কথা শুনিবামাত্র রস-সাগর মহাশয় দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, "বুঝিলাম যে বিচার করিবেন কালী।" তখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, আপনার সমস্যা আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন। মহারাজের আদেশ পাইয়া রস-সাগর এইভাবে সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা।—"বুঝিলাম যে বিচার করিবেন কালী।"

মেয়ে হ'য়ে যুদ্ধ করে উলঙ্গ হইয়া,
বহায় রক্তের স্রোত চারি দিক্ দিয়া।
দয়া মায়া নাই কিছু, পাষাণের মেয়ে,
ডাকিনী যোগিনী কত সঙ্গে যায় ধেয়ে।
পতি-বক্ষে পদ রাখে, লজ্জা নাহি তায়,
লক্ লক্ করে জিহ্বা রক্তের তৃষ্ণায়।
নর-মুণ্ড-মালা গলে দোলে অবিরল,
রণ-মদে চলে যবে, কাঁপে রসাতল।
হাজির হ'য়ে আরজি দিলে পাছে দেয় গালি,
'বুঝিলাম যে বিচার করিবেন কালী।

(১৮৭)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পূরণ শুনিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, "কালীর সুবিচার অসম্ভব। এখন তাঁহার কর্ত্তার দরবারে গিয়া আরজি দিন। তাহা হইলে তাঁহার নিকটে সুবিচার হইবে।" ইহা বলিয়া মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "বুঝিলাম যে বিচার করিবেন হর।" তখন রস-সাগর এই সমস্যাটী এইভাবে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বুঝিলাম যে বিচার করিবেন হর।"

নিজে নিত্য দিগম্বর, মত্ত ধুতুরায়,
শ্মশানে বেড়ায় সদা, ভস্ম মাখে গায়।
গলায় হাড়ের মালা,—দেখে লাগে হাঁপ্,
জটার ভিতরে সাপ,—বাপ্ রে বাপ্।
সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি টুকু হ'য়েছে বিকল,
মাথার উপরে গঙ্গা করে কল কল।
ভীষণ ত্রিশূল হাতে, নন্দী ভৃঙ্গী দূত,
পিছে পিছে ধাইতেছে লক্ষ লক্ষ ভূত।
তিন চক্ষু আছে, কিন্তু ভক্তের কি ফল?
সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে তাজা, বোজা অবিরল।
হাজির হইয়া আর্জি দিতে লাগে ডর,
'বুঝিলাম যে বিচার করিবেন হর।'

(১৮৮)

একদা সমস্যা উঠিল, "বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময়।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময়।"

হরিলে পরের নারী দোষ নাহি রয়,—
এ কথা রাবণ কেন করিল প্রত্যয়!
সোণার হরিণ হয়,—কে শুনে কোথায়,
তবু রাম কেন তার পিছে পিছে ধায়!
কি কারণে পাশা খেলি' যুধিষ্ঠির রাজা
ধনে মানে পাইলেক শত শত সাজা!

এ রস-সাগর কহে হইয়া তন্ময়,—
'বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময়!'

(১৮৯)

একবার মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র হাসিতে হাসিতে সমস্যা দিলেন, "বেশ্যা রহিয়াছে বশে,—কে শুনে কোথায়!" রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে তাহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—বেশ্যা রহিয়াছে বশে,—কে শুনে কোথায়!"
কমলা অচলা রন্ কাহার বাটীতে?
রাজা হইয়াছে মিত্র কোথায় জগতে?
শরীর র'য়েছে স্থির,—কোথা শুনা যায়?
'বেশ্যা রহিয়াছে বশে,—কে শুনে কোথায়?'

(১৯০)

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। নবদ্বীপ হইতে সমাগত একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভায় বসিয়া নানা প্রকার বাগ্-বিতণ্ডা করিতে ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত হইলেও চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বৃথা বাক্য-ব্যয়-দোষে সামান্য ছাত্রদিগের নিকটেও বিচারে পরাজিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বিদায়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহারাজের সমীপে গিয়া নানা প্রকারে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ তাঁহার দাম্ভিকতা সহ্য করিতে না পারিয়া রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বেহায়ার চুপ ক'রে থাকাই মঙ্গল।" রস-সাগর মহারাজের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তীব্রভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"বেহায়ার চুপ করে ক'রে থাকাই মঙ্গল।"

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোমায় সাগর!
কত কাণ্ড হ'ল তব বুকের উপর!
লক্ষ লক্ষ দেবাসুর একত্র হইয়া
লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিল তোমায় মথিয়া।
যে সব বানর ঘুরে ফিরে ডালে ডালে,
তারাও লঙ্ঘন করি গেল পালে পালে।
নুড়ি নাড়া নুড় করি বানর বানরী
সেতু বেঁধে রেখে দিল বুকের উপরি।
অগাধ অপার তুমি, শুনি নিরন্তর,
অগস্ত্য গণ্ডূষে পূরে পেটের ভিতর।
সহ্য করিয়াও তুমি এত অপমান
এখনও প্রাণ ধরি আছ বিদ্যমান।
তৃষ্ণার্ত্ত পথিক জল খাইলে তোমার
লোণা জলে মুখখানি পুড়ে যায় তার।
ভীষণ গর্জ্জন তব, ভীষণ তরঙ্গ,
এই সব লইয়াই কর কত রঙ্গ।
মুখের সাপট্ তব পরম প্রবল,
'বেহায়ার চুপ্ ক'রে থাকাই মঙ্গল!'

(১৯১)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগর মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে এই

সমস্যাটী পূরণ করিতে হইবে।” রস-সাগর শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—“ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার!”

নন্দ-কুমারের পূর্ব্ব পুরুষ সকল
সামাজিক মর্য্যাদায় ছিলেন দুর্ব্বল।
মর্য্যাদা-বৃদ্ধির হেতু তন্ময় হইয়া
করিলেন ক্রিয়া এক আনন্দে মাতিয়া।
হেন ক্রিয়া করিলেন গৃহে তিনি আজ,
যাহা করে নাই কভু কোন মহারাজ।
এক লক্ষ ব্রাহ্মণের হ'ল নিমন্ত্রণ,
ধূমধাম হ'ল যত, কে করে গণন।
বেছে বেছে আনিলেন ভাদুর-ভবনে
কৃষ্ণচন্দ্র দয়ারাম, এই দুই জনে।
কৃষ্ণচন্দ্র রহিলেন ব্রাহ্মণ-সেবায়,
দয়ারাম রহিলেন ভাণ্ডারে সহায়।
এক লক্ষ পিঁড়া হ'ল বসিবার তরে,
মহারাজ সাজাইয়া দিলা থরে থরে।
একে একে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ বসিয়া
আহার করিলা সুখে সন্তুষ্ট হইয়া।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-কণা ল'য়ে
যতনে রাখেন রাজা ভাদুর-আলয়ে।
তুমিই বুঝিয়া ছিলে শ্রীনন্দকুমার!
‘ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার।’ (১)

(১) মহারাজ নন্দকুমারের পদ-ধূলি-সংগ্রহের বিস্তৃত বিবরণ আমার পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল মহাশয় প্রণীত “মুর্শিদাবাদ কাহিনী”তে দ্রষ্টব্য।

(১৯২)

শান্তিপুরে কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রস-সাগর নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী রস-সাগরকে বলিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহাই সেবা করুন। তখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ব্রাহ্মণের প্রতি চির-কালই লক্ষ্মীর বিষদৃষ্টি।" গৃহস্বামী কহিলেন, "ব্রাহ্মণের বাটী নাহি করি পদার্পণ।" রস-সাগরও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ব্রাহ্মণের বাটী নাহি করি পদার্পণ।"

(নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর আক্ষেপোক্তি)

পিতা মোর রত্নাকর, পিতা মোর রত্নাকর,
অগস্ত্য পূরিল তাঁরে পেটের ভিতর।
তুমি পতি চির সাথি তুমি পতি চির সাথি
ভৃগু-মুনি বুকে তব মেরে দিল লাথি।
মোর ভারতী সতীন মোর ভারতী সতীন
ব্রাহ্মণেরা তার গুণ গায় প্রতিদিন।
পূজিবারে উমাপতি পূজিবারে উমাপতি
পদ্মবন ছিঁড়ি মোর বাড়ায় দুর্গতি।
মনে কষ্ট অহর্নিশ মনে কষ্ট অহর্নিশ
ব্রাহ্মণ সকল মোর দু-চক্ষের বিষ।
তাই ওহে নারায়ণ! তাই ওহে নারায়ণ!
'ব্রাহ্মণের বাড়ী নাহি করি পদার্পণ!'

(১৭৩)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক ভৃত্য প্রভুর প্রতি নানা প্রকারে বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রকাশ করিয়াছিল। একদিন তিনি কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! বিশ্বাস-ঘাতক লোককে আমি শাস্তি দিতে পারি কি না?" ইহা শুনিয়া রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভগবান্ শাস্তি দেন বেইমান্ জনে!" তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনিই পূর্ণ করুন।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর এই সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ভগবান্ শাস্তি দেন বেইমান্ জনে!"

জিহ্বা নামে এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী দেখা যায়,
দয়ালু কোমলা তার মত কে কোথায়!
বত্রিশ দন্তই তার কনিষ্ঠ সোদর
দিদিরে ঘেরিয়া সবে আছে নিরন্তর।
ভাই গুলি ছোট ছোট,—করিয়া দর্শন
করিতে লাগিল জিহ্বা তাদের পালন।
তাহাদের কোনরূপ কিছু কষ্ট হ'লে
দূর ক'রে দেয় তাহা জিহ্বা কুতূহলে।
দন্ত গুলা ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়,
পরম কঠিন তত হয় সুনিশ্চয়।
সময় পাইয়া তারা অমনি তখন
দিদিরে দংশন করি' করে জ্বালাতন।
সুকোমলা দয়াবতী জিহ্বা খানি হায়
সব সহ্য করে,—শাপ দিতে নাহি চায়।

ঈশ্বর এ সব কাণ্ড হেরি' অনিবার
অবশেষে ক'রে দেন সূক্ষ্ম সুবিচার,—
দন্ত-গুলা একে একে সব যায় ন'ড়ে,
একটাও নাহি থাকে,—শেষে যায় প'ড়ে!
হায় রে জিহ্বার কিন্তু ধ্বংস নাহি হয়,
অন্তিম কালেও তাহা একরূপ রয়!
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে মনে,—
'ভগবান্ শাস্তি দেন বেইমান্ জনে।

(১৯৪)

একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন:—"ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!"

অতি ভয়ঙ্কর এই সংসার-সাগর,—
বিষয়-বাসনা-জল তৃষ্ণা নিরন্তর;
বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ মদন-পবন,
সর্ব্বদা উঠিছে মোহ-তরঙ্গ ভীষণ;
গৃহিণী-আবর্ত্ত পাক দিতেছে কেবল,
ভাসিছে দুরন্ত পুত্র-কুম্ভীর সকল;
মধ্যে মধ্যে দেয় কন্যা-হাঙ্গর দর্শন,
ভীষণ জামাতৃ-সর্প করিছে গর্জ্জন;
জ্ঞাতি-বাড়বাগ্নি কিবা দিতেছে উত্তাপ,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে বাপ রে বাপ!

সমস্ত জ্ঞয়ের বস্তু র'য়েছে তথায়,
রস-সাগরের রস বুঝি বা শুকায়;
এ হেন সাগরে মগ্ন আছি হে সদাই,
'ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!'

(১৯৫)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র বাটীর ভিতরে নারায়ণ-পূজা করিয়া সভায় আসিয়া সম্মুখেই রস-সাগরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন, "ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট হন্ নারায়ণ!" রস-সাগর মহারাজের অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট হন্ নারায়ণ!"

ব্যাধ ভুলাইল কোন্ শিষ্ট আচরণে!
ধ্রুবের বয়স্ কিবা ভেবে দেখ মনে!
গজ-মূর্খ যে গজেন্দ্র, বিদ্যা কিবা তার!
কুব্জার কি রূপ ছিল,—ভাব একবার!
দরিদ্র সুদাম হায় কি করিল দান!
দাসী-পুত্র বিদুরের কিবা কুল মান!
কি পৌরুষ ছিল উগ্র-সেনের শরীরে!
সকলেই গেলা কিন্তু শেষে স্বর্গ-পুরে।
এ রস-সাগর তাই বুঝেছে এখন,—
'ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট হন্ নারায়ণ!'

(১৯৬)

একবার মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "তাড় লো এইবার।"

রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই-ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ভাঙ্‌লো এইবার।"

একদা মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ
নিজ গৃহে সভা করি' করেন বিরাজ।
রাজা মহারাজ যত ছিলেন যেখানে,
একে একে আসিলেন নবাব-ভবনে।
লইয়া গোপাল ভাঁড়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায়
উপস্থিত হইলেন নবাব-সভায়।
নৃপগণ সভাভঙ্গ হইবার পর
আপন আপন গৃহে ফিরিতে তৎপর।
তৎকালে বেগমেরা উপর হইতে
নিম্ন-দিকে লোক-গণে লাগিলা দেখিতে।
তখন গোপাল ভাঁড় অবাক্ হইয়া
বেগমদিগের দিকে রহে তাকাইয়া।
এই কথা শুনিয়াই নবাব তৎক্ষণে
ক্রোধ-ভরে কহিলেন আরক্ত-লোচনে,
"এখনি গোপাল ভাঁড়ে আনহ ধরিয়া
বিধিমতে শাস্তি তারে দিব বিচারিয়া।"
যখন গোপাল ভাঁড় সভায় আসিল,
সভাস্থ সকল লোক হাসিতে লাগিল।
এক জন কহিলেন—"রক্ষা নাই আর,
গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড় 'ভাঙ্‌লো এইবার।'"

[প্রস্তাব। কোন কারণ-বশতঃ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা খাঁর-

রাজধানী মুরশিদাবাদে একবার সভা করিয়া বাঙ্গালা-প্রদেশের যাবতীয় রাজা ও মহারাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও যাইতে হইয়াছিল। গোপাল ভাঁড়ও নবাব-বাড়ী দেখিবার জন্য মহারাজের সঙ্গে মুরশিদাবাদ গিয়াছিল। সভা-ভঙ্গের পরে যখন রাজা ও মহারাজ-গণ বাটীতে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, তখন নবাবের বেগমেরা কৌতূহল-বশতঃ উপরে দাঁড়াইয়া নিম্ন-দিকে তাঁহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। গোপাল রগড় ছাড়িবার লোক নহে। সে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে গুপ্তভাবে বেগমদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এই বিষয় নবাবের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি ক্রোধভরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে লোক পাঠাইলেন। তখন মহারাজ ভীতচিত্ত হইয়া গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি তোমারই কাণ্ড?" গোপাল নির্ভয়-চিত্তে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এত বড় মহৎ কর্ম্ম আর কে করিতে পারে? ঠাকুর! আপনি এজন্য চিন্তিত হইবেন না।" ইহা বলিয়া গোপাল নবাবের প্রেরিত লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নবদ্বীপের রাজার লোক নবাবের বেগমদিগের প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়াছে, এবং প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত নবাবের লোক তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, এই জন-রব নগরের চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অনন্তর গোপাল নবাবের নিকটে নীত হইলে সভাস্থ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা গোপালকে চিনিতেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এইবার ভাঁড় ভাঙ্গিল।" নবাব ক্রোধভরে ও আরক্ত-নয়নে গোপালের দিকে চাহিবামাত্র গোপালও প্রথমতঃ নবাবের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল, এবং তৎপরে সভাস্থ সকল লোকেরই প্রতি সেইরূপ করিতে

লাগিল। নবাব তাহার তীব্র কটাক্ষ-পাত স্বাভাবিক বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

(১৯৭)

একদিন রাত্রিকালে রস-সাগর মহাশয় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বাটীতে আকণ্ঠ আহার করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে অসুস্থ-শরীরে রাজ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজবৈদ্যও তৎকালে রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! গত কল্য রাত্রিকালে আকণ্ঠ আহার করিয়া অদ্য প্রাতঃকালে কিরূপ আছেন?" রস-সাগর কহিলেন, "কবিরাজ মহাশয়! 'জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ'।" তখন মহারাজ রস-সাগরকে কহিলেন, "ভোজন সার্থক, যদি অন্ন জীর্ণ হয়।" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে এইভাবে এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ভোজন সার্থক, যদি অন্ন জীর্ণ হয়।"

জনম সার্থক, যদি ধর্ম্মে মন মজে,
করম সার্থক, যদি কৃষ্ণ-পদ ভজে।
শরীর সার্থক, যদি ব্যাধি-শূন্য হয়,
বিদ্যাও সার্থক, যদি রহিল বিনয়।
গৃহিণী সার্থক, যদি গৃহকর্ম্ম করে,
রূপসী সার্থক, যদি গুণে মন হরে।
বিষয় সার্থক, যদি দান তাহে রয়,
'ভোজন সার্থক, যদি অন্ন জীর্ণ হয়।'

(১৯৮)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক জন বয়স্য প্রশ্ন করিলেন, "মক্ষি-

কার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন।” রস-সাগর অবলীলা-ক্রমে তখনই এই জটিল প্রশ্নটীর উত্তর দান করিলেন :—

সমস্যা—“মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন।”

যশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জৃম্ভন,
লীলাচ্ছলে মুখমধ্যে দেখান্ ত্রিভুবন।
পতঙ্গ-পরশে ব্যস্ত-মস্তক-হেলন,
‘মক্ষিকার পদাঘাতে কাঁপে ত্রিভুবন।’

[ব্যাখ্যা। মাতা শ্রীমতী যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণ মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটী মক্ষিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখের উপরি বসিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কম্পিত হইয়া উঠিলে তাঁহার মুখ-মধ্য-স্থিত ত্রিভুবনও সেই সঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল।]

(১৯৯)

রস-সাগরের এক বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, “মদনের মত কিন্তু নাই ধনুর্দ্ধর।” রস-সাগরের রসের ভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। তিনিও সরস-ভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—“মদনের মত নাহি আছে ধনুর্দ্ধর!”

পাইয়া পিনাক-ধনুঃ ওহে ত্রিলোচন!
পেয়েছ “পিনাকী” নাম,—জানে ত্রিভুবন।
ধরিয়া গাণ্ডীব-ধনুঃ হে অর্জ্জুন! বীর
ধরেছ “গাণ্ডীবী” নাম,—বুঝিয়াছি স্থির।
তোমাদের ধনুর্ব্বাণ ভারী অতিশয়,
সহজে তুলিবে তাহা,—শক্তি কার রয়?
এক খানা বস্তু কেটে করে দুই খানা,—
এই ত বাণের গুণ,—আছে বেশ জানা!

মদনের ফুল-ধনু, ফুল-বাণ আর,
অতিশয় লঘু,—গন্ধে মাতে ত্রিসংসার।
মদন-বাণের গুণ মনে বেশ জানি,—
দুই খানি কাটা বস্তু করে এক খানি।
তাই বলে কুতূহলে এ রস-সাগর,—
'মদনের মত নাহি আছে ধনুর্দ্ধর!'

(২০০)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র জানিতেন যে, রস-সাগর মহাশয় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বলিয়া কর্কটের (কাঁকড়ার) প্রতি তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। এজন্য মহারাজ একদিন পরিহাস-চ্ছলে হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মর্কট বুঝিবে কিসে কর্কটের রস!" তিনি রস-সাগরকে আরও বলিয়া দিলেন যে, আপনাকেই নিন্দা করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে হইবে। চতুর-চূড়ামণি রসিক-রাজ রস-সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"মর্কট বুঝিবে কিসে কর্কটের রস!"

কাঁকড়ার মত কিবা আছে ভূমণ্ডলে,
বলকর বায়ুহর পিত্তহর খেলে।
পরম প্রণয় তার অলাবুর সনে,
রসনায় আসে রস নাম তার শুনে।
প্রাণ ভ'রে শাঁস খাও ফেলে দিয়ে খোসা,
দাড়া কিবা সুমধুর যদি যায় চোষা।
খাসা নাহি বলে ইহা যেই জন চাষা,
ভালবাসা কত তার যদি খায় মাসা।

কর্কট খাইলে লোক আনন্দে অবশ,
'মর্কট বুঝিবে কিসে কর্কটের রস!' (১)

(২৭১)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে হাসিতে হাসিতে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"মহাপাপ যার, তার বৈকুণ্ঠে গমন!" বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে রস-সাগরের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মহাপাপ যার, তার বৈকুণ্ঠে গমন!"
মুরশিদ-কুলী খাঁর দৌহিত্রীর পতি,
সাইয়দ্ রজা খাঁর আছে এক খ্যাতি!
বাঙ্গালা-দেশের তিনি ছিলেন দেওয়ান,
দ্বিতীয় "বৈকুণ্ঠ" তিনি করেন নির্ম্মাণ!
"বৈকুণ্ঠ" নরক-কুণ্ড,—মুণ্ড ঘুরে যায়,
হৃৎকম্প হয় পুনঃ স্মরিলে তাহায়।
জমীদার-গণে শাস্তি দিইবার ছলে
মনুষ্য-সমান খাত রচিয়া কৌশলে,
মল-মূত্র যাহা কিছু পূতিগন্ধময়,
শুনিলে যাদের নাম হৃৎকম্প হয়,
সে সব দুর্গন্ধ বস্তু একত্র করিয়া
রাখিয়া দিতেন সেই খাতেই পূরিয়া।

---

(১) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও এ সম্বন্ধে কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

যে সকল জমীদার যথাকালে কর
দিতে নাহি পারিতেন হইয়া তৎপর,
খাঁ সাহেব সেই সবে লইয়া তখন
করিতেন সমাদরে "বৈকুণ্ঠে" প্রেরণ।
এ হেন "বৈকুণ্ঠ" হ'তে টানিয়া আনিয়া
রাখিয়া দিতেন পুনঃ তীরে দাঁড়াইয়া।
অপমান অত্যাচার তাঁদের উপরে
করিতেন খাঁ সাহেব বিবিধ-প্রকারে।
ধিক্ ওরে জমীদারী, ধিক্ ওরে ধন!
'মহাপাপ যার, তার বৈকুণ্ঠে গমন!'

[প্রস্তাব। মুরশিদ-কুলী খাঁর শাসন-সময়ে তাঁহার দৌহিত্রী-পতি রজী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রজী খাঁ কোনও এক নিভৃত স্থানে একটা খাত প্রস্তুত ও তাহা মূত্রাদিতে পূর্ণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুগণের চরম-লক্ষ্য-স্থল বৈকুণ্ঠ-নামের উপহাস-চ্ছলে তিনি এই নরক-কুণ্ডের নাম "বৈকুণ্ঠ" রাখিয়াছিলেন। যে সকল জমীদার যথা-সময়ে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে সেই "বৈকুণ্ঠে" নিক্ষেপ করিয়া টানিয়া আনা হইত। এই প্রবাদ কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না।]

(২০২)

একদিন সমস্যা উঠিল, "মহাযোগী কিংবা পশু নিশ্চয় সে জন!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"মহাযোগী কিংবা পশু নিশ্চয় সে জন।"

অতি সুমধুর গান করিয়া শ্রবণ,
যুবতির হাব-ভাব করিয়া দর্শন,

গলিতে টলিতে নাহি চায় যার মন,
'মহাযোগী কিংবা পশু নিশ্চয় সে জন্!'

(২০৩)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে দেব-দেবীর পূজা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। অগ্রদ্বীপের গোপী-নাথ-মূর্ত্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি একদিন রস-সাগরের সহিত গল্প করিতে ছিলেন। কথায় কথায় মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"মহারাজ নবকৃষ্ণ করে হান্-টান্!" তখন রস-সাগর এই সমস্যাটী নিম্ন-লিখিত-রূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"মহারাজ নবকৃষ্ণ করে হান্-টান্!"

চৈতন্য-দেবের ছিল শিষ্য এক জন,
শ্রীঘোষ ঠাকুর তাঁরে বলে সর্ব্ব জন।
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ-মূরতি স্থাপিয়া
পূজিতে লাগিলা তাঁরে যতন করিয়া।
অগ্রদ্বীপ হিন্দুদের মহাতীর্থ-স্থান,
লক্ষ লক্ষ যাত্রী তথা করে অধিষ্ঠান।
প্রতিবর্ষে চৈত্রমাসে হয় তথা মেলা,
হেন মেলা দেখিবারে কেবা করে হেলা!
এ মেলায় এত যাত্রী হয় সমাগত,
বর্ষে বর্ষে পাঁচ সাত জন হয় হত।
ইহা শুনি' আলিবর্দ্দী নবাব তখন
ক্রোধ-ভরে হইলেন আরক্ত-নয়ন।
নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, পাটুলী উকিলে
ডাকাইয়া আনিলেন নিজ সভাস্থলে।

কহিলেন,—"অগ্রদ্বীপ কার জমীদারী ?
এখনি জবাব দাও বিশেষ বিচারি'।"
বর্দ্ধমান পাটুলীর উকীল দু-জনা
অস্বীকার করিলেন হ'য়ে ভীতমনাঃ।
কহিলেন নবদ্বীপ-উকীল তখন
রাজা রঘুরাম,—তাঁর অগ্রদ্বীপ ধন।
নবাব কহিলা,—"আমি ক্ষমিনু এবার,
হেন হত্যাকাণ্ড যেন নাহি হয় আর।"
তদবধি পুণ্যভূমি এই অগ্রদ্বীপ
নবদ্বীপ-নৃপতির জলন্ত প্রদীপ।
রঘুরাম, ঠাকুরের সেবার কারণ
কুষ্টিয়ার জমীদারী করেন অর্পণ।
ঠাকুর-সেবার তরে করিয়া প্রয়াস
কুষ্টিয়ার নাম দিলা "গোপীনাথ-বাস।"
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আজীবন ধ'রে
সেবিতেন গোপীনাথে মহা-ভক্তি-ভরে।
গোপীনাথ-সম দেব না আছে ভুবনে,
মহারাজ নবকৃষ্ণ ইনি শুনি' কাণে,
বিশেষ কৌশল করি' তাঁহারে আনিয়া
রাখিলেন নিজগৃহে যতন করিয়া;
মহামূল্য মণি মুক্তা প্রদান করিলা,
ঠাকুরের দেহ খানি সাজাইয়া দিলা।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র! পড়িয়া ফাঁপরে
অভিযোগ করিলেন হেষ্টিংসের ঘরে।

কৃষ্ণচন্দ্র-মুখে লাট শুনি' সবিশেষ
মূর্ত্তি দিতে নবকৃষ্ণে করেন আদেশ।
মহারাজ নবকৃষ্ণ পড়িয়া ফাঁপরে
অন্য এক গোপীনাথ রচিলেন ঘরে।
দুই মূর্ত্তি একরূপ,—ভেদ নাই তায়,
কে আসল, কে নকল,—বুঝা বড় দায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পাঠাইলা নিজ পুরোহিত,
নবকৃষ্ণ-গৃহে গিয়া হন উপস্থিত।
পুরোহিত নানা চিন্তা করি' মনে মনে
দেখে দুই গোপীনাথ রন্ একাসনে।
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে, কিবা হবে ফল,
ইহা ভাবি' দুই দল হইল বিহ্বল।
আসল মূর্ত্তির ঘাম তখন ঝরিল,
ইহা দেখি' পুরোহিত কাঁদিতে লাগিল।
পুরোহিত নিজ মূর্ত্তি চিনিতে পারিয়া
গোপীনাথে ল'য়ে যান আনন্দে মাতিয়া।
অনাথ করিয়া মোরে গোপীনাথ যান,
'মহারাজ নবকৃষ্ণ করে হনূ-টান্!'

[প্রস্তাব। অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত গোপীনাথ-বিগ্রহ বহুকাল হইতেই কৃষ্ণনগরের মহারাজগণ পূজা করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু মহারাজ নবকৃষ্ণ নৌকাযোগে তাহা হরণ করিয়া কলিকাতার অন্তর্গত শোভাবাজারস্থ মিজবাটীতে আনিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারল্ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকটে অভিযোগ করেন। হেষ্টিংস্

মহারাজ নবকৃষ্ণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে গোপীনাথের বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রকে ফিরাইয়া দিতে আদেশ করেন। নবকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া আর একটী অবিকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যথার্থ মূর্ত্তিটী চিনিয়া আনিবার জন্য পুরোহিত ও অন্যান্য বহুলোক পাঠাইয়া দিলেন। পুরোহিত যথার্থ মূর্ত্তিটী প্রথমতঃ চিনিয়া লইতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন গোপীনাথের দেহ হইতে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়াই পুরোহিত নিজ মূর্ত্তিটী চিনিয়া লইয়া মহানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং মহারাজ নবকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজ নবকৃষ্ণ নানাবিধ বহুমূল্য আভরণে মূর্ত্তিটী বিভূষিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল আভরণ গোপীনাথের দেহে বিরাজ করিতেছে।] (১)

(২০৪)

রস-সাগর মহাশয় যে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন, তাহা রাজবাটীর সকলেই জানিতেন। একদিন গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" এই সমস্যাটী পয়ার-ছন্দে আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। দিল্লীর সম্রাট্ সাহালমের প্রদত্ত ফরমাণের কথা রস-সাগরের জানা আছে কি না, ইহা অবগত হওয়াই গিরীশ-চন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণনগর-রাজবংশের ইতিহাস-সম্বন্ধে রস-সাগরের কোন বিষয়ই অজ্ঞাত ছিল না। রস-সাগর মহারাজের মনের অভিপ্রায় তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া উক্ত সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

---

(১) স্বর্গত মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত, "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" নামক গ্রন্থ হইতে সারাংশ লইয়া এস্থলে লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

সমস্যা—"মহারাজেন্দ্র বাহাদুর।"

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ! কি কহিব আজ,
বাঙ্গালায় মহাশান্তি করিছে বিরাজ!
সিরাজের অত্যাচার সহিতে না পারি'
ইস্তফা করিয়াছিলে নিজ জমীদারী।
ধনে মানে প্রাণে ছিল বাঙ্গালীর ভয়,
সে ভয়ে বাঙ্গালী আজ নির্ভয়-হৃদয়।
বাঙ্গালায় কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান,
সকলেরি ভয় ছিল ল'য়ে জাতি মান।
ইংরাজ-রাজেরে আনি' পরামর্শ দিলা,
বাঙ্গালীর ধন মান প্রাণ বাঁচাইলা!
করিয়াছ ইংরাজের কত উপকার,
করিয়াছ ক্লাইবের আশার সুসার!
ক্লাইবের মত নাহি দেখি মহাশয়,
দেখিয়া তোমার গুণ হ'লেন সদয়।
দিল্লীশ্বর সাহাআলম সম্রাট্ স্বজন,—
ক্লাইবের গুণে তিনি মুগ্ধ অনুক্ষণ।
ক্লাইব তোমার গুণ মানিয়া অন্তরে
সম্রাটে লিখেন তব উপাধির তরে।
সম্রাট্ হইয়া প্রীত দিলা উপহার,
পতাকা, নাকারা আর পাল্কী ঝালদার।
এই সঙ্গে উপাধিও করিল বিরাজ,
হে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' তুমি আজ!

[প্রস্তাব। সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া ইংরাজ-

দিগের সাহায্যে মীরজাফরকে নবাব করিবার জন্য জগৎ-শেঠের বাটীতে যখন সভা হইয়াছিল, তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি ক্লাইবকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পরেই ক্লাইব পরম প্রীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ৫টী কামান উপহার দিয়াছিলেন। (১) ইহা অদ্যাবধি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্লাইব কৃষ্ণ-চন্দ্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্রের কেবল "মহারাজা বাহাদুর" এই উপাধি ছিল। ক্লাইব সাহেবই কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ-গ্রাম-বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে উপাধি দিবার জন্য দিল্লীর সম্রাট্‌ সাহালমকে পত্র লেখেন। সম্রাট্‌ সাহালম দিল্লী হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" এই অত্যুচ্চ সম্মান-সূচক উপাধি কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিয়া তাহার ফরমাণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ফরমাণ খানি অদ্যাপি কৃষ্ণ-নগর-বাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বর্গীয় দেওয়ান বাহাদুর কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র রায় মহাশয় এই ফরমাণের বাঙ্গালা-ভাষায় যে অনুবাদ দিয়া-ছেন, তাহাই এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

সম্রাট্‌ সাহা আলমের মোহর।

["একান্ত রাজানুগত, বিবিধ-গুণান্বিত এবং রাজানুগ্রহের যো

(১) ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত "রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণ",—এই মল্লিখিত প্রবন্ধটী "ভারতবর্ষ" নামক সুবিখ্যাত মাসিক-পত্রে ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতে ছিল। পরম পূজ্য-

পাত্র মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর জ্ঞাত হইবে যে, বর্ত্তমান শুভ সময়ে তোমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি, নাকারা, ঝালরদার পাল্‌কি প্রদান করা গেল। তোমার কর্ত্তব্য যে, এই অসীম অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে বাদসাহীর মঙ্গল-সাধনে তৎপর থাক। তারিখ সপ্তম জলুস।"]

(২০৫)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র অপুত্রক বলিয়া শ্রীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশ-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহারাজ নিরতিশয় প্রীতিলাভ ও ঈষৎ হাস্য করিয়া রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিলেন, "মহী দুস্ম স্ব. হাম্ নৃত্য করি।" রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হিন্দী-ভাষায় সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

পাদ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয় পরম-প্রীতি-ভরে ইহা পাঠ করিতেন। এক দিন তিনি নবদ্বীপ-নিবাসী পরম-পূজনীয় কবিবর মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ স্থায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্থায়রত্ন মহাশয়ের আদেশে মহারাজ বাহাদুরের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করায় তিনি আমার যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "পূর্ণবাবু! আপনার 'রস-সাগর' প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হওয়াতে আমি ইহা যত্ন-সহকারেই পাঠ করিয়া থাকি। আপনি ক্লাইব-প্রদত্ত ৫টী কামানের কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি জানি যে, ক্লাইব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ১২টী কামান দিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি সনন্দ দেখাইলেন। বিদ্যাবান্, ধার্ম্মিক ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণকে ব্রহ্মত্র-ভূমি দান করিয়া তিনি এই সকল সনন্দ প্রদান করিতেন। এতদ্ভিন্ন মহারাজ বাহাদুরের নিকটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদ্ গোপাল ভাঁড়ের ছবিও দেখিয়াছিলাম।—গ্রন্থকার

সমস্যা—"মহী দূর কর, হাম্ নৃত্য করি।"

রাজধানী-নৃপ-নন্দন-নন্দন, চন্দ্র-বংশ-অবতার হরি,
চৌদ্দ-ভুবন-জন! নাচত গাওত, চৌষট-যোগিনী তান ধরি'।
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর তর তর শ্রীল গিরীশ-পুরী,
এতনক বোলে অহিরাজ কহে, 'মহী দূর কর, হাম্ নৃত্য করি।

[ব্যাখ্যা। রাজধানী কৃষ্ণনগরে নৃপ-নন্দন শ্রীশচন্দ্রের নন্দন (পুত্র) সতীশ-চন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এই হেতু চতুর্দ্দশ ভুবন আনন্দে নৃত্য করিতেছে, গান গাহিতেছে, এবং চৌষট্টি যোগিনী তান ধরিয়াছে। যখন চতুর্দ্দশ ভুবন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তখন অহিরাজ বাসুকিও ইচ্ছা করিলেন যে, তিনি আনন্দে নৃত্য করিবেন। কিন্তু তাঁহার মস্তকের উপরি সমস্ত মহীর (পৃথিবীর, এখানে ত্রিভুবনের) ভার রহিয়াছে,—এই ভার তুলিয়া লইলেই তিনি স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতে পারেন।]

(২০৬)

একদা নবদ্বীপের এক পণ্ডিত-মহাশয় গিরীশ-চন্দ্রের সভায় গিয়া রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "মাটী হ'য়েছেন তাই দেব মহেশ্বর!" রস-সাগর মহাশয়ও শিবের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিবার কারণ দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্নটীর উত্তর দিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"মাটী হ'য়েছেন তাই দেব মহেশ্বর!"

গৃহিণীর কৃষ্ণবর্ণ, তিনটী নয়ন,
যুদ্ধ লইয়াই তিনি মত্ত অনুক্ষণ,
পুত্র গণেশের মুখ হস্তীর সমান,
কার্ত্তিকেয়ো ছয় মুখ রহে বিদ্যমান,

ভৃঙ্গটীর মুখ খানি বানরের মত,
আছে এব বুড়া ষাঁড় বাহন নিয়ত,—
এ সব দুঃখের কথা ভাবি' নিরন্তর,
'ন্যাংটা হ'য়েছেন তাই দেব মহেশ্বর!'

(২০৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! স্ত্রীলোকের মান করা উচিত কি না?" রস-সাগর উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! স্ত্রীলোকের মান কিয়ৎক্ষণ ভাল লাগে, কিন্তু অধিক-ক্ষণ মান করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাতে অপমান-বোধ হয়।" ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্দ্র সমস্যা দিলেন:—"মানের মাথায় আজ প'ড়ে যাক্ বাজ!" রস-সাগর তখন প্রাণ ভাবিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মানের মাথায় আজ প'ড়ে যাক্ বাজ!"

শুন শুন প্রাণেশ্বরি! গেল বিভাবরী,
রাখ লো আমার মান, মান পরিহরি'।
আলুথালু ক'রে কেন রাখিয়াছ কেশ?
কোথা সেই রস-রঙ্গ, মনোহর বেশ?
লুকায়ে রাখিলে কোথা সেই ভালবাসা?
কোথা গেল সেই তব সুমধুর ভাষা?
কোথা গেল আজ সেই প্রফুল্ল নয়ন?
কোথায় লুকালে সেই প্রসন্ন বদন?
ঢাকিয়াছ মুখ খানি তব নীলাম্বরে,
জলধর ঢাকিয়াছে যেন শশধরে।
কোথায় লুকালে সেই হাস্য মধুময়?
মেঘের আড়ালে যথা সৌদামিনী রয়।

আর যদি কর মান, মোর অপমান,
মান ছাড়ি' রাখ আজ মানের সম্মান।
হর-ধনুঃ-ভঙ্গ রাম কৈলা অনায়াসে,
মানিনীর মানভঙ্গ সহজে না আসে।
মান ক'রে প্রাণ তুমি দিলে বড় লাজ,
'মানের মাথায় আজ প'ড়ে যাক্ বাজ!'

(২০৮)

কোন সময়ে এক দুর্জ্জয় সমস্যা হইয়াছিল, "মা যাঁর সধবা, বিমাতা তাঁর রাঁড়ি।" রস-সাগর সেই দুরন্ত সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"মা যাঁর সধবা, বিমাতা তাঁর রাঁড়ি।"

সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাস-রাজার বাড়ী,
হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি'।
অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ি,
'মা যাঁর সধবা, বিমাতা তাঁর রাঁড়ি'।

[ব্যাখ্যা। ভীষ্মের নিজ মাতা গঙ্গা-দেবী সধবা এবং বিমাতা পদ্মিনী (সত্যবতী ?) বিধবা।]

(২০৯)

কৃষ্ণনগর-নিবাসী কোন লোক, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় যখন তখন যাতায়াত করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন; কিন্তু মহারাজের নিকটে গিয়া ধার্ম্মিক সাজিতেন। ক্রমে ক্রমে ইহা মহারাজের অসহ্য হওয়ায় তিনি একদিন রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "মিছরির ছুরি তুমি, বুঝিলাম, হরি!" রস-সাগরও তীব্রভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"মিছ্‌রির ছুরি তুমি, বুঝিলাম হরি!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

হরি হে! তোমার মত না দেখি নির্দ্দয়,
কে নাম রাখিল তব দেব দয়াময়!
যে বলি সর্ব্বস্ব দান করিলা তোমায়,
পাঠাইয়া দিলে তুমি পাতালে তাঁহায়!
গর্ভবতী সীতা সতী,—তাঁহাকেও বনে
অকারণে পাঠাইলে,—ভেবে দেখ মনে!
তারার নয়ন-তারা বালীর জীবন
বিনা দোষে চোরা বাণে করিলে হরণ!
দুর্জ্জয় তরণী-সেন তব ভক্ত অতি,
তাহাকেও বধ করি' রাখিয়াছ খ্যাতি!
নাশিলে বৃন্দার ধর্ম্ম হ'য়ে শঙ্খাসুর,—
খেলেছ অনেক খেলা,—না দেখি কসুর।
যে জন তোমার পদে লয় হে আশ্রয়,
পদে পদে কর তারে তুমি নিরাশ্রয়!
মুখে মধু, হৃদি বিষ রাখিয়াছ ধরি,
'মিছ্‌রীর ছুরি তুমি, বুঝিলাম হরি! (১)

(২১০)

একদিন এক ভদ্রলোক রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"মিত্র যার নাই, তার সুখ নাহি হয়।" রস-সাগর তাহা এইরূপ পূরণ করিয়াছিলেন:—

---

(১) পণ্ডিত কবিবর দাশরথি রায়ও এই ভাবের একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

সমস্যা—"মিত্র যার নাই, তার সুখ নাহি হয়।"

বিদ্যা নাহি হয় তার, অলস যে জন,
বিদ্যা নাহি রহে যার, নাহি তার ধন,
ধন নাই যার, তার মিত্র নাহি রয়;
'মিত্র যার নাই, তার সুখ নাহি হয়।'

(২১১)

কথিত আছে যে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র, রস-সাগর ও কয়েক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন ৺গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। যে ঘাটে তাঁহারা স্নান করিতে ছিলেন, সেই ঘাটে মুকুন্দ ও মুরারি নামক দুই ভ্রাতায় খেয়া-পার করিত। মহারাজ, রস-সাগর প্রভৃতি সকলেই স্নান করিতেছেন, এমন সময় এক জন ডাক-হরকরা (পোষ্ট-অফিসের পিয়ন) এক বস্তা চিঠি ঘাড়ে করিয়া সেই পার-ঘাটে আসিয়া দেখিল, নৌকায় মাঝি নাই। তাহাকেও তৎক্ষণাৎ নদীপারে গিয়া পোষ্ট-আফিসে চিঠি গুলি পৌঁছিয়া দিতে হইবে। তখন সে ব্যক্তি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে "মুকুন্দ মুকুন্দ; মুরারি, মুরারি,"—ইহা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ আহ্নিক করিতে করিতে ইহা শুনিবামাত্র হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। রস-সাগর তখনই মহারাজের ও পিয়নের দিকে চাহিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"মুকুন্দ মুরারে।"

পাপের পুলিন্দা ব'য়ে ভগ্ন হ'ল পা রে!
নিরূপিত ঘণ্টা-মধ্যে যেতে হবে পারে।
ঘাটে বুঝি মাঝি নাই,—ডাক্ রসনা রে!
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ 'মুকুন্দ মুরারে।'

(২১২)

একদা সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন। রস-সাগর তাঁহার গান শুনিয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরদিন রাজসভায় আসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সম্মুখে শতমুখে গোবিন্দের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন গিরীশ-চন্দ্র হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "মুদিত কনক-পদ্ম নীল-পদ্ম বিনে!" রস-সাগর এইভাবে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"মুদিত কনক-পদ্ম নীল-পদ্ম বিনে!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

নিবেদন করি আমি, ওহে যদুপতি!
তোমা বিনা ব্রজ-ধামে বিষম দুর্গতি।
তোমা বিনা গোপী সব হইয়াছে শব,
তোমা বিনা পক্ষি-গণ র'য়েছে নীরব।
তোমা বিনা তরু লতা নাহি ফুল ধরে,
তোমা বিনা অলি-কুল আর না গুঞ্জরে।
'তোমা বিনা শ্রীরাধিকা না মেলে নয়নে,
'মুদিত কনক-পদ্ম নীল-পদ্ম বিনে!'

(২১৩)

মহারাজ গিরীশ চন্দ্রের সময় ইজারদারেরা বরাতী চিঠি পাইলেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত। ইজারদার-গণ পাওনাদারকে অনেক ডিস্‌কাউন্ট বাদ দিয়া টাকা দিত। ইহাতে তাহারা বিলক্ষণ লাভ করিত, কিন্তু পাওনাদার-গণের বিশেষ ক্ষতি হইত। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজীবলোচন সরকার নামক এক জন

ইজারদারের হাতে পড়িয়া রস-সাগর মহাশয় দুই একবার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মুন্সী গোলাম মুস্তাফা নামকও এক জন ইজারদার ছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একবার বরাতী চিঠি লইয়া তাঁহার নিকটে রস-সাগর মহাশয়কে যাইতে হইয়াছিল। তিনি রস-সাগরকে একজন বিশিষ্ট সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ জানিয়া ও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহাকে বরাতী চিঠির পূর্ণ টাকা দিয়াছিলেন। রস-সাগর টাকা লইয়া আসিয়া মহারাজের নিকটে মুন্সী গোলাম মুস্তাফার নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ কহিলেন, "মুন্সী গোলাম মুস্তাফা।" রস-সাগর মুস্তাফাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিলেন :—

সমস্যা—"মুন্সী গোলাম মুস্তাফা।"

সকল বাণিজ্য হ'তে ইজারদারী তোফা,
দয়া-ধর্ম্ম-চক্ষুঃ-লজ্জা ইস্তফা তিন দফা।
এ রস-সাগর জানে অনেক চৌ-গোঁফা,
মনুষ্যই দেখি 'মুন্সী গোলাম মুস্তাফা।'

(২১৪)

শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কৌতুক ও পরিহাস করিবার জন্ত এক জন "পেসাদার খোসামুদে" রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ তাহার প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়া রস-সাগরের সম্মুখেই তাহার প্রতি নানা কটূক্তি বর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "মূর্খের সহিত স্বর্গে যেতে নাহি চাই!" এই "খোসামুদে" রস-সাগরের বিলক্ষণ বিদ্বেষ্টা ছিল। রস-সাগর এই সমস্যা-পূরণের সুবিধা পাইয়া মূর্খের গুণ-বর্ণনা সহ সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—মূর্খের সহিত স্বর্গে যেতে নাহি চাই!"

কথায় কথায় ক্রোধ করে মূর্খ জন,
মিলন মূর্খের সনে দুঃখের কারণ!
যার খায়, তারি মূর্খ করে সর্ব্বনাশ,
হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠই রহে বারমাস।
রোগ শোক কারে বলে, মূর্খ নাহি জানে;
নিজে বড় বুদ্ধিমান্,—এই ভাবে মনে।
বুঝিতে না পারে মূর্খ কভু হিতাহিত,
হিত-কথা শুনিলেই মূর্খ বিপরীত।
কা... ...সে মন্দ হবে, দ্বন্দ্ব কার সনে,—
এই চিন্তা করে মূর্খ সদা মনে মনে।
ফাটে বুক, যদি দেখে অপরের সুখ,
দেখিলে পরের কষ্ট, হৃষ্ট তার মুখ।
এ রস-সাগর বড় দুঃখে কহে তাই,—
'মূর্খের সহিত স্বর্গে যেতে নাহি চাই!'

(২০৫)

শান্তিপুর-নিবাসী কোনও এক ভদ্রলোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মৃগনাভি-প্রায়।" রস-সাগর একটী ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"মৃগনাভি-প্রায়।"

যে নারী ওজনে লঘু, রূপ-গুণ-বতী,
সেই নারী সিরাজের প্রিয় ছিল অতি।
একদিন সিরাজের মোসাহেব-গণ
তাঁহার নিকটে গিয়া করে নিবেদন,—

"ফইজী বাইজী আছে দিল্লী সহরেতে,
তার মত গুণবতী না দেখি জগতে।
ওজনে বাইস সের, পরম রূপসী,
নৃত্য গীত লইয়াই থাকে দিবানিশি।
তার রূপ গুণ কভু না হয় বর্ণনা,
হুকুম হইলে তারে আনি জাঁহাপনা।"
ইহা শুনি' সিরাজের চিত্ত চমকিল,
লক্ষ টাকা দিয়া তারে ধরিয়া আনিল।
কুচরিত্র শুনি' তার কিছুদিন পরে
সিরাজের ক্রোধানল জ্বলিল অন্তরে।
ছিদ্রশূন্য গৃহে এক পূরিয়া তাহারে
নবাব রাখিয়া দিলা জনমের তরে।
কিছুদিন পরে দেখা যায় দেহ তার,
কেবল কঙ্কাল খানি হইয়াছে সার।
কস্তূরী-মৃগের নাভি মহামূল্য ধন,
কিন্তু তাই হয় তার মৃত্যুর কারণ।
ফৈজী বাইজীর রূপ গুণ-সমুদায়,
তাই বলি, হায় হায় 'মৃগনাভি-প্রায়।'

[প্রস্তাব। 'শুনিতে পাওয়া যায়, রূপবতী, সঙ্গীত-শক্তি-শালিনী অথচ কৃশাঙ্গী রমণীই সিরাজ-উদ্দৌলার পরম প্রীতি-ভাজন ছিল। একদিন তাঁহার এক জন মো-সাহেব বলিল, "জাঁহাপনা! দিল্লীতে ফৈজী-নাম্নী এক বাইজী আছে। তাহার রূপ অতুলনীয়। সে দিবানিশি নৃত্য-গীত লইয়াই মত্ত থাকে। বিশেষতঃ তাহার মত লঘুদেহা রূপবতী নারী দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই কথা

শুনিবামাত্র সিরাজ তাহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাকে নিজ প্রাসাদে আনিয়া রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে গোলাম হোসেন নামক তাঁহার এক ভগিনী-পতির সহিত ফৈজীর অবৈধ প্রণয় উপস্থিত হয়। ইহা শুনিবা-মাত্র সিরাজের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ফৈজীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, "আমি সামান্য গণিকা-মাত্র; ইহাই আমার ব্যবসায়। আমি যদি আপনার গর্ভধারিণী বা সহধর্ম্মিণী হইতাম, তাহা হইলে আমার এই ব্যবহারে আপনি ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন।" ইহা শুনিয়া সিরাজ ক্রোধভরে তাহাকে একটী ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ইহার জানালা ও দরজা এরূপে গাঁথাইয়া দিলেন যে, একটীমাত্র ছিদ্র বা বায়ু-প্রবেশের পথ রহিল না। কিছুদিন পরে সিরাজ সেই ঘর খুলাইয়া দেখিলেন যে, ফৈজীর দেহ খানি কঙ্কালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রবাদ বা ঘটনা অবলম্বন করিয়াই রস-সাগর সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন।]

(২১৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া কালকাল-সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "মেকী হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।" রস-সাগরও মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মেকী হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।"

(কলিকাল-বর্ণন)

এক মুটো অন্ন নাই পণ্ডিতের পেটে,
খাসা খাসা খাদ্য জোটে মূর্খের নিকটে।

শাস্ত্রালাপে নাহি যায় পণ্ডিতের মতি,
গীতায় বেদান্তে শূদ্র সুপণ্ডিত অতি।
স্ত্রীর ভাগ্যে নাহি জোটে এক খানি শাড়ী,
বেশ্যার বাড়ীতে সাচ্চা সাড়ী গাড়ি গাড়ি।
ঢুলির ভাগ্যে শাল-দোশালা, ছেলের ভাগ্যে কানি,
খ্যাম্‌টা-ওয়ালীর ভাগ্যে হীরা-মুক্তা-মণি।
ঠাকুরের ঘোড়া মোণ্ডা, আর ঠোটে কলা,
খাজা গজা মতিচুর ইয়ারের বেলা।
ধন্য কলি! তোরে বলি,—কি রাখিলি বাকী,
'মেকী হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।'

(২১৭)

রস-সাগর মহাশয় হিন্দী ও পারসী ভাষাতেও সমস্যা-পূরণ করিতে পারেন শুনিয়া কোন এক সুশিক্ষিত ও সুধার্ম্মিক মৌল্বী তাঁহার সহিত "চিলাখালীর" বাটীতে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন,—"মেরা জান্।" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"মেরা জান্।
খোদা-তা'লা পয়্‌দা কিয়া কেয়া জমীন্, কেয়া আস্‌মান্,
গাছ্ পাথল জীউ জন্তু, কেয়া হিন্দু কেয়া মসলমান।
এসি ওয়াস্তে সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—সব্ ভি 'মেরা জান্।'

(২১৮)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের কোন সুপণ্ডিত বন্ধু একদিন তাঁহার সভায় বসিয়া রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "মোরে ভজ করহ এখন।"

তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে, "সিরাজ উদ্দৌলার কোনও বিষয় লইয়া ইহা আপনাকে পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। রস-সাগরের রস শুকাইবার নহে' তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মোরে শুদ্ধ করহ এখন।"

আলিবর্দ্দী মাতামহ আলিবর্দ্দী মাতামহ
নবাব তাঁহার মত নাহি ছিলা কেহ।
স্মরি' খোদার চরণ স্মরি' খোদার চরণ
দাদা এই মর্ত্ত্য-দেহ দিলা বিসর্জ্জন॥
আল্লা আল্লা বলি' মুখে আল্লা আল্লা বলি' মুখে
উপস্থিত হইলেন খোদার সম্মুখে।
মনসুর-মুলুক্ আমি মনসুর-মুলুক্ আমি
সিরাজ আমার নাম, বাঙ্গালার স্বামী॥
তোমরা ত হিন্দুগণ তোমরা ত হিন্দুগণ
আমি মুসলমান,—তবু করি নিমন্ত্রণ।
প্রজা সন্তানের মত প্রজা সন্তানের মত
ইহা ভাবি' সভা-স্থলে হয়ো সমাগত॥
দিয়া গলায় বসন দিয়া গলায় বসন
মাগি আমি,—'মোরে শুদ্ধ করহ এখন!' (১)

---

(১) এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় দৌহিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলা হিন্দু-গণের মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে একটী সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। মহারাজ স্বীয় সভা-পণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে দিয়া এই নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত কবিতাটী লিখাইয়া নবাবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একটু রগড় করিয়াই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। যে

(২১৯)

একদিন মহারাজের এক আত্মীয় প্রশ্ন করিলেন, "যখন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে।" রস-সাগর তখনই ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"যখন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে।"

পুত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে,
ঋষি আসি' প্রবেশিলা আশ্রম-কুটীরে।
কুশময় কুমার স্থাপিলা শূন্য ঘরে,
কি জানি জানকী যদি মনস্তাপ করে।
একে কৈল যুগল বাল্মীকি মুনিবরে,
'যখন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে॥'

[ব্যাখ্যা। পুত্রবতী সীতা-দেবী সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলে বাল্মীকি সীতাদেবীর কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লব সে স্থানে নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অকাতরে ভূরি ভূরি ব্রহ্মত্র-ভূমি দান না করিয়া জল-গ্রহণ করিতেন না, তিনি বা তৎকালীন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণ যে সহজে মুসলমানের দান গ্রহণ করিবেন, এরূপ কদাপি বিশ্বাস করা যায় না। উদ্দাম-চিত্ত নবাবের মনস্তুষ্টির জন্যই মহারাজ এই কবিতাটী লিখাইয়া লইয়া ছিলেন, ইহা মনে হয়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-বিরচিত শ্লোকটী এই :—

"খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলীবর্দ্দীনবাবো বিবিধগুণযুতোঽহম্মাসুখঃ পশ্চিমাস্য.।
মর্ত্ত্যং দেহং জহৌ বং মুনসুরমুলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা
হাঁচেঽহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুশ্রুতাং সংস্মরন্তাম্॥
উদ্ভটসাগরঃ (তৃতীয়-প্রবাহঃ) ১৩২ শ্লোকঃ।

হওয়া গেল না। তখন বাল্মীকি কুশ-দ্বারা লবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জীবন-দান করেন। কুশের জন্ম-সময়ে সীতা-দেবী কুটীরে ছিলেন না। 'বাল্মীকি কুশ-দ্বারা যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন, তাহার আকৃতি ঠিক লবের মত।' এই জন্ম ইহার নাম তিনি লব রাখিলেন।]

(২২০)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,—"যখন যেমন হায় তখন তেমন। রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"যখন যেমন হায় তখন তেমন।"

অনন্ত-শয্যায় যিনি করেন শয়ন,
কমলা করেন যাঁর চরণ সেবন,
গোপ-রমণীর পদ ধরি' সেই হরি
সমাদরে রাখিলেন মাথার উপরি।
একদিন যিনি বস্ত্র করিয়া অর্পণ
করিলেন দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ,
গোপীকার বস্ত্র চুরি করি সেই হরি
লুকাইয়া রক্ষা পান বৃক্ষের উপরি!
এ রস-সাগর তাই বুঝেছে এখন,
"যখন যেমন হায় তখন তেমন!

(২২১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন বৈবাহিক সভায় বসিয়া মহারাজের সহিত রসালাপ করিতে ছিলেন। রস-সাগরও সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকায় মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে ইঙ্গিত

করিয়া কহিলেন, "যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!" রস-সাগর মহারাজের প্রাণের কথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!"

বাণীরে রাখেন ব্রহ্মা মুখের ভিতরে,
লক্ষ্মীরে রাখেন বিষ্ণু বক্ষের উপরে।
দুর্গারে রাখেন শিব বামাঙ্গে ধরিয়া,
মদনের শক্তি কত দেখ না বুঝিয়া!
দেবতার যত কিছু সব লীলা খেলা,
'যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!"

(২২২)

একদা কোন পণ্ডিত লোক, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় গিয়া বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে তাঁহাকে কতক গুলি অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রস-সাগরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ।"

সমস্যা—"যত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ।"

যতই পুস্তক তুমি কর অধ্যয়ন,
সকলি বিফল, যদি নাহি দাও মন।
মন দিয়া পড়িলেও শাস্ত্র সমুদয়,
পরম পণ্ডিত তুমি হলেও ধরায়,
যদি না রাখিতে চাও ঈশ্বরে বিশ্বাস,
কেবল হইতে চাও পুস্তকের দাস,
কহিয়া অপ্রিয় কথা ব্যথা দাও মনে,
উপদেশ-বাক্য যদি নাহি শুন কাণে,

'না শিখিতে চাহ যদি ভদ্র আচরণ,
'যত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ!'

(২১৩)

একদিন গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "যত লীলা-খেলা।" তিনি আরও আদেশ করিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে? রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"যত লীলা খেলা।"

(মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি কবির উক্তি)

প্রসিদ্ধ পলাশী-ধাম প্রসিদ্ধ পলাশী-ধাম,
ধরাধামে কে না তার নাহি জানে নাম!
সিরাজের যত গর্ব্ব সিরাজের যত গর্ব্ব
করিলা ইংরাজ-রাজ আজি তাহা খর্ব্ব॥
জয় ইংরাজের জয় জয় ইংরাজের জয়
ক্লাইবের নাম আজ ভারতে অক্ষয়।
হিন্দু-অবলার জাতি হিন্দু-অবলার জাতি
অত্যাচার হ'তে আজি পাইল নিষ্কৃতি॥
তুমি পলাশীর পতি তুমি পলাশীর পতি
তাই কৃষ্ণচন্দ্র! এই তোমার সুখ্যাতি।
করি' ক্লাইব সম্মান করি' ক্লাইব সম্মান
পলাশীর যুদ্ধে দিলা পাঁচটী কামান॥
বৃহস্পতি বার-বেলা বৃহস্পতি বার-বেলা
ফুরাইল সিরাজের 'যত লীলা-খেলা॥'

(২২৪)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র, রস-সাগর ও অন্য কয়েকটী ভদ্র-লোককে লইয়া প্রাক্তন কর্ম্মের ফল-সম্বন্ধে কথা কহিতে ছিলেন। তখন কোন ভদ্রলোক রস-সাগরকে কহিলেন, রস-সাগর মহাশয়! আপনি ভাগ্যবান্ লোকের আশ্রয়ে আছেন; অতএব আপনিও ভাগ্যবান্ পুরুষ।" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগর কহিলেন, "যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার।" তখন মহারাজ কহিলেন, "আপনার এই সমস্যাটী আপনাকেই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" রস-সাগর প্রকারান্তরে আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার।"

গমন করেন ব্রহ্মা হংসের উপরে,
হংস কিন্তু চিরদিন কাদা ঘেঁটে মরে!
গরুড় বিষ্ণুরে লয়ে ঘুরে ভূমণ্ডল,
কিন্তু গরুড়ের ভাগ্যে সর্পই কেবল।
চড়েন বৃষের স্কন্ধে শিব বারমাস,
বৃষের অদৃষ্টে কিন্তু একমাত্র ঘাস।
যে কেহই মহতের লউক আশ্রয়,
প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ঘুচিবার নয়।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,
'যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার!'

(২২৫)

দুর্গা-পূজার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সভায় বসিয়া একজন প্রশ্ন করি-

লেন, "যাও যাও যাও হে।' রস-সাগর তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ইহা এইভাবে পূরণ করিলেন :—

সমস্যা—"যাও যাও যাও হে।"

পরশিয়ে রাঙ্গা পায়, কি বলে ছিলে উমায়,
স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়, ভূমিতে লোটায় হে।
মেনকার হতভাগ্যে, ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,
পাষাণের নাহি সংজ্ঞে, তাই কি জানাও হে॥
মনস্তাপ খণ্ডি খণ্ডি, মণ্ডপে বসিয়া চণ্ডী,
চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে।
সংবৎসর গেল বয়ে, উমা আছে পথে চেয়ে,
আন মহেশ্বরী মেয়ে, 'যাও যাও যাও হে॥'

(২২৬)

রস-সাগরের কোন বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।" রস-সাগর এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই!"

আয়ান করিল বিয়ে রাধিকা সুন্দরী,
তাঁরে ল'য়ে বিহারেন মুকুন্দ মুরারি।
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে কই,
'যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।'

(২২৭)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনি সুকবি, এজন্য আপনার মত সুখী লোক আর নাই।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর কহিলেন, "যাহার কপাল পোড়া, সুখ নাই তার!" তখন

শ্রীশচন্দ্র এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"যাহার কপাল পোড়া, সুখ নাই তার!"

স্বয়ং সুরেশ যিনি, শ্বশুর নগেশ,
যাঁহার ব্রজেশ মিত্র, রমেশ ধনেশ,
যাঁর প্রিয় পুত্র দুটী সেনেশ গণেশ,
শেষ না করিতে পারে যাঁর কথা শেষ,
ভিক্ষার ঝুলিটী সেই লইয়া মহেশ
দ্বারে দ্বারে ঘুরে পান যন্ত্রণা অশেষ!
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'যাহার কপাল পোড়া, সুখ নাই তার!'

(২২৮)

কোন সময়ে কোন ভদ্রলোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "যেন কচি খোকা"। রস-সাগর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উক্তি দিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"যেন কচি খোকা।"

আহাম্মুখ হইলেই কমলা বিমুখ,
আহাম্মুখের কভু নাহি হয় সুখ।
না শুনিল গুরু-বাক্য,—এমি বলি বোকা,
সর্ব্বস্ব খোয়ালে ব্যাটা 'যেন কচি খোকা।'

(২২৯)

একদিন রস-সাগর রাজ-সভায় বসিয়া কথায় কথায় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি যে ভাবেই ভগবানের সাধনা করুন, তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা করিলে

থাকেন।” ইহা শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, “যে ভাবে যে ডাকে সদা, সেই পায় হরি!” তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—“যে ভাবে যে ডাকে সদা, সেই পাই হরি!”

স্মরণ করিয়া পরিক্ষিৎ নিরন্তর,
কীর্ত্তন করিয়া পরাশর মুনিবর,
বালক প্রহ্লাদ শুধু স্মরণ লইয়া,
লক্ষ্মী-দেবী শুধু পদ-কমল সেবিয়া,
বেণরাজ-পুত্র পৃথু করিয়া পূজন,
অক্রূর উত্তম-ভাবে করি’ সংবর্দ্ধন,
বলি-রাজ ধন মন অর্পণ করিয়া
হরি-পদ সার ভাবি’ গিয়াছে মাতিয়া।
হায় রে সংসার-সুখ সব পরিহরি’
‘যে ভাবে যে ডাকে সদা, সেই পায় হরি!’

(২৩০)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র স্বীয় বৈবাহিকের সহিত বসিয়া রসালাপ করিতে ছিলেন। রস-সাগরও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বৈবাহিক মহাশয়, মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “যে যাহার চোখে লাগে, তার ভাল তাই!” তখন মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলিলেন। রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—“যে যাহার চোখে লাগে, তার ভাল তাই!”

কিবা কাণা, কিবা খোঁড়া, কিবা কালা আর,
কিবা হাড়ি, কিবা ডোম, কে করে বিচার!

সুনয়নে পড়িলেই সব যায় ভ'রে,
হায় রে প্রেমের লীলা বুঝিতে কে পারে!
ভাল মন্দ ব'লে কিছু বাঁধা-ধরা নাই,
'যে যাহার চোখে লাগে, তার ভাল তাই!'

(২৩১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় একজন খল-স্বভাব মোসাহেব ছিল। রস-সাগর মহাশয় মহারাজের অত্যন্ত প্রীতি-ভাজন ছিলেন বলিয়া এই মোসাহেব রস-সাগরের প্রতি সর্ব্বদাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। একদিন কথায় কথায় মহারাজ রস-সাগরকে হাসিতে হাসিতে নিম্ন-লিখিত সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন। রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :--

সমস্যা--"যেরূপ স্বভাব যার, তাই থাকে তার!"

দুর্জ্জনের কটু কথা করিয়া শ্রবণ
নিজ সাধু ভাব নাহি ত্যজে সাধু জন।
সর্প-বিষে জর্জ্জরিত চন্দনের কায়,
তথাপি সুগন্ধ তার ছাড়িবে না তায়।
সুজনের মিষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া
দুর্জ্জনের দুষ্ট ভাব না যায় চলিয়া।
জোঁক বসাইয়া দাও স্তনের উপর,
দুগ্ধ না খাইয়া খায় রক্ত নিরন্তর।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'যেরূপ স্বভাব যার, তাই থাকে তার!'

(২৩২)

একদা রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, "রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে দক্ষের নন্দিনি!" রস-সাগর এইরূপে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে দক্ষের নন্দিনি!"

এই ভব-কারাগারে হইয়া পতিত
কর্ম্ম-শৃঙ্খলেই আছি বদ্ধ অবিরত।
পাপ-পঙ্কে হইয়াছি পরম মলিন,
অতি দীন-হীন-ভাবে যাপিতেছি দিন।
বড়ই বিপৎ মোর শিব-সীমন্তিনি!
'রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে দক্ষের নন্দিনি!'

(২৩৩)

একদিন রস-সাগর মহারাজ গিরীশচন্দ্রের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। তখন মহারাজ কবি রস-সাগরকে, কহিলেন, "আপনি আহার করিয়া উঠুন। আমার একটী সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।" রস-সাগর আহার করিয়া উঠিলে মহারাজ কহিলেন, "রন্ ভূমণ্ডলে।" তিনি আরও বলিলেন, "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া পূরণ করা চাই।" রস-সাগরও ইহা অনতিবিলম্বে পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"রন্ ভূমণ্ডলে।"

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ পুরন্দর দেবরাজ
দুজনের কেবা বড় নর মা বুঝিল।
তুলা-দণ্ডে দুই নিধি স্থাপন করিয়া বিধি
ওজন করিতে তাঁর বাসনা জন্মিল॥
লঘু বলি' শচীপতি ঊর্দ্ধদিকে তাঁর গতি
লঘু বস্তু ঊর্দ্ধদিকে যায় কুতূহলে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি পণ্ডিত জনার গতি
অতি গুরু বলিয়াই 'রন্ ভূমণ্ডলে।'

(২৩৪)

শুনিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণনগরে রস-সাগরের এক শ্যালিকা ছিলেন। তিনি অতি সুরসিকা; কিন্তু স্বামীর সহিত কখনও কখনও তিনি কলহ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি ভগিনীকে দেখিতে আসিয়া রস-সাগরের বাটীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিতেন। একদিন রস-সাগর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনারা অবলা জাতি; তবে কর্ত্তার প্রতি মধ্যে মধ্যে প্রবল-ভাব ধারণ করেন কেন?" ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা!" শ্যালিকার এই কথা শুনিবামাত্র রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি আর থাকিতে না পারিয়া রমণী-গণের স্বরূপ-বর্ণন-পূর্ব্বক সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা!"

পুরুষ যতই হোগ্ মহা বলবান্,
সে জন নারীর কাছে কেঁচোর সমান।
যত পায়, তত চায় রমণী সকল,
তাদের আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধি হয় অবিরল।
পুরুষ শুকায়ে যায় নারীর নিশ্বাসে,
বিশ্বাস করিলে তার সর্ব্বনাশ শেষে।
দ্বিগুণ আহার তার, বুদ্ধি চতুর্গুণ,
ছয় গুণ বুদ্ধি তার, কাম অষ্টগুণ।
গোপনীয় কথা তার নাহি থাকে পেটে,
তাহাই রটায়, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে না ঘটে।
পুরুষে ভেড়ুয়া করি' রাখে নারী যত,
ঘুরাইয়া মারে তারে বলদের মত।

বিধিও বুঝিতে নারে রমণীর লীলা,
'রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা।'

(২৩৫)

রস-সাগরের অদৃষ্টে এক এক সময়ে এমন জটিল সমস্যা জুটিত যে, তাহার পূরণ করা সাধারণ লোক অসম্ভব মনে করিতেন। কিন্তু রস-সাগরের এরূপ বলতী দৈবী শক্তি ছিল যে, যতই জটিল সমস্যা হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন। একদা একটি পণ্ডিত লোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।"

লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে।
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল,
'রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।'

[ব্যাখ্যা। এই কবিতায় "লক্ষ্মী" শব্দে তণ্ডুল ও "নারায়ণ" শব্দে জল অর্থ করিয়া লইতে হইবে। অন্ন-পাক সময়ে অগ্নির উত্তাপ যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল ততই তণ্ডুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের প্রবেশ সম্ভবপর।]

(২৩৬)

একদা প্রশ্ন হইল, "রমণীরে বশে আনা বড়ই বিষম!" ইহা শুনিয়া রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রমণীরে বশে আনা বড়ই বিষম!"

সাম দান ভেদ দণ্ড,—এ চারি উপায়
রচিয়া ছিলেন বিধি পূর্ব্বেই ধরায়।
অদ্যাপি না সৃজিলেন উপায় পঞ্চম,
'রমণীরে বশে আনা বড়ই বিষম!

(২৩৭)

একবার রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "রস থাকিলেই তবে সবে বশ হয়!" রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"রস থাকিলেই তবে সবে বশ হয়!"

কাব্যে নয় রস, আর খাদ্যে ছয় রস;
এই পঞ্চদশ রসে লোকে হয় বশ।
অন্য এক রস আছে এই সব বিনা,
যার সনে নাহি হয় কাহারো তুলনা।
গোলাকার, চক্রাকার,—টাকা তার নাম,—
যার রূপ-গুণ-রসে মত্ত ধরা-ধাম।
বশে আনিবার মত দ্রব্য নাহি রয়,—
'রস থাকিলেই তবে সবে বশ হয়!'

(২৩৮)

একদিন প্রাতঃকালে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে লইয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক রজক-পুত্র স্বয়ং গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসিয়া ও আহাতে কতকগুলি বস্ত্র চাপাইয়া বাটী যাইতেছে। ইহা দেখিয়া মহারাজ কহিলেন, "রস-সাগর! ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!" একথা শুনিবামাত্র রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রসের-সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!"

তখন মহারাজ কহিলেন, "আপনার সমাস্যাটী আপনাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!"

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
হংসে চড়ি চিরদিন পাইলেন সুখ।
জগৎ-পালন-কারী দেব নারায়ণ,
গরুড়ের পৃষ্ঠ তাঁর অতি প্রিয় ধন।
হইয়াও জগতের পরম ঈশ্বর
ষাঁড়ে চড়ি' চিরকাল কাটালেন হর।
গাড়ী জুড়ী পরিহরি' জন্তুর উপর
ভ্রমণ করেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
দেবতার পোড়া ভাগ্য, কি করিবে নর,
'রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!'

(২৩৯)

একদা প্রশ্ন হইল, "রহ রহ রহ।" রস-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রহ রহ রহ।"

আর কেন বাক্য-বাণে দহ দহ দহ,
শ্যাম-কলঙ্কিনী বাণী কহ কহ কহ।
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ,
রমণে রমণ করে 'রহ রহ রহ'।"

(২৪০)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে

দিলেন,—"রাণী ভবানীর আজ হ'ল সর্ব্বনাশ' রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"রাণী ভবানীর আজ হ'ল সর্ব্বনাশ!

পান্তা ভাত, চিংড়ী মাছ, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের আলয়ে।
শেষে কান্ত শোয়াইয়া সিন্দুক উপরে
বহুকষ্টে হেষ্টিংসের প্রাণরক্ষা করে।
কান্তের এ উপকার স্মরণ করিয়া
হেষ্টিং রাখেন ইহা মাথায় তুলিয়া।
কিরূপে কান্তের আমি করি উপকার,
ইহা ভাবি' লাট এই করেন বিচার,—
রংপুরে "বাহার-বন্দ" রাণী ভবানীর,
তাহাই কান্তকে দিব,—করিলেন স্থির।
ভবানী সামান্য রাণী, বুদ্ধি কিবা তার!
এ হেন সোণার রাজ্য সাজে কি তাহার?
এই ছল করি' লাট অমনি তখন
কাড়িয়া লইয়া রাণী ভবানীর ধন
সঁপিলা কান্তের করে জনমের তরে,
কান্ত-মুদি বাবু হ'ল এতদিন পরে।
হেন কাণ্ড দেখি রাণী কহেন তখনি,
"ভবানীর একমাত্র সহায় ভবানী!"
ভবানীর প্রজাগণ ছাড়িল নিশ্বাস,
'রাণী ভবানীর আজ হ'ল সর্ব্বনাশ!' (১)

---

(১) যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহাত্মা রাণী ভবানী বার্ষিক দেড় কোটি টাকা [illegible]

(২৪১)

কোনও সময়ে রস-সাগর কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া একজন প্রবাসী বন্ধুর বাটীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "রাম রাম রাম।" তখন রস-সাগর সেই বন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া পরিহাস-চ্ছলে এই সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রাম রাম রাম।"

সম্পূর্ণ যুবতী নারী রেখে দিয়া ঘরে
চলিল তাহার পতি বাণিজ্যের তরে।
মধুমাস,—মন্দ গন্ধ বহে সমীরণ,
নিশায় বিদেশী জন দেখিল স্বপন।
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল,
বাটীতে যাইব বলি' মনেতে ভাবিল।
তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব,
নারী-সঙ্গে রস-রঙ্গ অদ্যই করিব।
এত ভাবি' তাড়াতাড়ি যেতে নিজ ধাম,
উছট খাইয়া বলে 'রাম রাম রাম।'

জমীদারী এতদিন নির্ব্বিবাদে ও শান্তি-সহকারে চালাইয়া আসিতে ছিলেন; যে সাক্ষাৎ ভবানী রাণী ভবানী জগৎ-শেঠ দ্বারা বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকা কর দিল্লীর সম্রাটের নিকটে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়া বাদসাহের ও নবাবের নিকটে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি আজ হেষ্টিংসের চক্ষে সামান্য স্ত্রীলোক বলিয়া গণ্য হইলেন এবং তিনি আজ সামান্য "লাট বাহার-বন্দ" রক্ষা করিতে "অসমর্থ" হইলেন, ইহাই আজ হেষ্টিংস্ স্পষ্টরূপে বলিতে সাহস করিলেন! স্বীয় প্রিয়পাত্র নন্দ-বাবুকে বধ করিবার জন্যই তাঁহার এইরূপ মতিগতি হইয়াছিল।

(২৪২)

একদিন সন্ধ্যায় সময় গিরীশ-চন্দ্রের সভায় রামায়ণ-গান হইতেছিল। গান শেষ হইয়া গেলে মহারাজ রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "রামের কঠিন প্রাণ, সীতার কোমল!" রস-সাগর এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"রামের কঠিন প্রাণ, সীতার কোমল!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

দশ মূর্ত্তি ধরি' হরি! দশ অবতারে
কি কাণ্ড না করিয়াছ আসিয়া সংসারে!
রাম-অবতারে তুমি ক'রেছ যে সব,
চক্ষুঃ দিয়া জল আসে শুনিলে কেশব!
বিষম দুর্জ্জয় বীর বালীর জীবন
বিনা দোষে চোরা বাণে করিলে হরণ!
গর্ভবতী সীতা সতী তোমারি কৃপায়,
বাল্মীকির বনে গিয়া প্রাণরক্ষা পায়!
লঙ্কাপুরে সীতা অগ্নি-পরীক্ষাও দিয়া
বিষম মনের দুঃখে ছিলেন বাঁচিয়া!
যে অগ্নি-পরীক্ষার কথা শুনি' কাণে
অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মরিলেন প্রাণে!
শুনিয়া তোমার কাণ্ড হ'য়েছি বিহ্বল,
'রামের কঠিন প্রাণ, সীতার কোমল!'

(২৪৩)

একদিন যবরাজ শ্রীশচন্দ্রের কোন এক বয়স্ত রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"রূপবতী নারী বধা দরিদ্রের

ঘরে।" তিনি আরও বলিয়া দিলেন, "একটীমাত্র চরণ যোগ করিয়া আপনাকে ইহা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" রস-সাগর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়াই ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—'রূপবতী নারী যথা দরিদ্রের ঘরে।"

ব্যাকরণ বিনা বাণী শোভা নাহি ধরে,
'রূপবতী নারী যথা দরিদ্রের ঘরে।'

(২৪৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। তবে রস-সাগর বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন; সময়ে সময়ে তাঁহাকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটিত যে, মহারাজ বিরক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহার বেতন বন্ধ করিয়া দিতেন। একবার রস-সাগরের বেতন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হওয়ায় তিনি অভিমান করিয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রাজবাটীতে বেতনও প্রাপ্য ছিল। কিন্তু অভিমান করিয়া রাজ-বাটীতেও যাইতেন না এবং বেতনও চাহিতেন না। রস-সাগর নিরন্ন,—তাঁহার সংসার চলে না। ব্রাহ্মণী দিবানিশি তাঁহাকে তিরস্কার করেন। মহারাজ অনেক দিন রস-সাগরকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য এক জন কর্ম্মচারীকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। রস-সাগরের বাটী অতি সামান্য। কর্ম্মচারী বাটীর বাহিরে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, স্ত্রী-পুরুষে সাংসারিক দুঃখের কথা কহিতে-ছেন। রস-সাগরের স্ত্রী অতি বুদ্ধিমতী ও সুরসিকা ছিলেন। তিনি বিনীত-ভাবে স্বামীকে বলিলেন, "ঠাকুর! আর সংসারের কষ্ট সহ্য হয় না। আমার ধ্বনি দিয়া ও দুঃখ জানাইয়া একটী

কবিতা লিখিয়া মহারাজকে দিন;" তাহা হইলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন, এবং আমাদেরও সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে।" ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন, এবং মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন তখন মহারাজের কর্ম্মচারী বাহিরে থাকিয়া উভয়েরই দুঃখের কথা শুনিতেছিলেন। উভয়েই পরস্পর কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কর্ম্মচারী বলিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! মহারাজ আপনাদের সংবাদ লইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" ইহা বলিবামাত্র রস-সাগর আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সহিত রাজ-বাটীতে গমন করিলেন। দেখিবামাত্র মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণী কেমন আছেন?" তিনিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন "মহারাজ! ব্রাহ্মণী আপনাকে একখানি দরখাস্ত দিয়াছেন। তবে ভীষণ অর্থাভাব হেতু কাগজ, কলম না থাকায় তাঁহার একটীমাত্র কথা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।" মহারাজ বলিলেন, "কি কথা বলুন।" রস-সাগর বলিলেন, "রেখেছি একটী ইষিকা।" তখন মহারাজ কহিলেন, "আপনার ব্রাহ্মণীর সমস্যা আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীর ধ্বনি দিয়া করুণ-রসে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন। কবিতায় দুঃখ-বর্ণনা শুনিয়া মহারাজ ব্যথিত হইয়া রস-সাগরকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়াছিলেন।

সমস্যা—"রেখেছি একটী ইষিকা।"

নিবেদন করে দাসের দাসী, রস-সাগরের রসিকা,—
দয়া ছেড়েছেন নাথের নাথ, মন্দির ছেড়েছে মূষিকা।
আভরণ-চয় করেছি বিক্রয়, সুবর্ণ-রক্ষিত নাসিকা।
পাইব আশায়, আজিও নাসায়, 'রেখেছি একটী ইষিকা'॥

[ব্যাখ্যা।, ইষিকা—তৃণ অর্থাৎ কাটি। রস-সাগরের রসিকা ব্রাহ্মণী সাংসারিক দুঃখের জ্বালায় "নাক-চাবিটীও" বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। পাছে নাসিকার ছিদ্রটী বুজিয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া আজিও তিনি নাসিকায় একটী 'কাটি' দিয়া রাখিয়াছেন।]

(২৪৫)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র জীবনের প্রথম ভাগে নিরতিশয় শুদ্ধাচারী ছিলেন। মদ্যপানের নাম শুনিলেই তাঁহার ঘৃণা ও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তিনি মদ্যপানের প্রতি এরূপ বিমুখ ছিলেন যে, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াই পিতার মদ্যপায়ী বন্ধুগণকে রাজ-বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে যখন "উখড়া-পরগণা" নিলাম হইয়া যায়, তখন তিনি শোক-দুঃখে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। সেই সময়ে এক জন দণ্ডী গোস্বামী মহারাজের নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সর্ব্বদাই আপনাকে ব্যাকুল-চিত্ত দেখি; ইহার কারণ কি?" তখন মহারাজ কহিলেন, "যে কুলাঙ্গার নিজ দোষে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার আর সুস্থ-চিত্তে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়?" ইহা শুনিয়া দণ্ডী মহাশয় কহিলেন, "আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে আপনার মনঃপীড়া দূরীভূত হইবে।" অনন্তর দণ্ডীর আদেশে তিনি তন্ত্রোক্ত মত গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন সুরাদেবীর উপাসক হইয়া রহিলেন। একদিন তিনি কয়েক জন মদ্যপায়ী সহচরের সহিত বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "লইয়া ইয়ার বক্সী প্রাণ খুসী হয়!" রস-

সাগর মহাশয়ও মহারাজের তৎকালীন মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া এইভাবে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"লইয়া ইয়ার বক্সী প্রাণ খুসী হয়।"

গাঁজাটা বড়ই পাজি, ক্ষাণ করে দেহ,
পচা গন্ধে নাড়ী উঠে, টানে যদি কেহ।
নস্য নিলে বিদ্যা বাড়ে, বাড়ে বহু যশ,
গুড়ুক ভদ্রের তরে, নীচের চরস্।
সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি টুকু বাড়ে অবিরল,
গর্ব্বাণ সংসারে এক ভরসার স্থল।
আফিঙেতে কত সুখ কি কহিব আর,
বুম্ হ'য়ে বসে থাকে নড়া চড়া ভার।
মজা যদি থাকে কিছু মদেতেই রস,
'লইয়া ইয়ার বক্সী প্রাণ খুসী হয়।' (১)

(২৪৬)

একদিন রাজবাটীর দেওয়ান রামমোহন মজুমদারের নিকটে রস-সাগর প্রাপ্য বেতন আনিতে গিয়াছিলেন। তখন রাজবংশে বিষম

(১) এই বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণ, কবিচন্দ্র-কৃত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-মিশ্রিত নিম্ন-লিখিত হাস্য-রসাত্মক সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতার অনুবাদ মাত্র :—

গঞ্জা পাজিভবা তনুকৃশকরী দুর্গন্ধযুক্তা পুন-
র্নস্যং মৌর্থ্যহরং সতাঞ্চ গুড়ুকং ক্ষুদ্রাঃ সহেরংশ্চরম্।
সিদ্ধির্বুদ্ধিবিবর্দ্ধিনী খলু নৃণাং গর্ব্বাণ ভর্ব্বাস্থলী
আফিঙ্কারমজা ইয়ারখুসিবেজ্ মদ্যং মজাদায়কম্।

আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। কথায় কথায় মজুমদার কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! মহারাজের কাণ্ড সমস্তই দেখিতেছেন। তাহার বিষয়-বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-শুদ্ধি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "লক্ষ্মীর মতন কেহ পতি-ব্রতা নাই।" তখন মজুমদার কহিলেন, "কৃপা করিয়া এখন এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"লক্ষ্মীর মতন কেহ পতিব্রতা নাই।

লইয়া গরুর পাল সুখে বৃন্দাবনে
খেলিয়া ছিলেন হরি তাহাদের সনে।
আজিও গরুর মত যারা বুদ্ধি ধরে,
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘুরে ফিরে।
তাই আমি এই কথা বলিবারে চাই,—
'লক্ষ্মীর মতন কেহ পতিব্রতা নাই।' (১)

(২৪৭)

একজন একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "লঙ্ক ফেলে দিল।" রস-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া ছিলেন :—

(১) এই কবিতার ভাব নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় :— "গোভিঃ ক্রীড়িতবান্ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ।
ক্রীড়ত্যদ্যাপি সা লক্ষ্মীরহো দেবী পতিব্রতা॥"

সমস্যা—"লঙ্গ ফেলে দিল।"

হেন উপকার আর না করিল কেহ,
বিরহিণী কহেন,—কল্যাণে থাক্ রাহু।
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হ'লো,
গ্রহণ-সময়ে ধনী 'লঙ্গ ফেলে দিল।'

[ব্যাখ্যা। চন্দ্র বিরহিণীর বিষম শত্রু, কারণ বিরহিণীর পক্ষে যতগুলি 'উদ্দীপক' বস্তু আছে, চন্দ্রই তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে;—এজন্য বিরহিণী রাহু-কর্ত্তৃক চন্দ্রের গ্রাস ও দুঃখ দেখিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "কল্যাণে থাক্ রাহু।" পাছে চন্দ্রকে আহার করিয়া মন্দাগ্নি হয় ও তাহাকে বমন করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে বিরহিণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাহুকে একটী লঙ্গ (লবঙ্গ) খেতে দিলেই তাহার পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং সে চন্দ্রকেও সুন্দর-রূপে পরিপাক করিয়া ফেলিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি স্বীয় নাসিকা-স্থিত একটী লঙ্গ (লবঙ্গ-নামক সুবর্ণের অলঙ্কার) রাহুকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিল।]

(২৪৮)

কোনও লোক রাজ-সভায় বসিয়া একদিন সমস্যা দিলেন, "ললাটে নূপুর-ধ্বনি অপরূপ শুনি।" রস-সাগর তখনই ইহা এইভাবে পূর্ণ করিলেন :—

সমস্যা—"ললাটে নূপুর-ধ্বনি অপরূপ শুনি।"

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দ-নন্দন,
দুর্জ্জয় মানেতে রাধা মজেছে যখন।

শ্রীকৃষ্ণই সেই মান-ভঞ্জন-কারণ
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ।
শেষে রাধা-পদ শীর্ষে নিলা চক্রপাণি,
'ললাটে নূপুর-ধ্বনি অপরূপ শুনি!'

(২৪৯)

শান্তিপুরে রামগোবিন্দ গোস্বামীর বাসস্থান ছিল। তিনি একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজ-সভায় আসিয়া রস-সাগরের সহিত আলাপ পরিচয় করেন। পরে তিনি একটী সমস্যা পূরণ করিতে দেন, "লাগে তীর, না লাগে তুক্কা।" রস-সাগর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"লাগে তীর, না লাগে তুক্কা।"
গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের ভুক্কা,
গ্রন্থ-পাঠ গাঁজা হুঁক্কা।
ধরেন কাণ, লাগান্ ফুক্কা,
'লাগে তীর, না লাগে তুক্কা॥'

(২৫০)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোনও এক পরম বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার একটী বয়ঃকনিষ্ঠ সহোদর সম্প্রতি ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহারাজ দুঃখ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী!" ইহা শুনিয়াই রস-সাগর দুঃখ প্রকাশ করিয়া করুণ-রসে সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী!"
শক্তি-শেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণ-ভূমি,
কাঁদেন ব্যাকুল হ'য়ে জগতের স্বামী।

শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ,—সবার আগে আমি,
'শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী!'

(২৫১)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটা রসাল জটিল সমস্যা পূর্ণ করিতে দিব।" ইহা বলিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "শ্বশুরে ধরিল পত্নী পতির সম্মুখে!" রস-সাগরের রস শুষ্ক হইবার নহে! তিনি তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

১ম পূরণ।

সমস্যা—"শ্বশুরে ধরিল পত্নী পতির সম্মুখে!"

গোদাবরী-পর-পারে বাস করিবার তরে
কুম্ভ-পুত্র অগস্ত্যের বাসনা জন্মিল।
যবে ঋষি গেল জলে দগ্ধ হ'য়ে চিন্তানলে
সতী সাধ্বী লোপামুদ্রা ব্যাকুল হইল॥
যাইব পতির সনে এই ইচ্ছা মনে মনে
বক্ষে কুম্ভ ল'য়ে নদী পার হ'ব সুখে।
কামাতুর হ'য়ে সতী না দেখিয়া অন্য গতি
'শ্বশুরে ধরিল পত্নী পতির সম্মুখে॥'

উক্ত পূরণ-কবিতা শুনিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! অন্য প্রকারে এই সমস্যাটী আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন রস-সাগর মহাশয় নিম্ন-লিখিত-ভাবে ইহা পুনর্ব্বার পূরণ করিয়া দিলেন:—

২য় পূরণ।

সমস্যা—"শ্বশুরে ধরিল পত্নী পতির সম্মুখে!"

ঘুরে ঘুরে বনে বনে পঞ্চ পাণ্ডবের সনে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন দ্রুপদের বালা।
ভীমসেন মহামতি কহেন প্রেয়সী প্রতি
শ্রম দূর কর তুমি,—রাজার মহিলা॥
ইহা শুনি ধীরে ধীরে যাইয়া গোদার তীরে
বৃক্ষতলে বসিলেন ধনী মহাসুখে।
পবনের তরে হায় হইয়া পাগল প্রায়
'শ্বশুরে ধরিল পত্নী পতির সম্মুখে॥'

(২৫২)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া অনেক লোকের সম্মুখে স্বীয় প্রপিতামহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি রস-সাগরের দিকে চাহিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, "শ্বেতাঙ্গীর গলে।" রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"শ্বেতাঙ্গীর গলে।"

নিবেদন করি ওগো হেষ্টিংস্-মহিলা!
আমি এক মণিকার আসিয়াছি তব দ্বার
বিক্রয় করিতে এই মুকুতার মালা॥
ইহা অতি মূল্যবান্ নাহি দেখি ভাগ্যবান্
যে কিনিতে পারে এই মহামূল্য হার।
তুমি হেষ্টিংসের সতী রূপবতী গুণবতী
হেন নিধি সাজে গলে কেবল তোমার॥

ইহার নাহিক তুল্য না লব অধিক মূল্য
চল্লিশ হাজার টাকা করিব গ্রহণ।
একবার দিন গলে দেখুক জগতী-তলে
সোণার সহিত হোগ সোহাগ-মিলন॥
শুনিয়া হেষ্টিংস-নারী করিলেন মন ভারি
এত টাকা না দিবেন সাহেব আমার।
মৃদুহাস্যে একবার কহিলেন মণিকার
নাহি লব মূল্য আমি,—ইহা উপহার॥
চাঁদপানা মুখখানি তুলিয়া তখন ধনী
ভাবিলেন আমি ধন্য এই ভূমণ্ডলে।
শ্রীকালীপ্রসাদ কয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয়
কিবা শোভে মুক্তাহার 'শ্বেতাঙ্গীর গলে॥'

[প্রস্তাব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন। শিবচন্দ্র যেরূপ শান্ত-স্বভাব, পিতৃভক্ত ও সুপণ্ডিত; শম্ভুচন্দ্র সেইরূপ উদ্ধত, পিতৃদ্রোহী ও শাস্ত্র-জ্ঞান-বিমুখ ছিলেন। শিবচন্দ্র সাক্ষাৎ শিব। যখন নবাব মীরকাশিম মুঙ্গের-দুর্গে পিতা ও পুত্রকে বধ করিবার জন্য আদেশ দেন, তখন শিবচন্দ্র উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্বন্ধে তাঁহাকে সৎ-পরামর্শ দিয়া তাঁহার যথেষ্ট সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এজন্য কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্রেরই নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিবার সংকল্প করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি "দানপত্র" ও পারসী ভাষায় একখানি "তক্‌বিজ নামা" লিখিলেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারল্ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাউন্সিলের এক জন সাহেব মেম্বর ও একজন মুন্সী

আসিয়া তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিয়া যান। ১১৮৭ বঙ্গাব্দের (১৭৮০ খৃষ্টাব্দের) ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই দুই খানি কাগজ লিখিত হয়। এই দানপত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া ছিলেন। অন্যান্য ৫টী পুত্র ও পৌত্রদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ কেবল ৪০০০০৲ (চল্লিশ হাজার) টাকার বার্ষিক বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন।

এই দানপত্র লিখিয়া মহারাজ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শিব-চন্দ্রের নামে সমগ্র জমীদারীর রাজ-সনন্দ-প্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কর্ত্তৃত্ব-কালে এইরূপ ব্যাপার-নির্ব্বাহ-বিষয়ে তাঁহার প্রধান কর্ম্ম-সচিব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রভূত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব ছিল। তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃ-শ্রাদ্ধের সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। শিবচন্দ্র সভাস্থলে গিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়কে বলিলেন "দেওয়ান বাহাদুর! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ ঠিক দক্ষযজ্ঞের মত।" তাহাতে সিংহ মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন, "আমার মাতৃশ্রাদ্ধ দক্ষযজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক, কারণ দক্ষযজ্ঞে স্বয়ং 'শিবের' আগমন হয় নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্ধত ও অবাধ্য পুত্র শম্ভুচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তির এক অর্দ্ধাংশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পাইবেন এবং অপর অর্দ্ধাংশ তিনি স্বয়ং পাইবেন। এই উদ্দেশে শম্ভুচন্দ্র রাজ-পুরুষগণের সাহায্য-লাভের নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই দানপত্র লিখিয়া দিবার পূর্ব্বেই সমস্ত

সম্পত্তির দশাংশ শিবচন্দ্রকে এবং ষষ্ঠাংশ শম্ভুচন্দ্রকে দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং শম্ভুচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শম্ভুচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যেরূপেই হউক, অর্দ্ধেক রাজ্য লইব। ইহাতে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

দানপত্র লেখা হইয়া গিয়াছে, এবং সাহেব মেম্বর ও মুন্সীরও স্বাক্ষর এবং মোহর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন শম্ভুচন্দ্র নিরুপায় হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইলেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে কি করেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এক খানি পত্র লেখেন। তাহার একস্থানে এইরূপ লিখিত ছিল, "পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, এখন যা করেন শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।" কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ গঙ্গা-গোবিন্দকে প্রসন্ন করিয়া হস্তগত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে প্রত্যহই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে কালীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার সহিত কপট ব্যবহার করিতেছেন। তখন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের কপট ব্যবহার ও অন্যান্য নিন্দার কথা লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে এক খানি পত্র লেখেন। শম্ভুচন্দ্র পত্র-বাহকের নিকট হইতে এই পত্র খানি লইয়া গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ করেন। পত্র-পাঠ-মাত্র সিংহের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। পরদিন হেষ্টিংস ধর্ম্মালয়ে উপবেশন করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "শিবচন্দ্র বিষয়-কার্য্যে নিতান্ত অপটু, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ। পক্ষপাতী হইয়াই কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" তখন

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের কপট-বচনে প্রতারিত হইয়া শম্ভু-চন্দ্রেরই নামে সনন্দ দিবার আদেশ করিলেন।"

দেওয়ান কালীপ্রসাদ এই বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তিনি গঙ্গাগোবিন্দের নিকটে প্রত্যহ যেরূপ যাতায়াত করেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃকালে কালীপ্রসাদ গঙ্গাগোবিন্দের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত অবমাননা করেন। কালীপ্রসাদ নিতান্ত অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিষণ্ণ-বদনে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে আসিয়া গঙ্গাগোবিন্দের সমস্ত কথা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, হেষ্টিংসের স্ত্রীকে কোনও কৌশলে হস্তগত করিতে পারিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

তৎকালে হুগলী ও চন্দন-নগরের বাজারে মণিকারদিগের নিকটে অতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য মুক্তা বিক্রীত হইত। মহারাজ কালীপ্রসাদকে দিয়া ভাল ভাল মুক্তা সংগ্রহ করাইয়া একছড়া মুক্তার মালা প্রস্তুত করাইলেন। পরদিন প্রত্যুষেই কালীপ্রসাদ এই মহামূল্য মুক্তামালা লইয়া হেষ্টিংসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তৎকালে বায়ু-সেবনার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ এই সুযোগ পাইয়া মণিকারের বেশে হেষ্টিংস-পত্নীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উক্ত মুক্তার মালা তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি মালা দেখিয়া হৃষ্টমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার মূল্য কত?" ছদ্মবেশী মণিকার বিনীত-ভাবে কহিলেন, "আপনি মূল্য জানিবার জন্য এত ব্যগ্র হইতেছেন কেন? অনুগ্রহ করিয়া একবার গলায় পরিয়া দেখুন, কিরূপ শোভা হয়।" তিনি তখন ইহা গলায় পরিয়া ইহার

অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণিকার কহিলেন, "আপনার রূপ যেমন মনোহর, মালা ছড়াটীও সেইরূপ মনোহর হইয়াছে।" তখন হেষ্টিংস্-পত্নী পুনর্ব্বার ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে ছদ্মবেশী মণিকার কহিলেন, "ইহার মূল্য অনেক টাকা। তবে আপনি স্বয়ং ইহা লইলে আমি চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিতে পারি।" মেম সাহেব দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ-ভাবে কহিলেন, "আমার স্বামী এত টাকা দিবেন না। সুতরাং আমার ভাগ্যে এই মুক্তার মালা ক্রয় করা ঘটিয়া উঠিবে না।" মুক্তার মালায় হেষ্টিংস-পত্নীর মন নিহিত রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া দেওয়ান কালীপ্রসাদ বিনীত-ভাবে কহিলেন, "আপনি এই মালা কণ্ঠদেশ হইতে মোচন করিবেন না;—আমি ইহা আপনাকে উপহার দিতে আসিয়াছি।" তখন তিনি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনার স্বামী গভর্ণর জেনারল্ বাহাদুর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আরোপিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার কৃপা ভিন্ন মহারাজের অন্য উপায় নাই।" হেষ্টিংস-পত্নী ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে গঙ্গাগোবিন্দের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মহারাজের প্রার্থনা-সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মেমের সহিত সাহেব অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া মহারাজের প্রার্থনা-পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে শিবচন্দ্রের নামে লিখিত সনন্দ গভর্ণর জেনারল বাহাদুর স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন। (১)

(১) এই সমস্যা-পূরণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাঁতি

(২৫৩)

একদা রস-সাগরের শ্বশুর-বাটীর সম্পর্কীয় কোন লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "শ্যালকার পতি যিনি, আদর তাঁহারি।" তিনিও সমস্যাটী এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"শ্যালিকার পতি যিনি, আদর তাঁহারি।"

চন্দ্রের কৃত্তিকা নারী গিরীশের নারী গৌরী
গৌরীর ভগিনী পুনঃ কৃত্তিকা সুন্দরী।
তাই চন্দ্রে শিরে ধরি রেখে দেন ত্রিপুরারি
'শ্যালিকার পতি যিনি আদর তাঁহারি॥'

(২৫৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "শ্রীগঙ্গা-গোবিন্দ" এবং বলিয়া দিলেন, "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ইহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।"

(গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি)

ভীষণ অরণ্য-সম আমার সংসার,
শম্ভুচন্দ্র ধূর্ত্ত পশু,—নাহিক নিস্তার।
তুমি সিংহ পশুপতি তুমিই আমার গতি,
তুমি কৃপা করিলেই পরম আনন্দ।
পুত্র হইল অবাধ্য দরবার হ'লো অসাধ্য
এ সময় যা করেন "শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ॥'

মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়-প্রণীত "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল।—গ্রন্থকার

[প্রস্তাব। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া শম্ভুচন্দ্রকে কেবল বার্ষিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তখন শম্ভুচন্দ্র অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবার জন্য পিতার অবাধ্য হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাপন্ন হন। ইহ জানিতে পারিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তিত ও নিরুপায় হইলেন, এবং গঙ্গাগোবিন্দকে একখানি পত্র স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে এই কয়েকটী কথা সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন, "পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, যা করেন শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।"]

(২৫৫)

রস-সাগরের কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "সতী-বাক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নড়ে।" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা"—সতী-বাক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নড়ে।"

রুগ্ণ পতি ল'য়ে সতী প্রবেশিলা ঘরে,
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে।
ভয়ে সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে,
'সতী-বাক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নড়ে।'

[প্রস্তাব। এই কবিতা-সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। অতি পূর্ব্ব-কালে একটি সতী স্ত্রী বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী কুষ্ঠ-রোগে বিকলাঙ্গ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে ছিলেন। কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে তিনি স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া যাইতেন। একদা তিনি পত্নীর স্কন্ধে চাপিয়া যাইতেছেন, এমন সময় লক্ষহীরা-নাম্নী এক স্বর্গ-বেশ্যাকে তিনি দেখিতে পান। ইহাতে কুষ্ঠীর মন

অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। স্বামীর চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিয়া সতী তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া লক্ষহীরার উদ্দেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাণ্ডব্য-মুনি এক শূলের উপরি বসিয়া পূর্ব্ব-কৃত পাপের ফলভোগ করিতেছেন। তিনি বাল্যকালে কীট-পতঙ্গদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন বলিয়া তাঁহার শূল-দণ্ড হইয়াছিল। শূলের উপরি অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। তাঁহারই নিম্ন-দেশ দিয়া সতী পতিকে স্কন্ধে লইয়া যাইতেছিলেন। দৈবাৎ মাণ্ডব্য-মুনির পদে কুষ্ঠীর মস্তক-স্পর্শ হইল। তখন শূল-দণ্ডের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মাণ্ডব্য-মুনি অভিসম্পাত করিলেন, "যে দুর্ব্বৃত্ত আমার ধ্যানের বিঘ্ন করিল, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে।" সতী ইহা শুনিবামাত্র লক্ষহীরার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া পতিকে লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং কহিলেন, "যদি আমি যথার্থ সতী হই, এবং কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত হইবে না, এবং সূর্য্যদেবও উঠিবেন না; পতিরও মৃত্যু হইবে না এবং আমিও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিব না।" সতীবাক্য লঙ্ঘন করা দেবতা-গণেরও অসাধ্য। তখন সূর্য্যদেব চিন্তা করিয়া দেখিলেন, "আমি উদিত হইলেই সতীকে বিধবা হইতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমি তাঁহার অভিসম্পাতে পড়িব।" এই ভয়ে সূর্য্যদেব সুমেরুর পার্শ্বদেশে লুক্কায়িত রহিলেন। অতএব সূর্য্যোদয় হইল না, এবং সতীবাক্য রক্ষা করিবার জন্য বিধির নিয়মও বিপর্য্যস্ত হইল। রস-সাগর মহাশয় এই প্রবাদ-বাক্যটী লইয়াই উক্ত কবিতাটী রচনা করিয়াছেন।]

(২৫৬)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সতী সাধ্বী পতিব্রতা সাক্ষাৎ দেবতা!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সতী সাধ্বী পতিব্রতা সাক্ষাৎ দেবতা!"
পতিই পরম গতি, এই যার মতি,
আশ্রিতের প্রতি যিনি অতি দয়াবতী
শ্বশ্রূ-জনে দেখি যাঁর শির অবনত,
যা-ননদে প্রীতি যাঁর রহে অবিরত,
গুরু-জনে গুরু বলি' যাঁহার গণনা,
দোষী জনে দেখি' যিনি করেন মার্জ্জনা;
যাঁহার পরম প্রীতি সপত্নীর প্রতি,
তিনিই যথার্থ সতী,—হেন লয় মতি।
বর্ণিবে সতীর গুণ,—কাহার ক্ষমতা?
'সতী সাধ্বী পতিব্রতা সাক্ষাৎ দেবতা!'

(২৫৭)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সমুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সমুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই!"
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোমায় সাগর!
কে দিল তোমায় রম্য নাম রত্নাকর?
মহামূল্য রত্নগুলি রেখে দেছ পায়,
অতি তুচ্ছ ঘাস গুলা থ'রেছ মাথায়!

এ রস-সাগর বেশ বুঝিয়াছে ভাই,—
'সমুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই!'

(২৫৮)

এক ব্যক্তি দরিদ্রাবস্থায় কোন রাজ-বাটীতে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু রাজ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া পরিশেষে বিলক্ষণ ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। কোন কার্য্যের উপলক্ষে তিনি একবার তুলা করিয়া বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। রস-সাগর যেরূপ কুরূপ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কেহ দেখিবামাত্র বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন না। কৃতী দান করিবার সময় তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়াছিলেন। সেই কৃতীর এক জন কর্ম্মচারী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! করেন কি! ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের প্রধান সভা-পণ্ডিত।" তখন কৃতী একটু পরিহাস-পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "ইনিই কি রস-সাগর! সাবাস্, সাবাস্ সাবাস্।" এই পরিহাস-জনক বাক্যে রস-সাগর একটু রুষ্ট হইয়া এবং তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্।"

ধন্য রে বিধাতা তুই যখন যারে মাপাস্,
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা গাধার পিঠে চাপাস্;
তুলো কত্তে মূলো দান, বেরিয়ে পল্লো কাপাস্,
ডলতে ডলতে মাকাটী বেরুলো, 'সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্।'

(২৫৯)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে

দিলেন :—"সিংহ-সম পশু।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সিংহ-সম পশু।"

শিব-সম দেব নাই, শিবা-সম সতী,
পার্থ-সম বীর্য্যবান্, রাম-সম পতি;
কাশী-সম বাসস্থান, শেষ-সম ফণী,
গঙ্গাজল-সম জল, শুক-সম মুনি;
স্মর-সম ধনুর্দ্ধর, সূর্য্য-সম তাপ,
অগ্নি-সম সর্ব্বভুক্, চুরি-সম পাপ;
দুর্য্যোধন-সম মানী ধর্ম্ম-সম সুখ,
ব্যাস-সম গ্রন্থকার, রোগ-সম দুখ;
ভগীরথ-সম পুত্র, গুহ-সম বীর,
একলব্য-সম শিষ্য, শুক্র-সম ধীর;
স্বর্ণ-সম রম্য ধাতু, কর্ণ-সম দানী,
বিপ্র-সম গুরু বর্ণ, ভীষ্ম-সম জ্ঞানী;
বিদ্যা-সম শ্রেষ্ঠ ধন, ধ্রুব-সম শিশু,
চিত্ত-সম দ্রুতগামী, 'সিংহ-সম পশু।' (১)

(২৬০)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! দেবীসিংহ রংপুর প্রভৃতি স্থানের ইজারা লইয়া স্ত্রীলোক-গণের উপরি কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা এখন আপনাকে

(১) কবিবর স্বর্গীত দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে এই ভাবের একটী কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ণনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"সিংহীর দুর্গতি দেবী-সিংহের কবলে!" তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"সিংহীর দুর্গতি দেবী-সিংহের কবলে!"

দেবীসিংহ রংপুরের ইজারা লইয়া
প্রজাদের বহু কর দিল চাপাইয়া।
রাজা প্রজা হেন কর দিতে না পারিল,
ভীষণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে লাগিল।
দেবীসিংহ ধর্ম্মালয়ে দিনের বেলায়
বাটী হ'তে সতীকেও টানিয়া আনা
যে যে অত্যাচার হ'ত বালিকার প্রতি,
বারেক শুনিলে তাহা ফেটে যায় ছাতি।
বালিকার সম্মুখেই তাহার মাতার
করায় সতীত্ব-নাশ,—উঠে হাহাকার।
যে নারী সুন্দরী, পতি-পার্শ্বে রাখি' তারে,
উলঙ্গ করিয়া মারে নিতম্ব উপরে।
যে নারী যুবতী, তার ধরি' পয়োধর
ছুঁচ ফুটাইয়া দিত তাহে নিরন্তর।
বাঁশের বাঁকারী দিয়া কখন কখন
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিত রমণীর স্তন।
পতি পুত্র তনয়ার সম্মুখে থাকিয়া
ভূতলে পড়িত নারী মূর্চ্ছিত হইয়া।
রস-সাগরের উক্তি,—ওমা বসুন্ধরে!
দ্বিধা হও, যাই মাগো! তোমার উদরে!

রহিল অনেক কথা বলিতে বিরলে,—
'সিংহীর দুর্গতি দেবী-সিংহের কবলে!' (১)

(২৬১)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল!" রস-সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ এই-ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল!"

মহম্মদী বেগ্ যবে হ'য়ে আগুয়ান
হরণ করিয়াছিল সিরাজের প্রাণ,
তখন কে কোথা গেল পরিজন তাঁর,
বুক ফেটে যায়, যদি শুন একবার!
'আমিনা' সিরাজ-মাতা পরম রূপসী.
'ঘেসেটী' বেগম সেই সিরাজের মাসী।
মারণের আজ্ঞা ল'য়ে দুরন্ত বখর
ডুবাইল দুই জনে পদ্মার ভিতর।
সিরাজের যত সব বেগম আছিল,
এক এক ওমরার গৃহিণী হইল।
লুৎফ-উন্নিষার মত না ছিল রূপসী,
চিরদিন সিরাজের প্রেয়সী মহিষী।
"কার ঘরে গিয়া ঘর করিলে এখন
সিরাজ-মহিষি! রবে তুষ্ট তব মন?"

(১) মদীয় পরম-বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল প্রণীত "মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে" দেবীসিংহের অত্যাচারের কথা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

মীরণ যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল,
সিরাজ-মহিষী এই কথাটী বলিল,—
"করি-পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজ যাঁহার,
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে রুচি হয় কি তাঁহার?"
তিনি ও তাঁহার শিশু কন্যা কষ্ট স'য়ে
রহিলেন ইংরাজের বৃত্তিভোগী হ'য়ে।
ধন জন মান যত সকলি ফুরাল,
'সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল।'

(২৬২)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিলে তিনি রস-সাগরকে কহিলেন, "আমার কন্যার কি নাম রাখিব, তাহা আপনি স্থির করিয়া দিন। আমার ইচ্ছা যে, তাহার নাম 'সীতা' রাখি।" তখন রস-সাগর মহারাজকে কহিলেন, "সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!" মহারাজ এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলায় রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!"

হইল সীতার জন্ম মৃত্তিকার তলে,
পিতার দুর্জ্জয় পণ বিবাহের কালে।
পরশু-রামের সনে পথে যুদ্ধ হয়;
পতি সনে পঞ্চবটী-অরণ্যে আশ্রয়।
রাবণ হরণ করি' কেশপাশ ধ'রে
লঙ্কায় অশোক-বনে রাখে রোধ ক'রে।
অপযশে পাছে ব্যাপ্ত হয় ত্রিভুবন,
দিতে হ'ল শেষে অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ।

প্রজাগণ নানা কথা কহিতে লাগিল,
অবশেষে রামচন্দ্র বনবাস দিল।
অগ্নিও পবিত্র হয় পরশে যাঁহার;
তাঁহারো অদৃষ্টে অগ্নি-পরীক্ষা আবার!
দুঃখে দুঃখে কেটে গেল সীতার জীবন,
'সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!'

(২৬৩)

একদিন রস-সাগর রামায়ণ-গান শুনিয়া আসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রকে কথায় কথায় বলিলেন, "সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!" মহারাজ বলিলেন, "একথা অসম্ভব!" তখন রস-সাগর এই সমস্যা পূরণ করিয়া নিজ মতের সার্থকতা প্রদর্শন করিলেন।

সমস্যা—"সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!"

(সীতা-হরণের পরেই রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে কুটীরে দেখিতে না পাইয়া বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন রাম "সীতা, সীতা' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও উত্তর না পাওয়ায় ক্রোধভরে সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন।)

কোথায় কোথায় সীতে! গেলে এ সময়,
এখনি উত্তর দাও,—ব্যাকুল হৃদয়!
এখনি আইস হেথা, ফাটিছে পরাণ,
এই ছিলে, এই কোথা হ'লে অন্তর্দ্ধান?
সমুদায় পঞ্চবটী-বনে ঠাঁই ঠাঁই
খুঁজিতেছি দুই ভাই,—তবু দেখা নাই!
বুঝিলাম পরিহাস করিবে বলিয়া
পম্পা-মধ্যে পদ্ম-বনে আছ লুকাইয়া।

এখনো উত্তর নাই জনক-নন্দিনি!
বুঝিনু তোমার মত না আছে পাষাণী!
'সর্ব্বংসহা' মাতা তব, পেটে জন্মি' তার
সব সহ্য হয় তব, বুঝিলাম সার।
দশরথ মোর পিতা,—দিয়া মোরে বনে
সহ্য না করিতে পারি' ম'রেছেন প্রাণে!
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল,—
'সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!' (১)

(২৬৪)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।"

শরতের জলধরে গভীর গর্জ্জন করে
কিন্তু হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল।
প্রাবৃটের বারিধারে কভু নাহি শব্দ করে
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল॥
যেই জন নীচ হয় কার্য্য তার নাহি রয়
কেবল বাক্যই তার মুখে নিরন্তর।

(১) এই কবিতাটীর ভাব নিম্ন লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়:—
বিস্তর বিস্তর বাচং কুত্র সীতে গতা ত্বং
বিরমতু পরিহাসঃ সর্ব্বথা দুঃসহো মে।
ত্বমসি খলু তনুজা হন্ত সর্ব্বংসহায়াঃ
সুতবিরহবিমুক্তপ্রাণরাজাত্মজোঽহম্॥
মৎপ্রণীত উদ্ভটসাগরঃ (দ্বিতীয়-প্রবাহঃ) ১৮ শ্লোকঃ

সুজন মুখে না বলে কার্য্য করে যথাকালে
'সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর॥'

(২৬৫)

'একবার রস-সাগর মহাশয় পীড়িত হইলে রাজবৈদ্য তাঁহার বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় রাজবৈদ্য প্রশ্ন করিলেন, "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।" তখন রস-সাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা— "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"

অসহ্য যন্ত্রণা যবে মাথায় ভিতর,
গলার ভিতর যবে মন্দ হয় স্বর?
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে জ্বরানল,
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যবে ইন্দ্রিয় সকল,
রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া
হাহাকার করে যবে কাতর হইয়া,
হায় রে তখন আর হেন কোন জন
সে সব নাশিয়া করে শান্তি বিতরণ!
তাই বলি এসংসারে সুবৈদ্যই সার,
'সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"

(২৬৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! কিরূপ লোক কবিতা ভালবাসে।' তখন রস-সাগর কহিলেন, "যে ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রসিক, তিনিই কবিতা ভাল বাসেন। অন্যে ইহা ভাল বাসেন না।" ইহা শুনিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটী পূর্ণ

এখনো উত্তর নাই জনক-নন্দিনি!
বুঝিনু তোমার মত না আছে পাষাণী!
'সর্ব্বংসহা' মাতা তব, পেটে জন্মি' তার
সব সহ্য হয় তব, বুঝিলাম সার।
দশরথ মোর পিতা,—দিয়া মোরে বনে
সহ্য না করিতে পারি' ম'রেছেন প্রাণে!
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল,—
'সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!' (১)

(২৬৪)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।"

শরতের জলধরে গভীর গর্জ্জন করে
কিন্তু হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল।
প্রাবৃটের বারিধারে কভু নাহি শব্দ করে
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল॥
যেই জন নীচ হয় কার্য্য তার নাহি রয়
কেবল বাক্যই তার মুখে নিরন্তর।

(১) এই কবিতাটীর ভাব নিম্ন লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়:—
বিতর বিতর বাচং কুত্র সীতে গতা ত্বং
বিরমতু পরিহাসঃ সর্ব্বথা দুঃসহো মে।
অমসি খলু তনূজা হন্ত সর্ব্বংসহায়াঃ
সুতবিরহবিমুক্তপ্রাণরাজাত্মজোঽহম্॥
মৎপ্রণীত উদ্ভটসাগরঃ (দ্বিতীয়-প্রবাহঃ) ১৮ শ্লোকঃ

সুজন মুখে না বলে কার্য্য করে যথাকালে
'সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর॥'

(২৬৫)

একবার রস-সাগর মহাশয় পীড়িত হইলে রাজবৈদ্য তাঁহার বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় রাজবৈদ্য প্রশ্ন করিলেন, "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।" তখন রস-সাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা— "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"
অসহ্য যন্ত্রণা যবে মাথার ভিতর,
গলার ভিতর যবে মগ্ন হয় স্বর?
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে জ্বরানল,
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যবে ইন্দ্রিয় সকল,
রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া
হাহাকার করে যবে কাতর হইয়া,
হায় রে তখন আর হেন কোন জন
সে সব নাশিয়া করে শান্তি বিতরণ!
তাই বলি এসংসারে সুবৈদ্যই সার,
'সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"

(২৬৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! কিরূপ লোক কবিতা ভালবাসে।' তখন রস-সাগর কহিলেন, "যে ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রসিক, তিনিই কবিতা ভাল বাসেন। অন্যে ইহা ভাল বাসেন না।" ইহা শুনিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটী পূর্ণ

এখনো উত্তর নাই জনক-নন্দিনি!
বুঝিনু তোমার মত না আছে পাষাণী!
'সর্ব্বংসহা' মাতা তব, পেটে জন্মি' তার
সব সহ্য হয় তব, বুঝিলাম সার।
দশরথ মোর পিতা,—দিয়া মোরে বনে
সহ্য না করিতে পারি' ম'রেছেন প্রাণে!
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল,—
'সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!' (১)

(২৬৪)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর।"

শরতের জলধরে গভীর গর্জ্জন করে
কিন্তু হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল।
প্রাবৃটের বারিধারে কভু নাহি শব্দ করে
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল॥
যেই জন নীচ হয় কার্য্য তার নাহি রয়
কেবল বাক্যই তার মুখে নিরন্তর।

(১) এই কবিতাটীর ভাব নিম্ন লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়:—

বিতর বিতর বাচং কুত্র সীতে গতা ত্বং
বিরমতু পরিহাসঃ সর্ব্বথা দুঃসহো মে।
ত্বমসি খলু তনূজা হন্ত সর্ব্বংসহায়াঃ
সুতবিরহবিমুক্তপ্রাণরাজাত্মজোঽহম্॥

মৎপ্রণীত উদ্ভটসাগরঃ (দ্বিতীয়-প্রবাহঃ) ১৮ শ্লোকঃ

সুজন মুখে না বলে কার্য্য করে যথাকালে
'সুজন-দুর্জ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর॥'

(২৬৫)

একবার রস-সাগর মহাশয় পীড়িত হইলে রাজবৈদ্য তাঁহার বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় রাজবৈদ্য প্রশ্ন করিলেন, "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।" তখন রস-সাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা— "সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"
অসহ্য যন্ত্রণা যবে মাথার ভিতর,
গলার ভিতর যবে মগ্ন হয় স্বর?
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে জ্বরানল,
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যবে ইন্দ্রিয় সকল,
রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া
হাহাকার করে যবে কাতর হইয়া,
হায় রে তখন আর হেন কোন জন
সে সব নাশিয়া করে শান্তি বিতরণ!
তাই বলি এসংসারে সুবৈদ্যই সার,
'সুবৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।"

(২৬৬)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! কিরূপ লোক কবিতা ভালবাসে।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "যে ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রসিক, তিনিই কবিতা ভাল বাসেন। অন্যে ইহা ভাল বাসেন না।" ইহা শুনিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটী পূর্ণ

করিতে দিলেন। "সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা— "সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়!"

কবিতার রস-পান করে যেই জন,
শোক দুঃখ যত তার করে পলায়ন।
পণ্ডিত না মজে যদি কবিতার রসে,
প্রেমিক রসিক বলি কে তারে সম্ভাষে!
অতি পুরাতন এই সৃষ্টি বিধাতার,
কবি কত নব সৃষ্টি করে অনিবার।
খাদ্যে ছয় রস-সৃষ্টি বিধির বিধান,
কবির কাব্যেতে নয় রস বিদ্যমান।
হেন কবিতায় মন নাহি মজে যার,
সে জন অরণ্যে গিয়া করুক বিহার!
ভক্ষণ করুক তথা নিত্য ঘাস পাতা,
পশু সনে সেই জন করুক মিত্রতা।
অরসিক মূর্খ জন কবিতা না চায়,
"সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়!'

(২৬৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই জটিল সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন:—"সূর্য্য-সম পদ্মিনীর শত্রু কেহ নাই!" রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তি অসীম। তিনি এইভাবে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"সূর্য্য-সম পদ্মিনীর শত্রু কেহ নাই!"

(পদ্মিনীর আক্ষেপোক্তি)

আমার জীবন-রূপ জীবন নাশিতে
আকাশেতে উঠে সূর্য্য হাসিতে হাসিতে।
সহস্র-করের করে ব্যথিত হইয়া
চারিদিকে দল গুলি দিই ছড়াইয়া।
হাড়ে মাসে জ্বালাইয়া মোরে সারাদিন
সূর্য্য ঢ'লে যায়,—আমি হ'য়ে পড়ি ক্ষীণ।
নয়ন মুদিয়া তাই বসিয়া বিরলে
বিশ্রাম করিয়া থাকি সন্ধ্যাকাল হ'লে।
এ রস-সাগর আজ বলিতেছে তাই,
"সূর্য্যসম পদ্মিনীর শত্রু কেহ নাই।"

(২৬৮)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "সেই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মে মতি যার।" রস-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সেই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মে মতি যার।"

যাবতীয় জন্তু মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর ;
পুরুষ নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিরন্তর।
পুরুষ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণ-গণের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ যে জন!
বিদ্বান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ অর্থজ্ঞ হইলে,
অর্থজ্ঞের শ্রেষ্ঠ বাক্-পটুতা থাকিলে।
বাক্-পটুদিগের শ্রেষ্ঠ লোকজ্ঞ যে জন,
লোকজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-পরায়ণ।

এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,
"সেই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মে মতি যার।'

(২৬৯)

একবার সমস্যা উঠিল, "সেই ত বটে এই!" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সেই ত বটে এই!"

তরি বৈ আমার হরি। আর কিছুই নেই,
চরণ দুখানি আন, আপনি ধুয়ে দেই।
নাবিক স্বজাতি পদ পরশিল যেই,
ভবের কাণ্ডারি হরি, 'সেই ত বটে এই!'

[ব্যাখ্যা। নাবিক, রামচন্দ্রকে নদীর অপর পারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার চরণ ধৌত করিবার সময় ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিল যে, ইনিই ভব-নদী পার করিবার কাণ্ডারি স্বয়ং নারায়ণ।]

(২৭০)

কোন সময়ে প্রশ্ন হইল, "সেই ত যেতে হ'ল!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"সেই ত যেতে হ'ল!"

চন্দ্রাবলী সহ কেলি যদি ইচ্ছা ছিল,
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল,
সুখের যামিনী তব দুঃখে পোহাইল,
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে 'সেই ত যেতে হ'ল।'

(২৭১)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র স্বয়ং গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

তিনি রস-সাগরকে লইয়া মধ্যে মধ্যে সমস্যা পূর্ণ করাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "সেই নব-ঘন-শ্যামে!" রস-সাগর তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর প্রদান করিলেন।

সমস্যা—"সেই নব-ঘন-শ্যামে!"

শুন শুন বলি তোরে ওরে মোর মন!
'নব'-শব্দ ভাল বাস তুমি বিলক্ষণ।
নবদ্বীপ-অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
কি দুর্গতি না স'য়েছ তাঁহার সভায়!
নবকৃষ্ণ মহারাজা শোভাবাজারের রাজা
কিবা সাজা না পেয়েছ যাইয়া তথায়।
আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব বাঙ্গালায় সুপ্রভাব
তাঁর মত ধনী মানী নাই বঙ্গ-ধামে।
'নব'-শব্দ যদি চাও তবে ইথে কাণ দাও
ধর ধর গিয়া "সেই নব-ঘন-শ্যামে!" (১)

[প্রস্তাব। গুপ্তিপাড়া-নিবাসী কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ

(১) রস-সাগর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালা কবিতাটী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র :—

আলীবর্দ্দিনবাবমপ্যথ নবদ্বীপেশ্বরঞ্চাশ্রিতং
তৎপশ্চান্নবকৃষ্ণভূপতিমমুং রে চিত্ত বিত্তাশয়া।
সর্ব্বত্রৈব নবেতিশব্দঘটিতং ত্বঞ্চেৎ কমালম্বসে
তদ্ দেবং পরমার্থদং নবঘনশ্যামং কথং মুঞ্চসি॥"

মৎপ্রণীত উদ্ভটসাগরঃ (তৃতীয়-প্রবাহঃ) ৩১ শ্লোকঃ।

শোভাবাজার-পতি মহারাজ নবকৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে উদর-চিন্তায় নানা ধনাঢ্যের দ্বারস্থ হইয়া স্তুতিবাদ করিতে হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কেও তাহা করিতে হইয়াছিল। জীবনের শেষ-দশায় মনের আবেগে নিতান্ত অনুতাপ করিয়া তিনি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন।]

(২৭২)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি একদিন রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন, "সেই পূর্ণব্রহ্মে আমি করি নমস্কার!" তদনুসারে রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"সেই পূর্ণব্রহ্মে আমি করি নমস্কার!"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—মূর্ত্তি ধরিয়াই
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যিনি করেন সদাই;
কিবা জল, বায়ু, ব্যোম, অগ্নি আর ক্ষিতি,—
এই পঞ্চ ভূত ক্ষুদ্র যাঁহার মূরতি;
এক হইয়াও যিনি অনন্ত-ভুবন
তন্ন তন্ন করি সদা করেন দর্শন;
সকলেরি একমাত্র যিনিই আশ্রয়,
অচিন্ত্য মহিমা যাঁর, যিনি দয়াময়;
যিনি দেব পরাৎপর, সকলেরি সার,
'সেই পূর্ণব্রহ্মে আমি করি নমস্কার!'

(২৭৩)

একদিন সভায় একজন একটী সমস্যা দিলেন, "সেই সীতে আসিছে!" রস-সাগর তাহা তখনই পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা— 'সেই সীতে আসতে।'

কহেন রাম, হে রাম! কি হারাইলাম সীতে!
কেন বা চাহিলে সীতে! সংগ্রামে আসিতে?
সান্ত্বাইলেন হনুমান্ হাসিতে হাসিতে,
জান কি জানকী-নাথ! জনক-দুহিতে?
অচৈতন্য না থাকিলে তবে ত দেখিতে,—
শতস্কন্ধে বধি' রণে করাস্ত্র-অসিতে
সমর-সাগরে নাচে 'সেই সীতে অসিতে।'

[প্রস্তাব: যখন রামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিতে যান, তখন সীতাদেবী তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সম্মুখ-সমরে শতস্কন্ধের বাণ-বর্ষণে অচেতন হইয়া পড়েন। তখন সীতাদেবী রামচন্দ্রের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন ও শতস্কন্ধের গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অসিতা-মূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক শতস্কন্ধের প্রাণ সংহার করিলেন। রাম সংজ্ঞা-লাভ করিলেন, কিন্তু সীতাদেবীকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ চিন্তিত হইলেন। তখন সীতাদেবী অসিতা-মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে ছিলেন। হনুমান রামচন্দ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকটে বর্ণনা করিলেন।]

(২৭৪)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাম-গোপাল অত্যন্ত ধূমপান করিতেন। ধূমপান করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান ব্রত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরমানন্দ-নামক এক জন ভৃত্য রামগোপালের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। ভৃত্যের যত গুলি দোষ থাকা সম্ভবপর, পরমানন্দের সে সমস্ত

দোষই বিদ্যমান ছিল তবে সে ব্যক্তি উত্তম-রূপে তামাক সাজিয়া রামগোপালকে সন্তুষ্ট করিত বলিয়া রামগোপাল তাহাকে প্রাণের মত ভাল বাসিতেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরের নিকটে এই গল্প করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, "সে চাকরে ঘরে কভু নাহি দিও স্থান।" তখন রস-সাগরও এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিলেন :—

সমস্যা—"সে চাকরে ঘরে কভু নাহি দিও স্থান।"

কাজ কর্ম্ম নাহি করে, কড়া কথা কয়,
দয়া মায়া নাই, কথা বুঝিয়া না লয় ;
মনে মনে অভিমান রাখে বিলক্ষণ,
শঠতায় পরিপূর্ণ রাখে সদা মন ;
যতই দাও না কেন, তুষ্ট নাহি হয়,
অন্নদাতা মণিবের ভক্ত কভু নয় ;
এই সব দোষ যার রহে বিদ্যমান,
'সে চাকরে ঘরে কভু নাহি দিও স্থান।'

(২৭৫)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলেন :—"সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী!" রস-সাগর মহাশয় মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী!"

যে নারী পতির প্রতি দয়া না রাখিয়া
কেবল তাহার ধনে রহে তাকাইয়া ;

যে নারী পতির হৃদি হানি' বাক্য-বাণ
বিদীর্ণ করিয়া তাহা করে খান্ খান্;
যে নারী তনয় কিংবা তনয়ার প্রতি
নাহি রাখে দয়া মায়া কিংবা আর প্রীতি;
যে নারী চীৎকার করি' ফাটায় মেদিনী,
যে নারী করয়ে গৃহ অশান্তির খনি;
যে নারী সর্ব্বদা করে নাসিকা-কুঞ্চন,
যে নারী সর্ব্বদা বলে অপ্রিয় বচন;
যে নারী উন্মত্ত রহে লইয়া কলহ,
যে নারী বিবাদ-চিন্তা করে অহরহ;
যে নারী পিতার গৃহে করিয়া গমন
যার তার ঘরে করে শয়ন ভোজন;
এ রস-সাগর কহে,—দেখহ বিচারি'
'সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী!'

(২৭৬)

একদিন এক পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণ-নগরে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রস-সাগর তখন রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতেই উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনি পরম বুদ্ধিমান্ পুরুষ।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর কহিলেন, "সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে!" তখন উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলায় তিনি এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে!"

উন্নত হবার তরে হয় অবনত,
জীবন রাখিতে করে জীবন নিহত;
দুঃখ পায় সুখ-ভোগ করিবার তরে,
'সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে।

(২৭৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন বন্ধু রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন,—"স্থানচ্যুত হ'লে আর শোভা থাকে কার?" রস-সাগর তাহা এইভাব দিয়া পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"স্থানচ্যুত হ'লে আর শোভা থাকে কার?"

কুলবধূ রাজা মন্ত্রী বিপ্র নর স্তন
দন্ত কেশ নখ,—এই নয়টী রতন।
স্বস্থানে থাকিলে তবে তাদের সম্মান,
স্থানচ্যুত হ'লে কিন্তু নাহি পায় মান।
যাহার যে স্থান, তাহে শোভা হয় তার,
'স্থানচ্যুত হ'লে আর শোভা থাকে কার?'

(২৭৮)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন সভাসদ্ রস-সাগরকে নিম্নলিখিত জটিল প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, এবং রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দান করিয়া ছিলেন।

সমস্যা—"স্বমাতা সধবা, কিন্তু বিধবা বিমাতা।"

অনিয়ে মানব-লীলা করি সংবরণ
করিলা শান্তনু রাজা স্বর্গে আরোহণ।

ভাবেন বিস্ময়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা,
"স্বমাতা সধবা, কিন্তু বিধবা বিমাতা।'

(২৭৯)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে কিরূপ মহা সমারোহ হইয়াছিল, তাহা এখনই আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!" বাঙ্গালা-দেশের ঐতিহাসিক কথা রস-সাগর মহাশয়ের কণ্ঠস্থ ছিল। এই সমস্যাটী শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে গঙ্গা-গোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ বর্ণনা করিলেন :—

সমস্যা।—"হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!"

মুরশিদাবাদ-জেলা খ্যাত বাঙ্গালায়,
কাঁদী-নগরের নাম প্রসিদ্ধ তথায়।
শ্রীগঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ তথায় থাকিয়া
করিলেন মাতৃশ্রাদ্ধে সমারোহে ক্রিয়া।
এই শ্রাদ্ধে হ'য়ে ছিল কিবা সমারোহ,
করে নাই, করিছে না, করিবে না কেহ।
স্বয়ং হেষ্টিংস, বন্ধু বারোয়েল তাঁর
শ্রাদ্ধের সভায় দোঁহে করেন বিহার।
দেশের রাজারে সিংহ ভূস্বামী ভাবিয়া
নিজ শাল পেতে দেন সম্মান করিয়া।

এই মানে সম্মানিত জেমো-রাজ-গণ
অদ্যাপি শ্রাদ্ধের কথা করেন কীর্ত্তন।
নদীয়ার নাটোরের আসন প্রথমে,
বর্দ্ধমান দিনাজপুর রন্ ক্রমে ক্রমে।
ক্রমে বসিলেন অগ্রদ্বীপ যশোহর,
এইরূপে বসিলেন সবে পর পর
কৃষ্ণচন্দ্র দয়ারাম পীড়িত থাকায়
কিছুতে না পারিলেন যাইতে তথায়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞা লইয়া তখন
শিবচন্দ্র কাঁদী-ধামে করেন গমন।
কিবা রাজা মহারাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
সভায় যাইয়া তাহা করেন মণ্ডিত।
লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু গিয়া পুরাইল মাঠ,
চতুর্দ্দিক্ হ'তে এল লক্ষ লক্ষ ভাট।
কত শত বাসা বাড়ী নির্ম্মিত হইল,
নানাবিধ সিধা তথা পৌঁছিতে লাগিল।
চাউল, ডাউল, মস্লা যায় গাড়ি গাড়ি,
হুলস্থূল প'ড়ে গেল সকলেরি বাড়ী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল রাখিবার তরে
বড় বড় খাত কেটে রাখে থরে থরে।
মিষ্টান্নের কত নাম কে করে সন্ধান,
প্রত্যেক বাসার কাছে পর্ব্বত-প্রমাণ।
হেন কোন ফল নাহি ছিল বাঙ্গালায়,
যাহা নাহি পৌঁছিল বাসায় বাসায়।

বিবিধ আনাজ-দ্রব্য রন্ধনের তরে
বিরাজ করিল গিয়া প্রত্যেকের ঘরে।
তাকিয়া তোষক লেপ বালিস বিছানা,
খাট পালঙ্কের সংখ্যা নাহি যায় গণা।
সন্ধ্যা আহ্নিকের বন্দোবস্ত হ'ল খাসা,
কোষা কুসী ফুলে পূর্ণ হ'ল সব বাসা।
কোমর বাঁধিয়া শিবচন্দ্র যুবরাজ
দেওয়ানের সভাস্থলে করেন বিরাজ।
চতুর্দ্দিকে যুবরাজ করি' নিরীক্ষণ
দেওয়ান বাহাদুরে কহেন তখন,—
"দেখি আজ বাহাদুর! গৃহে আপনার
হইয়াছে ঠিক দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার।"
ইহা শুনি' বাহাদুর তখন হাসিয়া
শিবচন্দ্রে কহিলেন বিনয় করিয়া,—
"আমার মাতার শ্রাদ্ধ দক্ষ-যজ্ঞ হ'তে
অনেকাংশে বড় আমি বলি বিধিমতে।
দক্ষের যজ্ঞেতে শিব না পেলেন স্থান,
মোর মাতৃশ্রাদ্ধে 'শিব' নিজে বিদ্যমান।
শুনিয়া সভাস্থ লোক বলিয়া উঠিল,—
"ধন্য তব মাতৃ-শ্রাদ্ধ-সভা আজ হ'ল।
রাখিলে মানীর মান, দেখালে বিনয়,
আপনারে ছোট দেখে বড় যেই হয়!"
দেওয়ান সিংহের কিবা ভাণ্ডার মজুত,
জানিবারে শিবচন্দ্র হ'লেন প্রস্তুত।

শিবচন্দ্রে যত সিধা পাঠান্ দেওয়ান,
তাহা তিনি ভিক্ষুকেরে করেন প্রদান।
পুনঃ পুনঃ যত সিধা আসিতে লাগিল,
সমস্তই শিবচন্দ্র প্রদান করিল।
তখন বুঝেন শিবচন্দ্র মহাশয়,
সিংহের ভাণ্ডার কভু ফুরাবার নয়।
সোণা রূপা শাল খাটে হইয়া মণ্ডিত
ব্রাহ্মণীর করে দেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র আর ধন
পাইয়া ভিক্ষুক-গণ করে আগমন।
এ শ্রাদ্ধের কথা কেবা না করে সম্মান,
'হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!'

(২৮০)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজ-সভায় বসিয়া রস-সাগর মহাশয়কে বলিলেন, "আপনাকে অদ্য একটী জটিল সমস্যা পূরণ করিতে দিব।" ইহা বলিয়া তিনি এই সমস্যাটী দিলেন,—"হরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা।" রস-সাগর মহারাজের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষণ-বিলম্ব-ব্যতিরেকে উহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"হরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা।"

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত,—এই সবে বলে,
তাঁর মত বিষ্ণুদ্বেষী নাই ভূমণ্ডলে।
কৃষ্ণচন্দ্র শুনিয়াই কাণে এই কথা
মনে মনে পাইলেন নিদারুণ ব্যথা।

শিবচন্দ্রে ডাকি' কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
কহিলেন—"গঙ্গাবাসে যাও শীঘ্রগতি।
বন্দোবস্ত কর গিয়া তুমিই এখন,
হরি-হর-মূর্ত্তি তথা করিব স্থাপন!
হরি-হরে ভেদ নাই,—দেখাতে সকলে
এই মূর্ত্তি খানি আমি রচিব কৌশলে
ইহা হ'তে নাহি আর বিষম সুষমা,
'হরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা।'

[প্রস্তাব। একদা কবিবর সাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! কৃষ্ণনগরের অধিবাংশ লোকে বলেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ ঘোর শাক্ত, তাঁহার সভাসদ্ রামপ্রসাদ সেনও সেইরূপ শাক্ত। উভয়েই ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। ইহা শুনিয়াই মহারাজ হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তুমি এখনই গঙ্গাবাসে গমন করিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আইস। আমি সেস্থানে শীঘ্রই হরিহর-মূর্ত্তি স্থাপন করিব।" মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় নবদ্বীপের নিকটে থাকিবার অভিলাষে কৃষ্ণনগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ও নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকনন্দা-নদীর তীরস্থিত একস্থানে নানা মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ স্থানের নাম "গঙ্গাবাস" রাখিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে "হরিহর-মূর্ত্তি" স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তিনি এই বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গঙ্গাবাসে যে সকল সুরম্য প্রাসাদ ছিল, তাহা প্রায় সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে; কেবল হরিহর-মূর্ত্তির মন্দিরটী

অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১১৮৩ বঙ্গাব্দে (১৬৯৮ শকাব্দে বা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১)

(২৮১)

একদা প্রশ্ন উঠিল, "হরিনামে খোঁজ নাই, ফটুকে রাঙা খোপ।" রস-সাগর ইহা এইভাবেই পূরণ করিয়া ছিলেন :—

সমস্যা—"হরিনামে খোঁজ নাই, ফটুকে রাঙা খোপ।"

ত্রাস পেয়ে গন্ধকালী বলেন হনুমানে,
সাবধান হ'য়ো বাপু! কালনিমার স্থানে।
অতিথি করিয়া ব্যাটা ধর্ম্ম কল্লে লোপ,
'হরিনামে খোঁজ নাই, ফটুকে রাঙা খোপ।'

(২৮২)

একদা রাজ-সভায় "হরিনাম" হইতেছিল। মহারাজ তাহা শুনিয়া রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিলেন, "হরি বোল হরি।" রস-সাগর তক্তিভরে তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"হরি বোল হরি।"

১ম পূরণ।

নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে,
মুনিগণ যজ্ঞ-স্থলে, রাক্ষসী সংহারি।

---

(১) এই মন্দিরের উপরি-ভাগে যে একটী সংস্কৃত শ্লোক অদ্যাপি লিখিত আছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন :—

"গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যহ্নগতহকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।
কেন্দ্রং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজতাং প্রস্থাপ্য
মন্বৈতব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়াঽস্থাপয়ল্লোলয়া চ।"
মৎপ্রণীত উদ্ভট-সাগরঃ (তৃতীয়-প্রবাহঃ) ৩৬৮ শ্লোকঃ।

পরাশ চরণ-রেণু, পাষাণী মানবী তনু,
নাবিকেরে দিলা পুনঃ স্বর্ণময়ী তরি ॥
জনক-রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু-শরাসনী,
রামসীতা-সুমিলন, মিথিলা-নগরী।
ত্যজি' রাজ্য আধিপত্য, সঙ্গী সহ আনুগত্য,
পালিতে পিতার সত্য, হ'লে বনচারী ॥
সেতুবন্ধ জলনিধি, সবংশে রাবণ বধি,
বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কা-পুরী।
জানকী হেন কি পাপী, জলন্ত অনলে ক্ষেপি',
কোমলাঙ্গ পুনরপি, নিসা দগ্ধ করি ॥
গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যাঁর মাতা পিতা,
বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম্ম বিচারি'।
এ রস-সাগরে উক্তি, এবে তো পাইলা যুক্তি,
যদি বল হবে মুক্তি, 'হরি বোল হরি ॥'

এই কবিতাটী শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, "অন্যরূপে পূর্ণ করুন।" রস-সাগর "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বিতীয় বার ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

২য় পূরণ।

ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতলে যান,
দেব-দ্বিজ-অপমান, অবিচার পুরী।
সার্ব্বভৌম নৃপ যিনি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি,
কলিকাতা রাজধানী, বন্যা হলো ভারী ॥
দেশে ধান্য নাহি আর, প্রজা করে হাহাকার
কহিতে শকতি কার, অন্ন-কষ্টে মরি।

এ রস-সাগরে স্থল, সাজাইয়া ভূমণ্ডল,
শেষে দিলা দাবানল, 'হরি বোল হরি।'

[ব্যাখ্যা। বন্যা—১২৩০ বঙ্গাব্দের (১৮২৪ খৃষ্টাব্দের) বন্যা। ত্রিশ সালের বন্যার সময়ে রস-সাগরের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর। বন্যায় দেশের ভীষণ দুরবস্থার কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। "তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়,"—এই সমস্যায় এই বন্যার কথা বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে।]

(২৮৩)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে নিমন্ত্রণ করিয়া উভয়ে বসিয়া এক গৃহে আহার করিতেছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল,—আম্রের সময়। পরিবেষণ-কর্ত্তা উভয়কেই আম্র-পরিবেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু মহারাজের পাতে যে আম্রগুলি পড়িয়াছিল, তাহা সমস্তই অত্যন্ত মিষ্ট, এবং রস-সাগরের পাতের আম্রগুলি অত্যন্ত টক্। তখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে মহারাজকে কহিলেন, "হরির অদৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল!" এই কথা শুনিয়া মহারাজ তাঁহার এই সমস্যাটী তাঁহাকেই পূর্ণ করিতে বলিলেন:—

সমস্যা—'হরির অদৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল!"

কিবা বিদ্যা, কি পৌরুষ,—কিছু কিছু নয়,
অদৃষ্টই বলবান্,—জানিও নিশ্চয়।
সমুদ্র-মন্থন-শেষে এই হ'ল ফল,—
'হরির অদৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল!'

(২৮৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের "অনুকূল দাস" নামক এক ভৃত্য ছিল। তাহার অশেষ দোষ থাকায় মহারাজ একদিন কথায়

কথায় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "হরি! হরি! ভাগ্যে মোর অনুকূল দাস।" এই প্রশ্ন শুনিয়া রস-সাগরের রসের ভাণ্ড উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া মহারাজকে এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

সমস্যা—"হরি! হরি! ভাগ্যে মোর অনুকূল দাস।"

রাত্রিকালে গলি গলি করেন ভ্রমণ,
দিয়াদেন লজ্জা ভয় সব বিসর্জ্জন,
পড়িলে কাজের কথা চুপ ক'রে রন্,
বহু পেলে তবে তুষ্ট, অল্পে রুষ্ট হন্,
ঢুক্ ঢুকে বেশ পটু, কটু বাক্য মুখে,
চটুল নয়ন দুটী, সদা রন্ সুখে,
বেলের মতন তাঁর এক এক গ্রাস,
'হরি! হরি! ভাগ্যে মোর অনুকূল দাস।

(২৮৫)

কোন সময়ে সমস্যা উঠিয়াছিল, "হরগিজ্।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন:—

সমস্যা—"হরগিজ্।"

সর্ব্বস্ব কালের ঘরে রেখেছি মরগিজ্,
আশি লক্ষ বারেও আমার ঘুচলো না খিরকিজ্!
ভাগ্যহীন দুষ্ট মন সব নষ্টের বীজ,
এবে এখন কালী-পদ ধরলি নে 'হরগিজ্।'

[ব্যাখ্যা। মরগিজ—ইংরাজী শব্দ মর্টগেজ—বন্ধক দেওয়া। খিরকিচ্—অবশিষ্ট ভাগ; দোষ। হরগিজ—কোন মতেই।]

(২৮৬)

কোন সময়ে এক জন সমস্যা দিলেন, "হাট শুদ্ধ এই তো।" রুভকবি রস-সাগরও পশ্চাৎপদ না হইয়া তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"হাট শুদ্ধ এই তো।"

দেহের গৌরব মন, পর-ভার্য্যা পর-ধন,
বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কুর নাই তো।
পশু পক্ষী কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে,
দেহ রত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেই তো॥
এ রস-সাগর মত্ত, সম্পদ্ গিরীশ-দত্ত,
থাকিলে কিঞ্চিৎ স্বত্ব, পরিচয় দেই তো।
মন তুমি বড় মন্দ, ত্যজি' কালী-পাদ-পদ্ম,
কাল-পাশে হ'লে বদ্ধ, 'হাট শুদ্ধ এই তো॥'

(২৮৭)

একবার সমস্যা হইল, "হাটে মামা হারালাম।" রস-সাগর ব্যক্তি-বিশেষ ও ঘটনা-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন:—

সমস্যা—"হাটে মামা হারালাম।"

ঘরে ঘরে বাঁধাবাঁধি,—কেন লাঠি ধরালাম,
অভাগা খুল্লনার মত বনে ছাগ চরালাম।
যা ছিল' সঞ্চিত ধন,—নেড়ের বুক ভরালাম,
নীল-কমল বাবু কাঁদে, 'হাটে মামা হারালাম।'

[প্রস্তাব। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কিছু পূর্ব্বে রাণাঘাট-নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গত নীলকমল পাল চৌধুরী মহাশয়ের "ছাগল

মায়া" মকদ্দামার কথা সকলেরই স্মৃতিপথে অবস্থিত ছিল। এই বাবুর মাতুল মহাশয় এই মকদ্দামায় বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই রস-সাগর উক্ত সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন।]

(২৮৮)

একদিন শান্তিপুর-নিবাসী রস-সাগরের এক বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "হাটের ন্যাড়া হুজুক্ চায়।" রস-সাগর তখনই তাহা পূরণ করিয়া বন্ধুকে প্রীত করিয়া ছিলেন।

সমস্যা—"হাটের ন্যাড়া হুজুক্ চায়।"

উকীল খোঁজেন মকদ্দামা, কোকিল বসন্ত গায়,
অগ্রদানী গণেন নিত্য,—কোন্ দিন কে অক্কা পায়।
সাধু খোঁজেন পরমার্থ, লম্পট খোঁজেন বেশ্যারায়,
গোলমালেতে রেস্ত ফেলে, 'হাটের ন্যাড়া হুজুক্ চায়।'

(২৮৯)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের এক জন ভৃত্য স্বরিতানন্দ (গাঁজা) ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন করিত। সে ব্যক্তি একদিন রাজ-সভায় আসিয়া নেশার ঝোঁকে মহারাজের কোন কথার, উত্তর দিতে পারে নাই। তখন সে গাঁজার নেশায় অভিভূত ছিল। তখন মহারাজ রস-সাগরের দিকে সহাস্য-বদনে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "হায় রে স্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি।" রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"হায় রে স্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি!"

আগ্রহে কিনিতে চায় নবাবের হাতী,
চাকর রাখিতে চায় নবাবের নাতি।

মাথায় দিইতে চায় নবাবের ছাতি,
নজর মারিতে চায় বেগমের প্রতি।
বিবিধ নেশার ঝোঁকে এসব দুর্গতি,
'হায় রে ত্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি!'

(২৯০)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অন্যান্য লোকের নিকটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থার সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে ছিলেন। তখন রস-সাগর মহারাজকে কহিলেন, "আপনার গুণধর বাজপেয়ী খুড়া মহাশয়ই আপনার যাবতীয় মূল্যবৎ বস্তু আত্মসাৎ করিয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহারাজ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হায় রে পিতৃব্য!" তখন রস-সাগর এই সমস্যাটী এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হায় রে পিতৃব্য!"

কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য,
ছাদ ফুঁড়ে ল'য়ে যায় ওমরাও দ্রব্য।
বাদসাহী জিনিস যত ছিল উপজীব্য,
অধনেন ধনং প্রাপ্তং, 'হায় রে পিতৃব্য।'

(২৯১)

একদা সমস্যা উঠিল, "হায় রে মূর্খের কিন্তু মুখ খানি সার!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"হায় রে মূর্খের কিন্ত মুখ খানি সার!"

জল-পূর্ণ কুম্ভ হ'তে শব্দ নাহি সরে,
কিন্ত অর্দ্ধ-পূর্ণ ঘট মহা শব্দ করে।

পরম পণ্ডিত নাহি করে অহঙ্কার,
'হায় রে মূর্খের কিন্তু মুখ খানি সার!'

(২৯২)

একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, "হায় হায় হায়!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন:—

সমস্যা—"হায় হায় হায়!"

তনয় কামনা করে পিতৃ-ধন হরি,
শাশুড়ী কামনা করে জামাই-ঘর করি।
বধূর কামনা মনে শ্বশুরকে পায়,
এ বড় আশ্চর্য্য কথা 'হায় হায় হায়!'

(২৯৩)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভাস্থ সকলের সমক্ষে রস-সাগরকে কহিলেন, "হায় হায় হায় রে!" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"হায় হায় হায় রে!"

১ম পূরণ।

দ্বৈতবনে দৈবদশা, দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাসা,
দুর্য্যোধনে পূর্ণ-আশা, করিবারে যায় রে।
দ্রৌপদার দেখি' ক্লেশ, ব্যস্ত হ'য়ে হৃষীকেশ,
স্বহস্তে বাঁধিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে॥
উঠ উঠ প্রিয়সখি, পাকস্থালী দেখ দেখি,
মেলিতে না পারি আঁখি, ক্ষুধার জ্বালায় রে।
পাকস্থালী করে ধরি' ভাসিল নয়ন-বারি,
দায়ের উপক্ষি হরি, ঘটাইল দায় রে॥

নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপাসিয়া পাকস্থালী,
তৃপ্তোঽস্মি জগৎ বলি' ভুঞ্জে শ্যামরায় রে।
অখিল ভুবন তুষ্ট, উদ্গারে বিস্ময় প্রাপ্ত,
ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত, পলাইয়ে যায় রে॥
গদাহস্তে ভীমরায়, বাহুড়িয়া পুনঃ যায়,
পঞ্চ ভাই গুণ গায়, ধরি রাজা পায় রে।
যে ছিল মনের বক্রী, ও রাজা চরণে বিক্রী,
কণ্ঠ চক্র জান চক্রি! 'হায় হায় হায় রে।'

উক্ত কবিতাটী শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, ইহা আমার মনের মত হইল না।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "যে আজ্ঞা"। ইহা বলিয়াই তিনি উক্ত সমস্যাটী দ্বিতীয় বার পূরণ করিলেন :—

২য় পূরণ।

অক্রূর আসিয়া রথে, ল'য়ে যায় ব্রজনাথে
বলরাম তাঁর সাথে, মধুপুরে যায় রে।
কাঁদে গোপীগণ যত, প্রেম-ধারা অবিরত,
যমুনা-তরঙ্গ মত, নয়নে বহায় রে॥
শুনি' রাণী যশোমতি, কাঁদিয়া লোটায় ক্ষিতি,
বলেন রোহিণী সতী, একি হ'লো দায় রে।
দুপুরে ডাকাতি করি, ধন মন প্রাণ 'হরি',
কে মোর নিল রে হরি, 'হায় হায় হায় রে॥'

এই কবিতাটী শুনিয়াও মহারাজের তৃপ্তি হইল না। রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য মহারাজ বলিলেন, "আবার সমস্যাটী পূরণ করুন।" রস-সাগরও "তথাস্তু" বলিয়া অন্যভাবে সমস্যাটী তৃতীয় বার পূর্ণ করিলেন :—

৩য় পূরণ।

ব্রজ-কুল-বধূ বলে, পূর্ব্ব-জন্ম-পুণ্য-ফলে,
পেয়েছিনু তপোবলে, মনোমত তায় রে।
হায় হায় মন হরি', শ্রীনন্দ-নন্দন হরি,
যান বুঝি মধুপুরী, বধি' অবলায় রে॥
সুখে কুলে দিয়ে কালী, না ভজিতে বনমালী,
রসের কলঙ্ক-ডালি, তুলিনু মাথায় রে।
ওরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি,
দিয়ে নিলি হেন নিধি, 'হায় হায় হায় রে॥'

মহারাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন, রস-সাগরের শক্তি কত দূর, তাহা বুঝিতে হইবে। তখন তিনি কহিলেন, "ইহাও ঠিক মনোমত হইল না।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর এই সমস্যাটী চতুর্থ বার পূর্ণ করিয়া দিলেন।

৪র্থ পূরণ।

রাজ্য ত্যজি' রঘুপতি, পঞ্চবটী-অবস্থিতি,
অনুজেরে বনে রাখি, মৃগ পিছে ধায় রে।
ভেকধারী নিশাচর, ধরিয়া সীতার কর,
অন্তরীক্ষে রথ ল'য়ে, চোরা পথে যায় রে॥
জটায়ু শুনিয়া নাট, মারে বীর পাক-সাট,
রথ সহ রাবণেরে, গিলিবারে ধায় রে।
বজ্র-বাণে কাটে পাখ, চালাইয়া মারে তাক,
এ সময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে!

তথাপি মহারাজ রস-সাগরকে ছাড়িতে না চাহিয়া কহিলেন "এইবারে এমনে একটী কবিতা রচনা করুন, যাহা সভাস্থ সকলেরই মনোমত হয়।" রস-সাগরের রসের ভাণ্ডার অক্ষয়,—কিছুতেই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার নহে। তখন তিনি সেই সমস্যাটী পঞ্চম বার পূরণ করিয়া দিলেন।

৫ম পূরণ।

রাহু আসি' ঘেরে শশী, চকোর খায় সুধারাশি,
বিপ্র ঋষি উপবাসী, ধিক্ বিধাতায় রে।
সুরসিক বিজ্ঞ জন, মান নাহি কদাচন,
অপাত্রে উত্তম দান, একি দেখি দায় রে॥
হতচ্ছিরে যত মূঢ়, সদা করে হুড়াহুড়,
মিছরী ফেলে কোৎরা গুড়, গাদ মাত্র খায় রে।
আশার সুসার নয়, দশার বিগুণ তায়,
ঘোঁড়ার পা খালে পড়ে, 'হায় হায় হায় রে।'

এই ৫টা পূরণ-কবিতা পর্য্যায়-ক্রমে শুনিয়া মহারাজ ও সভাস্থ সকল লোকেই অবাক্ হইয়া রহিলেন! ধন্য রস-সাগরের রস-ভাণ্ডার ও ধন্য তাঁহার অক্ষয় কবিত্ব-শক্তি!

(২৯৪)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সাধু-সন্ন্যাসী লই   াতেন। বিষয়-কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। একদা তিনি কয়েকটী সাধু লোকের সঙ্গে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা ও অপবিত্রতার সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "হারালাম এইমাত্র।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ভক্তি-ভরে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হারালাম এইমাত্র।"

বার বার যাতায়াত,—নিজ কর্ম্ম-সূত্র,
পূর্ব্ব কথা নাহি মনে,—কি নাম, কি গোত্র।
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র,
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি! 'হারালাম এইমাত্র।'

(২৯৫)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র তাঁহার ভৃত্যকে কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৈঠকখানা সাফ্ করিয়া রাখিস্।" ভৃত্য তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া অলস-ভাবে এদিক্ সেদিক্ যাইয়া সময় নষ্ট করিতে লাগিল। মহারাজ তাহার অনাস্থা দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "হেলা ক'রে বেলা টুকু কাটায়ো না আর!" এবং হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে চাহিয়া এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হেলা ক'রে বেলা টুকু কাটায়ো না আর।"

নিবেদন করি আমি, শুন ওহে নর!
জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে তব কলেবর।
তুমি কার, কে তোমার, এ'লে কোথা হ'তে,
কোথায় যাইবে তুমি, বুঝ বিধিমতে।
কে তোমার ভার বহে, তুমি বহ কার,
আমার আমার বুলি ভুল একবার।
দারা সুত কন্যা আর অন্য পরিজন,—
এ'রা কেবা না করিলে বারেক স্মরণ!
নিজেই নিজের পথ ক'রে দিলে রোধ,
অদ্যাবধি না হইল তব আত্মবোধ।

তিন গাছি সূত্র দিয়া আপনার গলে
'ব্রাহ্মণ' বলিয়া গর্ব্বে উঠ তুমি ফুলে।
এই তিন গাছি সূত্র করিয়া গ্রহণ
বন্ধন করিতে চাও এই ত্রিভুবন!
এ ভব-সাগরে নিজে না পাও নিস্তার,
অপরে করিতে যাও কিন্তু তাহা পার!
বারেন্দ্র-সন্তান আমি,—রাঢ়ী বৈদিকেরে
আমার অপেক্ষা লঘু বলি গর্ব্ব-ভরে!
তুমি আমি, আমি তুমি,—ভেদ কেন ভাই!
তুমি আমি এক হ'লে চিন্তা আর নাই।
রেখে দাও ব্রহ্মপদে মন অনিবার,
'হেলা ক'রে বেলাটুকু কাটায়ো না আর!' (১)

(২৯৬)

শান্তিপুর-নিবাসী কোন ভদ্রলোক একদিন রস-সাগরকে কহিলেন, "মহাশয়! গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস্ কি সূত্রে কান্ত বাবুর বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইয়া ও আহার করিয়া ছিলেন, তাহা আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" তখন রস-সাগর কহিলেন, "আপনি আমাকে এই সম্বন্ধে একটী সমস্যা দিন। তাহা হইলেই আমি এই বিষয় বর্ণনা করিতে পারিব।" ইহা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"হেষ্টিংস্ ডিনার খান্ কান্তের ভবনে!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

(১) কবিবর স্বর্গীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও এইভাবে একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

সমস্যা—"হেষ্টিংস্ ডিনার খান্ কান্তের ভবনে!

হেষ্টিংস্ সিরাজ-ভয়ে হইয়াই ভীত
কাশীম-বাজারে গিয়া হন উপস্থিত।
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়,
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।
কান্ত-মুদি ছিল তাঁর পূর্ব্বে পরিচিত,
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তাঁর করিল সন্ধান,
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত কয় হায় হায়,
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া মান রাখা যায়।
ঘরে ছিল পান্তা-ভাত, আর চিংড়ী মাছ,—
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া,—কাছে কলা গাছ
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলা-পাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তা ভাত
পেটের জ্বালায় হায় হেষ্টিংস্ তখন
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন।
এ রস-সাগর বলে কি হ'ল কি হ'ল,
হেষ্টিংস্ তিলির-বাড়ী জাত হারাইল।
সূর্য্যোদয় হ'ল আজ পশ্চিম গগনে,
'হেষ্টিংস্ ডিনার খান কান্তের ভবনে!'

পরিশিষ্ট। (১)

(২৯৭)

একদা সমস্যা উঠিল,—"ঈশ্বর অনেক যত্নে কন্যা খুঁজে পান না।" রস-সাগর মহাশয় এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ঈশ্বর অনেক যত্নে কন্যা খুঁজে পান না!"

নানা-বিদ্যা-গুণ-ধাম বিদিত ঈশ্বর নাম
কাব্য-সুধা বিনা যিনি অন্য কিছু খান না।
বদনে চর্ব্বিত বাণী কর্ণসম মহাদানী
পর-উপকার ভিন্ন অন্য কিছু চান না॥
বিধবা বিয়ের কার্য্য রঙ্গেতে করিয়া ধার্য্য
বলিলেন, এ কর্ম্মেতে ধর্ম্ম ছেড়ে যান না।
সে বিয়ে দিবার তরে ভ্রমি' প্রতি ঘরে ঘরে
"ঈশ্বর অনেক যত্নে কন্যা খুঁজে পান না॥" (২)

---

(১) চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তঃপাতী "নঙ্গি-বাঙ্গালা"-নিবাসী মদীয় পরম-হিতৈষী সুহৃৎ সুপণ্ডিত শ্রীরামব্রহ্ম চন্দ্র মহাশয় আমাকে ৩টী নূতন সমস্যা-পূরণ-কবিতা দিয়াছিলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার পরে কবিতা-গুলি হস্তগত হওয়ায় "পরিশিষ্টে" ইহাদিগকে সন্নিবেশিত করা গেল।

(২) ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত "বিধবা-বিবাহ" লইয়াই যে এই সমস্যাটী পূর্ণ করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। এখন এই সমস্যা-পূরণ কবিতাটী রস-সাগর মহাশয়ের রচিত কি না, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। রস-সাগর ১২৫১ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৬২ বঙ্গাব্দে ১৯ আশ্বিন তারিখে "বিধবা-বিবাহ-আইনের" জন্য একখানি আবেদন-পত্র "ব্যবস্থাপক-সভায়" পেশ করিয়া ছিলেন। ইহাতে এক হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল। ১২৬২ বঙ্গাব্দে ৫ চৈত্র তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ

(২৯৮)

একদা সমস্যা উঠিয়াছিল,—"উকুনের সঙ্গে ফেরে হাঙ্গর কুম্ভীর?" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া ছিলেন:—

সমস্যা—"উকুনের সঙ্গে ফেরে, হাঙ্গর কুম্ভীর!"

মহাতপাঃ কপিল যে নারায়ণ-অংশ,
তাঁর কোপে সগরের বংশ হ'ল ধ্বংস॥
অংশুমান্-স্তবে তুষ্ট হ'য়ে মহামুনি
শাপ-মোচন-উপায় কহিলা তখনি,—
"স্বর্গ হ'তে গঙ্গা যদি আসেন ভূতলে,
তাঁর জল-স্পর্শে মুক্ত হইবে সকলে।"
এ কারণে সূর্য্য-বংশের রাজা কয় জন
গঙ্গা আনিবারে দেহ করিলা পতন।

৩৬৭৬৩ (ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি) জন বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের বিপক্ষে স্বাক্ষর করিয়া আবেদন-পত্র পাঠাইয়া ছিলেন। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে ১২ শ্রাবণ-তারিখে এই আইন 'ব্যবস্থাপক-সভায়" পাশ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, ৬০টী বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়া তাঁহাকে ৮২০০০ (বিরাশি হাজার) টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করাইবার জন্য ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি এই কার্য্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে বড় বড় লোকের নিকটে গিয়া তাঁহাদিগের মতামত লইতে হইয়াছিল। রস-সাগরের মৃত্যুর ১০।১১ বৎসর পরে "বিধবা-বিবাহ-আইন" পাশ হয়। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, রস-সাগর মহাশয় জীবনের শেষভাগে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই কবিতাটি প্রকৃত-পক্ষে কাহার রচিত, তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচ্য।

অ শেষে ভগীরথ নিজ-পুণ্য-বলে
অসাধ্য সাধিয়া গঙ্গা আনিলা ভূতলে।
কিন্তু গঙ্গা স্বর্গ হ'তে পড়িতে ভূতলে
আধার না পেয়ে বেগে যান্ রসাতলে।
এই হেতু রাজা শিবে স্তবে তুষ্ট করি'
বলে,—"শিরে গঙ্গা তুমি ধর ত্রিপুরারি!"
আনন্দে শঙ্কর আসি' মাথা পাতি দিলা,
হর-শিরো-পরি গঙ্গা পতিত হইলা।
হর-জটা-জুটে গঙ্গা রহিলেন স্থির,
'উকুনের সঙ্গে ফেরে হাঙ্গর কুম্ভীর!'

(২৯৯)

একদা সমস্যা উঠিল, "সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে রস-সাগর নিম্ন-লিখিত ভাব দিয়া ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা- "সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে!"
শরতে অম্বিকা ল'য়ে কোলে গজাননে
সিংহে আরোহিয়া যান জনক-ভবনে।
পথিমধ্যে শিশুগণ খেলে কুতূহলে,
সিংহোপরি করিমুণ্ড দেখিল সকলে।
অল্পবুদ্ধি শিশুগণ ভাবে মনে মনে,—
'সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে!'

সমাপ্ত।

অতিরিক্ত সমস্যা-পূরণ।

(৩০০) (ক)

একদা সমস্যা উঠিয়াছিল, "ক্ষীর নীর রুধির বহিছে একধারে।" রস-সাগর মহাশয় তাহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ক্ষীর নীর রুধির বহিছে একধারে।"

দুর্জ্জয় তারকাসুর শিবে তুষ্ট করি'
মাগিয়া লইল তাঁর বিজয়-কুঠারী।
তেজে বৈজয়ন্ত হ'তে ইন্দ্রে তাড়াইল,
দেবাসুরে রণ ক্রমে তুমুল বাঁধিল।
সেই যুদ্ধে গণপতি যোগ-দান কৈলা,
বিজয়-কুঠারী তাঁরে তারা মারিলা।
রাখিতে পিতার সেই কুঠারের মান,
এক দন্ত গজানন করিলেন দান।
ক্ষোভে গেল গণপতি মাতৃ-সন্নিধানে,
স্নেহে উমা দেন স্তন তনয়-বদনে।
দন্ত-স্থিত-স্থান হ'তে পড়িছে রুধির,
তার সনে মিলিত হ'তেছে স্তন-ক্ষীর।

(ক) চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তঃপাতী "নঙ্গি-বড়বালা"-নিবাসী মদীয় পরম হিতৈষী সুহৃৎ সুপণ্ডিত শ্রীরামব্রহ্ম চন্দ্র মহাশয় যে তিনটী সমস্যা-পূরক কবিতা দিয়াছিলেন, তাহা "পরিশিষ্টে" সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে তিনি আরও দুইটী কবিতা (৩০০ ও ৩০১ সংখ্যক) দিয়াছিলেন; তাহাও এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।—গ্রন্থকার

অভিমানে গণ্ড বহি' অশ্রুজল ঝরে,
'ক্ষীর নীর রুধির বহিছে একধারে।'

(৩০১)

একদিন সমস্যা উঠিল, "ঢুকিবে হাতীর পাল মশকের গলে।" রস-সাগর মহাশয় তাহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :--

সমস্যা—"ঢুকিবে হাতীর পাল মশকের গলে।"

জটায়ুর মুখে রাম করিলা শ্রবণ,—
সীতারে লইল হরি' লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীবের সনে পরে মিতালী করিয়া
সীতা-অন্বেষণে দেন চর পাঠাইয়া।
হনুমান্ দেখে সীতা লঙ্কার ভিতরে
অশোক-বনের মধ্যে চেড়ীর মাঝারে।
অবশেষে যুক্তি করি সমুদ্র তরিতে
নল-হনূ-আদি সেতু লাগিল বাঁধিতে।
চর-গণ কহে ইহা রাক্ষস-সভায়,
শুনিয়া প্রহস্ত (ক) হাসি রাবণেরে কয়,—
বিষম সমুদ্রে সেতু করিয়া বন্ধন
সুশাণিত বাণে বধি' রাজা দশানন
যদি রাম পারে মুক্ত করিতে সীতায়,
উচ্চৈঃস্বরে বলি এই রাক্ষস-সভায়,—
সম্ভব এ অসম্ভব হ'বে কোন কালে
'ঢুকিবে হাতীর পাল মশকের গলে!'

(ক) প্রহস্ত—রাবণের সেনাপতি।

(৩০২) (ক)

একদিন সমস্যা উঠিয়াছিল, "নইলে কলা কেঁদেছে।" রসসাগর মহাশয় এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"নইলে কলা কেঁদেছে।"

শ্রীনন্দের নন্দন হরি তাঁর বুকে লাথি মারি'
বড়ই তোদের আস্পর্দ্ধা বেড়েছে ;
ওরে ওরে ভেড়ের ভেড়ে লক্ষ্মীছাড়া গলায় দ'ড়ে
তাই তোদের প্রণাম করি,—'নইলে কলা কেঁদেছে'।

(৩০৩)

কোন সময়ে সমস্যা দেওয়া হইয়াছিল, "মধ্য গেল চিরে।" প্রত্যুৎপন্নমতি রস-সাগর মহাশয় তাহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"মধ্যে গেল চিরে।"

আকুল হইয়া রামা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
ঘন ঘন করাঘাত করে নিজ শিরে।
রসিকেতে রস টানে, শিশু টানে ক্ষীরে,
দুই রসিকে টানাটানি, 'মধ্যে গেল চিরে'।

(ক) কলিকাতা-বাগবাজার-নিবাসী বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ধর্ম্মপ্রাণ রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, মদীয় কনিষ্ঠ সোদর-সদৃশ শ্রীযুক্ত রায় বটবিহারী বসু মহাশয় ৩০২ ও ৩০৩ সংখ্যক সমস্যা দুইটী দিয়াছিলেন। ৩০২ সংখ্যক সমস্যাটীর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ কহেন, ইহা কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমস্যা-পূরণ। প্রকৃত-পক্ষে ইহা কাহার সমস্যা-পূরণ, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।—গ্রন্থকার

(৩০৪) (ক)

একদা সমস্যা উঠিয়াছিল, "শীতে করবে কি!" রস-সাগর মহাশয় ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"শীতে করবে কি!"

তেল তামাক তপন তূলা তনূনপাৎ ঘি,
ধুকড়ী পাছুড়ি আর শাশুড়ীর ঝি,
বুকে বুকে মুখে মুখে "শীতে করবে কি!"

ব্যাখ্যা। তনূনপাৎ—তনূনপ অর্থাৎ ঘৃত, তাহাকে অদন (ভক্ষণ) করে যে, অর্থাৎ 'অগ্নি'।

(ক) কলিকাতা-সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরির ম্যানেজার, নদীয়া-জেলান্তর্গত-গোপভাঙ্গা-বাস্তব্য মদীয় সহোদর-সদৃশ পরম পূজ্য-পাদ কাব্যামোদী রসিক-রাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমস্যা-পূরণ কবিতাটী দিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ।